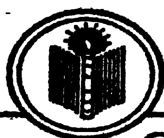
নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার

শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য



ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৬

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৫

মুদ্রক : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মশতবার্ষিকী

উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভূমিকা

আমাদের সময়ে বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে যে-সমস্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সাহিত্যে-শিল্পকলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাষ্ট্র-পরিচালনে আর জীবনের অন্য নানা দিকে যাঁরা অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। আমার নিজের দীর্ঘ আশি বৎসরের জীবনে ছোটো বড়ো ব্যক্তিত্বশালী বহু অসাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে। দূর থেকে পরোক্ষ-ভাবে কতকগুলি মহা-পুরুষের অনুপ্রাণনা পেয়ে, আর প্রত্যক্ষ ভাবে কয়েকজন বিরাট্ পুরুষের স্পর্শ পেয়ে (তাঁদের মধ্যে যাঁকে "পূর্ণ মানব" বলা যায় সেই কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন প্রধান), জীবনে সার্থকতা এসেছে, জীবন ধন্য হয়েছে। এঁদের কথা গুছিয়ে বলা সহজ নয়, আর তা বলবার চেষ্টার অর্থ হবে—নিজের আভ্যন্তর জীবনের সমীক্ষা আর প্রকাশ করার ব্যর্থ প্রয়াস, যার জন্য বিশেষ শক্তি অপেক্ষিত, আর যার পিছনে থাকবে আত্মানুসন্ধান আর উপলব্ধির আলোক। ভারতের শাশ্বত ইতিহাসের ধারার কথা বলবো না—আমাদের এযুগেই আমাদের পিতা-পিতামহদের কালের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ মহাপুরুষদের চিন্তা আর শিক্ষার মন্দাকিনী স্রোতের যে দুই এক বিন্দু বারি আমাদের জীবনে সার্থকতা এনে দিয়েছে, তার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া তো আমার শক্তির বাইরে। আমার গুরুজনদের কাছ থেকে, বিশেষ করে আমরা ইস্কুলের আর কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে যে চিত্তের প্রসার আর মানসিক বিকাশ তাঁদের দয়ায় আমি লাভ করেছি, সেটিও একটি মস্ত বড় সম্পদ, আর তার জন্য আমি ভাগ্য বা নিয়তি বা দেবকৃপা বা কর্মফল যাই থাকুক তার কাছে চির-কৃতজ্ঞ। আমার পিতৃদেব, মাতৃদেবী, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহী, মাতুলদ্বয়, আর অন্য আত্মীয় আর আমার শিক্ষকদের সান্নিধ্যের আর তাঁদের স্নেহের কথা মনে হলে কোটি কোটি প্রণাম তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করি।

এঁরা ছাড়া, আমার সতীর্থ সহচর সুহৃৎ মিত্র যারা ছিল, তাদের

কাছ থেকে জীবনের ক্ষেত্রে যখন প্রথম অবতীর্ণ হলুম তখন থেকে যা পেয়েছি তার জন্যও নিজেকে ভাগ্যবান্ বলে মনে করি। সমস্ত সহ-পাঠীদের আর কৈশোর আর যৌবনের অন্য মিত্রদের সব কথার আলোচনার স্থান এ নয়। তবে বর্তমান প্রসঙ্গ হচ্ছে আমার যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের অন্যতম একজন অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠ মিত্রকে নিয়ে, সুতরাং সেই প্রসঙ্গে অন্য মিত্র দু-চার জনের কথা এসে পড়বে। সেই অকৃত্রিম আর ঘনিষ্ঠ মিত্র হচ্ছে শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

দু বছর ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়া, দু বছর বি-এ, আর দু বছর এম্-এ—এই ছয় বছরের কলেজের জীবন। এই ছয় বছরের দুর্লভ ছাত্র-জীবনে, প্রথম যৌবনে, পরিপূর্ণ ভাবে অংশ গ্রহণ করেছি। পরীক্ষায় ফল ভাল হয়েছিল বরাবরই, কিন্তু কখনও book-worm বা পুঁথি-মুহা বা বই-মুয়ো ছিলুম না—চোখ খুলে কান সজাগ রেখে সব দেখতুম শুনতুম, ছাত্রজীবনের প্রায় সব ব্যাপারেই সচেতন থাকতুম, কোনও কোনও ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহও দেখাতুম। ভাল ছেলে, মন্দ ছেলে, নিরীহ গোবেচারী ফন্দীবাজ ধড়ীবাজ নীতিবাগীশ অনৈতিক রুচিবাগীশ, দামপাণ্ডা, রসবোধযুক্ত বেরসিক—সব রকমের ছাত্র ছিল বন্ধুদের মধ্যে। নাম-করা ভাল ছেলেদের সঙ্গে পরিচয়ও হত, আবার আড্ডা জমৃত সাধারণ ছেলেদেরও সঙ্গে কিন্তু আমার দলের আমরা সকলে, এ বিষয়ে ক্রমে একমত হই যে লেখাপড়ায় মার্কা মারা পরীক্ষায় ফার্ষ্ট-ক্লাস পাওয়া ছেলে না হলেও, আমাদের এই ছয় বছরের কলেজের জীবনে সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে উজ্জ্বল-মতি, সবচেয়ে সুবুদ্ধি, আর চেহারায়ও তেমনি সুদর্শন ছাত্র ছিল শিশিরকুমার ভাদুড়ি। এক কথায়—শিশিরই ছিল, প্রায় সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে, The Most Brilliant and the Most Popular student in Calcutta University for near about a decade! এ কথা বলায় বিদ্যার ক্ষেত্রে যে সব দিগ্‌গজ ছাত্র ছিল তাদের কারো লাঘব করা হয় না—তাদের কৃতিত্ব ছিল অন্য ধরণের, আর একটু সীমিত। বিদ্যায় বুদ্ধিতে শিশির আর কারও চেয়ে খাটো ছিল না, আর উপরন্তু ছিল তার একটা সহজ আকর্ষণী শক্তি, একটা মার্জিত উচ্চশিক্ষিত মন আর আচার-ব্যবহারে অভিজাত্য, আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতা ভব্যতা আর শালীনতা বোধ, রসবোধ আর সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশবার আগ্রহ—এই

সব ছিল যে আকর্ষণী শক্তির মূলে। কোনও রকমের "চাল" অর্থাৎ কৃত্রিমতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেউ শিশিরের আচরণে ধরণ ধারণে কল্পনাই করতে পারত না। মানুষ হিসেবে শিশির ছিল সরল, সহজ, সোজা, খাঁটি—ঋজু, ঋতম্ভর। আমরা যারাই শিশিরের সংস্পর্শে এসেছিলুম সকলেই তার সঙ্গে এক অতি সহজ মৈত্রীসূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিলুম। বহু বৎসর ধরে, আমাদের কলেজের জীবনে আর তার পরেও শিশির ছিল বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যমণি, এমন কি মিত্রমালার গাঁথন-সূতা।

নাট্যাভিনয়ে আর পরিচালনায় শিশিরের দিব্য প্রতিভার কথা বলতে বসবো, নাট্যকলারসিকের ভাবনাময় দৃষ্টি নিয়ে কখনও শিশিরের কৃতিত্বের বিশ্লেষণের চেষ্টা করি নি—সে চেষ্টা আমার এলাকার বাইরে। শিশিরকে পেয়েছিলুম মিত্র-ভাবে, সাহিত্য-বন্ধু ভাবে, মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে সতীর্থ আর সমানধর্মা রূপে, আর একজন পরিপূর্ণ বিদগ্ধ রসিক-জন রূপে। তার ব্যক্তিত্বের সেই দিকগুলির সম্বন্ধে দুই একটি কথা মাত্র এই প্রসঙ্গে নিবেদন করবো।

কবে, কোন তারিখে শিশিরের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আর পরিচয় ঘটে তা মনে নেই। তবে মোটামুটি বলতে পারি, ১৯০৭ সালে এণ্ট্রান্স পাস করে যখন জেনেরাল-আসেম্ব্লিস্-ইন্স্টিট্যুশনে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভরতি হই (জেনেরাল-আসেম্ব্লিস্ পরের বছরেই ডফ-কলেজের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে স্কটিশ-চর্চেস কলেজ-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়), তখন থেকেই, বোধ হয় প্রথম বছরের শেষ পর্যায়ে যখন আমরা পড়ছি তখন থেকেই, শিশিরের সঙ্গে আলাপ হয়। তখনকার দিনে ক্যালকাটা-ইউনিভার্সিটি-ইন্স্টিট্যুট নামে আধা-সরকারী কলেজের ছাত্রদের ক্লাব কলকাতার ছাত্রজীবনে বেশ একটা লক্ষণীয় উঁচু স্থান করে নিচ্ছে। ক্যালকাটা-ইউনিভার্সিটি-ইন্স্টিট্যুটে ঐ সময়ে ছাত্রদের জন্য আর ছাত্রদের নিজেদের অনুষ্ঠিত অন্যান্য নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতি বৎসর আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হত। বিভিন্ন কলেজ থেকে দু জন করে ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারত। আবৃত্তি হত ইংরেজি, বাঙলা, সংস্কৃত, ফারসী আর আরবী ভাষায়। তিনটি করে পারিতোষিক প্রত্যেক ভাষার জন্য দেওয়া হত। ১৯০৮ সালে জেনেরাল-আসেম্ব্লিস্-ইন্স্টিট্যুট থেকে সংস্কৃতের জন্য নির্বাচিত হই, বোধ হয় শিশির নির্বাচিত হয় ইংরেজির জন্য।

সেবার আমি পারিতোষিক পাই নি। শিশির পেয়েছিল কিনা ঠিক মনে পড়ছে না।

এই আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম শিশিরের সঙ্গে পরিচয় হয়। সহজ হৃদ্যতার সঙ্গে শিশির অতি শীঘ্র আমার অন্তরঙ্গ মিত্র হয়ে দাঁড়ায়। এর পরে ঐ বৎসরই, আমাদের কলেজে বাঙলা নাটক, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "প্রতাপাদিত্য", ছাত্রদের দ্বারায় অভিনীত হয়। শিশির আমার এক ক্লাস উপরে পড়ত—দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে—কিন্তু অভিনয়ের ব্যাপারে ইণ্টারমিডিয়েট আর বি-এ, এই দুইয়ের চার ক্লাসেরই ছাত্রেরা অংশ গ্রহণ করত। এই অভিনয়ের সম্বন্ধে লক্ষণীয় কিছু মনে পড়ছে না। ফণীন্দ্রনাথ মিত্র বলে আমাদের ক্লাসের এক সুদর্শন সহপাঠী প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় অভিনয় করে, নাটকের কল্যাণীর ভূমিকা নেয় শৈলেন্দ্রনাথ বসু। একটা দৃশ্যের কথা মনে আছে—দু জন মুসলমান আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কল্যাণী যখন খাঁড়া ধরে দাঁড়িয়েছে, তখন ঠিক সঙ্গীন মুহূর্তে প্রতাপাদিত্য আর সূর্যকান্ত এসে হাজির, দু জনের হাতে একটি করে প্রমাণ আকারের খেলার বন্দুক, তাঁরা আক্রমণকারিদের উপর তাড়া করে বন্দুক ধরলেন, স্টেজের ভিতর থেকে দুম্-দাম করে 'কলেরা পটাশ' অর্থাৎ 'ক্লরেট-অফ্-পটাশ'-এর পটকা ফাটানো হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে দুই আততায়ী ধরণীশায়ী। তবে একটু বে-হিসাবি হয়ে পড়ায়, পটকা ফাটাবার আওয়াজটা ৩।৪ সেকেণ্ড পরে হয়ে যায়—তার আগেই আততায়ীদ্বয় ঘায়েল হয়ে শুয়ে পড়ে। দর্শকদের মধ্যে একটু হাসাহাসি হয়, স্টেজ-ম্যানেজার তো চটে কাঁই। এই ভাবে আমাদের বাঙলা নাটক হয়। পরের বছর, আমরা তখন সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে, ইংরেজি নাটক শেকস্পিয়রের জুলিয়স্ সীজার্-এর অভিনয় করি। আমাদের কলেজ-জীবনের সময়ে কলকাতার প্রায় সব বড় বড় কলেজে বছরে একটি করে বাঙলা নাটক, আর একটি করে ইংরেজি নাটক—সাধারণতঃ শেকস্পিয়রের কোনও বই—অভিনয়ের রেওয়াজ ছিল। এটা যেন ছিল ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষার একটা ছাত্রপ্রিয় অঙ্গ। এ সম্বন্ধে দু কথা বেশ লেখা যায়। ১৯০৮ সালে দুটো স্কচ মিশনারী কলেজ, আমাদের জেনেরাল-অ্যাসেম্‌ব্লিস্-ইনস্টিট্যুশন আর ডফ কলেজ, মিলে একটি কলেজ হয়ে গেল—"স্কটিশ-চার্চেস্-কলেজ" (পরে স্কটল্যাণ্ডে ওদের খ্রীষ্টান প্রেসবিটেরিয়ান

দলের ধর্ম-সংক্রান্ত মতভেদের সমাধান হলে, যখন একটি মাত্র "স্কটিশ চার্চ" পুনঃস্থাপিত হল, তখন "স্কটিশ-চার্চেস-কলেজ"-এর নামও পালটে গিয়ে হল "স্কটিশ-চার্চ-কলেজ")। ঐ সালের স্কটিশ-চার্চেস-কলেজের 'জুলিয়স্ সীজার' অভিনয় নানান দিক থেকে এক লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। আর এতে আমি পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলুম—কুশীলব বা অভিনেতা রূপে নয়, "ব্যাশ-কারী" বা বেশকারী অর্থাৎ পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে সাজানোর ভার নিয়ে। কেন এই কাজ আমি ঘাড়ে করে নিই, সে সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি কথা আছে—সব কথার অবতারণা এখন করবো না। তবে শিশির এই নাট্যাভিনয়ে ব্রুটাস-এর ভূমিকা গ্রহণ করে, আর সেই জন্যই আমার পোষাক তৈরি করার প্রচেষ্টা মনে হয়েছিল যেন সার্থকই হয়েছিল। এই অভিনয়কে অবলম্বন করে শিশিরের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতে হয়, আর মনে হয়, এই সময়ে শিশিরের সঙ্গে আমার মিত্রতা 'আপনি'-র পর্যায় থেকে একেবারে 'তুই'-এর পর্যায়ে এসে পৌঁছয়—সেই থেকে বাকী জীবনে শিশির এমন একজন বন্ধু হয়ে দাঁড়ায় (এ রকম অল্প আরও দু-চারজন হয়েছিলেন) যার সঙ্গে "তুই-তোকারি" ছাড়া আর অন্য সম্বোধনের কথা ভাবতেও পারতুম না।

জুলিয়স্ সীজার নাটক অভিনয় হবে ঠিক হল। মহা উৎসাহে মহড়া চলল। কলেজের কাজ হয়ে যাবার পরে বিকাল ৫টা থেকে ৭টা ৮টা পর্যন্ত মহড়া চলত। আমাদের অধ্যাপকদের কেউ-না-কেউ থাকতেন, স্কচ্ সাহেব অধ্যাপকেরা, আর তাঁদের ইউরোপিয়ান অভিনয়-রসিক বন্ধুরাও কখনও কখনও এসে আমাদের তালিম দিতেন। কলেজ থেকে টাকা বেশী পাওয়া যেত না। ইংরেজি সাহিত্য চর্চার অঙ্গ হিসেবেই এই ইংরেজি (বিশেষতঃ শেকস্পিয়রের) নাটক অভিনয়কে দেখা হত বলে কলেজের কর্তৃপক্ষ উৎসাহ দিতেন। ছেলেরাই চাঁদা তুলে বাইরে থেকে দুই একজন কলেজের হিতৈষী পুরাতন ছাত্রের কাছ থেকে টাকা যোগাড় করে কাজে নামত। শেকস্পিয়রের নাটক হবে, বাজার থেকে শলমা-চুমকী দেওয়া ঝুটো মখমলের "রাজবেশ", সাদা রেশমের "মন্ত্রীর বেশ" প্রভৃতি শস্তায় ভাড়া করে এনে তো ইংরেজি নাটক হবে না। তখন চৌরঙ্গী রোডে গ্রাণ্ড-হোটেলের একতলায় ব্যাণ্ডম্যান-অপেরা-কোম্পানি বলে ইউরোপিয়ান আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ফিরিঙ্গিদের এক থিয়েটার কোম্পানি ছিল, তারা মাঝে মাঝে কলকাতার ইংরেজদের জন্য ইংরেজি নাটকের অভিনয় করত। আমরা শুনেছিলুম যে, তারা বাইরের

লোকেদের যেমন বিভিন্ন ইংরেজ আর বাঙালী কলেজের নাটকের জন্য দরকার মত পোষাক ভাড়া দিত। আমাদের একটি বন্ধু আগবাড়া হয়ে এল, বললে, ঐ ব্যাণ্ডম্যান কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে। সেই আমাদের জন্য পোষাক ভাড়া করে আনতে পারবে। আমরা রোমান পোষাক জুলিয়স্ সীজার নাটকের জন্য যা যা চাই তার তালিকা করে তাকে দিলুম। সে পরে আমাদের জানালে, ১৫০ টাকা না কত পড়বে। টাকাটা কিন্তু আগাম দিতে হবে। আমরা তো অকূলে কূল পেয়ে তাতেই রাজী হলুম, টাকা তার হাতে দেওয়া হল। তার পরে সে হঠাৎ ডুব মারলে—আর কলেজে আসে না, তার বাড়িতেও তাকে পাওয়া যায় না। আমাদের কেমন সন্দেহ হল। নাটকের আর দু-তিনদিন মাত্র বাকী আছে, অভিনয় যারা করবে তারা সব তৈরী, কিন্তু পোষাক? শেষে দু তিনজনে গেল ব্যাণ্ডম্যান অপেরা কোম্পানির ডেরায়—পোষাকের খোঁজ বা তদবির করতে। সেখানে গিয়ে জানা গেল, কেউ তাদের কাছে পোষাকের জন্য আসেই নি, টাকা দেওয়া তো দূরের কথা। সব শুনে তারা বললে, কলেজের ছেলে হলেও তোমাদের বন্ধুটি চোর, তাকে পুলিসে দাও। সে তো দূরের কথা—এক শনিবার সন্ধ্যায় নাটক হবে, তার পরেই লম্বা দেড় মাসের পূজোর ছুটি। এখন কলেজের মান বাঁচানো যায় কি করে? অভিনয় যে করেই হোক, করতেই হয়। নিমন্ত্রণের কার্ড পর্যন্ত ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছে।

গ্রীক রোমান জগতের বাহ্য সংস্কৃতি, তার শিল্পকলা পোষাক আশাক সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ছিল—সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে গ্রীস ও রোমের ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয় ছিল। বন্ধুরা জানত। কেউ-কেউ এসে বললে, একটা গতি কিছু করো। আমি সাহস করে এগিয়ে এলুম, আমার হামরাই হয়ে এলেন আর দুজন সহপাঠী, আনন্দকৃষ্ণ সিংহ (পরে ইংরেজির অধ্যাপক হন রিপন কলেজে) আর নীহার মিত্র। আমি বললুম, কুছ পরওয়া নেই—রোমান পোষাক, অতি সাদা সিধে ব্যাপার। সাদা সিল্কের চাদরে হল রোমান পোষাকের প্রধান অঙ্গ, টোগা বা অঙ্গবস্ত্র বা উত্তরীয় প্রায় সারা গা-টা ঢেকে। ভিতরে সাদা কাপড়ের লম্বা একটা পাঞ্জাবী, সেটা হল ভিতরের খিটন্ বা জামা। পায়ে চপ্পল। মাথায় একটা রঙীন কাপড়ের ফেটা—বাস, এইতেই রোমান পোষাক চমৎকার ভাবে হয়ে গেল। এখন আমরা আমাদের বন্ধুদের আর দর্শকদের একেবারে কাত করে দিলুম, রোমান সেপাইদের

পোষাক বানিয়ে। সোলার টুপি যা তখনকার দিনে সাহেবরা পরত তাই গোটাকতক আনিয়ে তার মাথার খুলি-টুকু ঢাকা যেত যে গোল অংশে সেইটুকু রেখে বাকী সবটা কেটে বাদ দেওয়া গেল। তার পরে মোটা পিজবোর্ডের একটা করে crest বা চূড়ো (মোরগের ঝুঁটিতে যেমন থাকে) কেটে নিয়ে, ঐ সোলা-টুপীর মাথাটা চিরে তাতে বসিয়ে দেওয়া গেল। তার পরে সবটার উপরে রুপোলি বা সোনালি কাগজে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হল—ঝকঝক করতে লাগল, যেন পিতল বা ইস্পাতের helmet বা টোপর বা শিরস্ত্রাণ। গালের দু-পাশে আবার cheek-guards বা পিজবোর্ডের এই শিরস্ত্রাণের গাল-বাঁচাবার ধাতুর অংশ তৈরী করে সেঁটে দিলুম, রুপালী বা সোনালী কাগজ লাগিয়ে, রবারের সূক্ষ্ম ইলাস্টিক লাগিয়ে যাতে খুলে না পড়ে বা আলগা না হয়ে যায়। শিরস্ত্রাণের মাথায় পাখীর পালক বা ঘোড়ার বালামচীর অলঙ্করণ থাকত, সেটার কাজ সারলুম তুলো সেঁটে, দূর থেকে চলনসই হল। সেই রকম হাঁটুর নীচে চপ্পলের উপরে ধাতুর অনুকারী greaves বা পাদত্রাণ, আর বড় বড় পিজবোর্ড কেটে তাতে রূপালী বা সোনালী কাগজ, কালো কাগজ সেঁটে হল রোমান ঢাল—এমন কি তাতে S.P. Q. R. (অর্থাৎ Senatus Papulus que Romanus—'রোমীয় শাসন ও জনসাধারণ') এই মন্ত্র লাগানো গেল—আর রোমের প্রতিষ্ঠাতা দুই ভাই রোমুলুস্ আর রেমুস্ নেকড়ে-বাঘের পেটের তলায় বসে তার দুধ খাচ্ছে, এই দৃশ্যের ছবি। পোর্শিয়া ছিল একমাত্র মেয়ের ভূমিকা, বড় শেমিজ সায়া দিয়ে ফিতে দিয়ে তার পোষাকও এক রকম দাঁড় করানো গেল। যখন সাদা রেশমের চাদরের টোগা পরে পিজবোর্ডের সানা টোপর বা বর্ম-শিরস্ত্রাণ পরে, S P Q R লেখা পিজবোর্ডের ঢাল নিয়ে, বর্মের উপরে লাল রোমান ফৌজী cloak বা দুকূল পরে, অভিনেতারা মাচার উপরে বার দিলেন, আমরা নিজেরা তো মুগ্ধ হয়ে গেলুম, আর সাহেব মেম আর বাঙালী দর্শকেরাও হাততালি দিয়ে তারিফ করলেন। এখন এসব আমার ১৮ বছর-বয়সের ছেলেমানুষী মনে হয়। কিন্তু নাটক জমেছিল শিশিরের Brutus ব্রুটাসের ভূমিকার অভিনয়ে। আর ব্রুটাস-এর প্রতিস্পর্ধী Mark Antony মার্ক আণ্টনির ভূমিকা যিনি করেছিলেন ফোর্থ-ইয়ার-ক্লাসের ছাত্র, আমাদের অগ্রজ-কল্প, নামটা মনে পড়ছে না—তিনিও চমৎকার করেছিলেন, শিশিরের সঙ্গে তাল রেখে চলেছিলেন। যতীন

গাঙ্গুলি বলে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছেলে Portia পোর্শিয়ার অভিনয়ও সুন্দর করেছিল।

এই ভাবে তো পরের মাথায় খুর চালিয়ে রক্তপাত করে নাপিত যেমন তার ব্যবসা শেখে, সেই ভাবে শিশির আর অন্য অভিনেতা সহপাঠীদের উপর আমাদের এই experiment চালিয়ে আমরা "ঐতিহাসিক" পোষাক তৈরীর কাজে ছাত্র মহলে সুনাম অর্জন করলুম, প্রধানতঃ আমরা তিন জন, আনন্দ সিংহ, নীহার মিত্র, আর আমি। পরে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের নাটকাভিনয়ে 'চন্দ্রগুপ্ত', 'অশোক', 'জনা' প্রভৃতিতে আমাদের জয়-জয়-কার আরও হল, আর শিশির যখন উত্তর কালে পুরোপুরি নাট্যকার বৃত্তি নিলে, তখন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক অগ্রজকল্প রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দলে এলেন, সহজেই আমাদের পরিচালক নেতা হয়ে গেলেন—শিশিরের 'আলমগীর', 'সীতা', 'দিগ্বিজয়ী' প্রভৃতির অভিনয়ে। আর আমাদের সাহায্যে এলেন—বরাবরই ছিলেন—গিরীন সেন। শিশিরের প্রযোজনার ফলেই বাঙলা রঙ্গমঞ্চে হিন্দুযুগের পোষাক-পরিচ্ছদ stage decor বা মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টির আধারে একটা যুগান্তর এসে গেল। শলমা চুমকির সাজে, কটকটে লাল নীল সবুজ কালো হলদে ভেলভেটের কোট চাপকান ফুলপ্যান্ট বা হাফপ্যান্ট, আর পালখ লাগানো শামলা বা জরীর টুপির রেওয়াজ ধীরে ধীরে উঠে গেল— ইনস্টিট্যুটে আর পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরের পরিচালিত অভিনয় দেখে। হিন্দু রাজার পোষাক বেনারসী জোড়, খালি গায়ে প্রচুর গয়না, পায়ে চপ্পল, মেয়েদের পোষাকে জরীর কাজ করা বা ছাপা রঙীন সাড়ী, আর তদনুরূপ ওড়না এসে গেল। নাট্যাভিনয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে এই নতুন হাওয়া ক্রমে উত্তর ভারতে আর ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথের আর নন্দলাল অসিতকুমার প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের ছবি— আর পিছনে রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতা আর অন্য লেখা, এ বিষয়ে এগুলিরও অনুপ্রাণনা ছিল নিভৃতে, কিন্তু অত্যন্ত গভীর আর সুদূর-প্রসারী।

শিশিরের সঙ্গে এই ভাবে, নাট্যকলার প্রযোজনা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা, বাঙলা ইংরেজী আর সংস্কৃত এই তিন ভাষার সাহিত্য নিয়ে—যে ভাবসাম্য পাওয়া গেল, যে ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল, সেটাকে আমার জীবনে একটি পরম পদার্থ বলে মনে করি। এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কেবল

আমাদের অন্তরঙ্গ সুহৃদ মহলের লোকেরাই জানত, এর বাহ্য প্রকাশের আশঙ্কা বা চেষ্টা ছিল না। শিশিরের নটগৌরবের কথা বাইরের লোকে সকলেই জানে, তার শিল্পি-জীবনের তার সাধনার তার কৃতিত্বের বিদগ্ধ রসজ্ঞ আলোচনা আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠির কেউ কেউ তো করেছেনই, বাইরের নাট্যরসিক নাট্যকলাবিৎ সুধীজনও করেছেন। শিশিরের লোকপ্রিয়তা এমন ছিল, অন্য সকলকে আপনার করে নেবার ক্ষমতা এমন ছিল যে, যে কেউ তার সান্নিধ্যে আসত তারই মনে হত, শিশির তার অত্যন্ত আপন জন, নিকট মিত্র। মহৎ চরিত্রের, সর্বজ্ঞর-মানস-যুক্ত অসাধারণ পুরুষের পক্ষে বলা যায়, তাদের ব্যক্তিত্ব যেন একটি পল-কাটা হীরা—তার নানা facet বা মুখ আছে, প্রত্যেকটি থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে—আর সেই অসাধারণ পুরুষের সান্নিধ্যে যারা এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই মনে হবে, বুঝি এমন একটা স্থান তার সৌহার্দ্যের মধ্যে আছে যেখানে আর কারো ঠাঁই নেই, সেখানে তারা দুজনই একক।

শিশিরের সঙ্গে এই হৃদ্যতাটুকু আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য, যেমন আরও দশজন মিত্রও ভাবশুদ্ধির সঙ্গে আমারই মত শিশিরের সম্বন্ধে একথা বলবেন। সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক নানা আলোচনা আর নাট্য প্রযোজনা, রাজনীতি, চরিত্র-বিচার প্রভৃতি গুরু লঘু নানা বিষয়ের অন্তরালে শিশিরের সঙ্গে আমার বহু কথাবার্তা হত। তার আর আমার দু-জনেরই নানা ব্যক্তিগত কথা আর সমস্যা, সুখ-দুঃখের আদর্শ-আকাঙ্ক্ষার অভাব-অভিযোগের কথা জীবন-মৃত্যু প্রভৃতি অবিনশ্বর জগৎ-শাশ্বতসত্তা নিয়ে, শুয়ে বসে পা-চারী করতে করতে অন্তরঙ্গ আলোচনা কতবার না শিশিরের সঙ্গে আর পান্নালাল মুখুজ্যের মত দুইএকজনের সঙ্গে আমাদের হত। সে সবের কোনও record বা স্মরণিকা নেই—তবে আমার মনন আর চিন্তাধারা গড়ে তোলবার পথে সেই সব আলোচনার একটা সার্থকতা ছিল।

শিশির সম্বন্ধে নানা কথা মনে আসে। শ্রীযুক্ত শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই বইখানিতে শিশিরের শিল্পী জীবনের একটা বিশদ আলোচনা দিয়েছেন, তার মূল্যায়ন করবার চেষ্টা তিনি করেছেন। বিশেষ তথ্যপূর্ণ এই আলোচনা, আর বেশীর ভাগ বিচার আর বর্ণনা-মূলক। নাট্যকার শিশির সম্বন্ধে অনেক তথ্য এতে পাওয়া যাবে। মানুষ শিশির, সামাজিক শিশির, মায়ের মাতৃভক্ত পুত্র শিশির, ভ্রাতৃবৎসল ভগিনীবৎসল শিশির, পত্নীর প্রতি গভীর

অনুরাগ-মুক্ত শিশির, মিত্র-কাম্য মিত্রকামী শিশির, সত্যাগ্রহী শিশির, আদর্শনিষ্ঠ শিশির—এসবের কথা লিখতে গেলে বড় একখানা বইয়ের অবতারণা হয়ে যায়। সব বিষয়েই শিশির ছিল নিজেরই মত—সে ছিল উদার-হৃদয় সত্যসন্ধ শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

শ্রীযুক্ত শঙ্কর ভট্টাচার্য্য তাঁর এই বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরের পিতৃবিয়োগ হল। এই মহাগুরু নিপাতের সময়ে আমরা জন কয়েক উপস্থিত ছিলুম, শ্মশানবন্ধুর মত শিশির আর তার ভাইয়েদের সঙ্গে তার পিতার দেহ নিমতলার শ্মশানঘাটে নিয়ে যেতে কাঁধ দিয়েছিলুম। মৃত দেহের সংকারে আমার অভিজ্ঞতা বিশেষ ছিল না, কেবল পিতামহের বেলায় শ্মশানে গিয়েছিলুম, তবুও কালোচিত সবকিছু করার কাজে সহায়তা করি। চিতার উপর পিতার দেহ স্থাপনের পরে শিশির, তারাকুমার আর বিশুর পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। অন্য নানা বিষয়ে পিতার আর মাতার প্রতি শিশিরের ভক্তি ভালবাসার ছোট খাট অনেক নজীর দেখেছিলুম—মাতামহ মেদিনীপুরের মনীষী কৃষ্ণকিশোর আচার্য মহাশয় সম্বন্ধেও তেমনি ভক্তি ভালবাসার পরিচায়ক অনেক কথা শিশিরের মুখে শুনেছি। শঙ্করবাবু তাঁর বইয়ের ঐ পৃষ্ঠায়ই লিখেছেন—১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে শিশিরকুমারের স্ত্রী বিয়োগ হয়। শিশিরের স্ত্রী উষা দেবীর সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎকার হয় নি, শিশিরের বাবা একটু রক্ষণশীল সেকেলে ধরণের মানুষ ছিলেন বলেই বোধহয় শিশির বন্ধুদের বাড়িতে এনে পত্নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে নি। শিশিরের বিয়ে হয়েছিল সুদূর আগরা শহরে, তার শ্বশুর ছিলেন আগরার বিখ্যাত ডাক্তার রায়বাহাদুর নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী—আমরা অত দূর বর-যাত্রায় যেতে পারি নি। কিন্তু পরে আমাদের দলের সকলের শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র, জ্ঞানপ্রিয় মিত্র, আমাদের অতি আপনজন "গুরুদেব"-এর সঙ্গে আর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথায় বুঝেছি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক গভীর ভালবাসার যোগ ছিল। যখন খবর এল আগরা থেকে, বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, শিশির আমাদের দলের মধ্যে সকলকেই উদ্দেশ করেই "গুরুদেব" জ্ঞানপ্রিয়কে উদ্ভাসিত আনন্দে জানাচ্ছে—Gurudev, you'll be glad to hear, I have got a son—শিশিরের চোখে মুখে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য। মাত্র ছয় বছরের বিবাহিত জীবনের পরে এমন কি হল যে

১৯১৬ সালে শিশিরের স্ত্রী আত্মহত্যা করলেন, তাও আবার ভীষণভাবে, কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে। বন্ধুবর পান্নালাল মুখুজ্যের সঙ্গে শিশিরের গভীর হৃদ্যতা ছিল, শিশিরের রাত্রে ঘুম হত না বরাবরই, অনেক সময়ে আদ্ধেক রাত্রি পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে তবে শিশির বাড়ি ফিরত, কখনও কখনও পান্নালালের মত কোনও বন্ধুর সঙ্গে বাড়ির কাছে এসেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা পায়চারি করে অনাবশ্যক আড্ডাবাজী করে সময় নষ্ট করত। পান্নালালের মুখে শুনেছি, প্রায় দেখা যেত, সেই রাত বারোটা একটায় শিশিরের স্ত্রী দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিশিরের জন্য অপেক্ষা করছে—শিশির তখন ঝামাপুকুর লেনের একটি বাড়িতে থাকত।

১৯১৬ সালে, আমার নিজের বিবাহের দুই বছর পরে (এই বিবাহে শিশির আর অন্য বন্ধুরা খুব উৎসাহ করে মেতেছিল —শ্রীরামপুরে আমার মামাশ্বশুরের বাড়িতে এই বিবাহ হয়, সকলে দলবেঁধে সেখানে বরযাত্র যায়, আর আমাদের বাড়িতে বৌভাতের দিনও সকলে মিলে এসে খুব হৈ-হুল্লোড় আনন্দ মাতামাতি করে), একদিন বেলা দুটো কি আড়াইটেয় কলকাতায় ৩ নং সুকিয়াস রোতে আমাদের বাড়িতে রয়েছি, কি একটা বাজে বই পড়ছি, এমন সময় আমাদের ইন্‌স্টিট্যুটের দলের বন্ধু ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষ হঠাৎ এসে হাজির। বয়সে আমার চেয়ে ৩।৪ বছরের বড় ছিলেন, আমরা তাঁকে "অঘোরদা" বলতুম। ইনি ছিলেন হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার বটকৃষ্ণ বা বটু ঘোষের ছোট ভাই। এঁদের বাড়ি ছিল বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে, সুকিয়াস্ স্ট্রীটের মোড়ের কাছেই। তাঁকে আকস্মিক ভাবে এই রকম আসতে দেখে আশ্চর্য লাগল, বিশেষ দেখলুম তাঁর মুখখানা গম্ভীর। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বললেন—"তোমার চেনা এ পাড়ায় কোনও অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট আছে?" "অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট!" কি ব্যাপার? অঘোরদা বললেন, ঘণ্টা দেড়েক হল, শিশিরের বউ সম্ভবতঃ আত্মহত্যা করবার জন্যই কাপড়ে কেরাসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, গা অনেকটা ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছে, কথা কয়েছিল, এখন অজ্ঞান হবার অবস্থা। খবর পেয়েই গিয়ে আমি যা দেখেছি বোধ হয় বাঁচবে না—এখন একটা dying deposition শেষ উক্তি নেওয়া দরকার, তাই অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট চাই। চমকে গেলুম। তখনই

পাড়ার মাতব্বর ছিলেন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর চণ্ডীচরণ চাটুজ্যে—তিনি এক ভদ্রলোকের নাম বলে দিলেন, প্রবীণ ব্যক্তি, নামটি ভুলে যাচ্ছি, আমাদের পাড়াতেই থাকতেন, তিনি রাজী হলেন এই শেষ উক্তি লিখে নিতে। তিনি তৈরী হতে হতেই ঘোড়ার গাড়ি এনে অঘোরদা আর আমি তাঁকে নিয়ে শিশিরের বাড়িতে এসে পৌঁছুলুম—ততক্ষণে বোধহয় পৌনে চারটে হয়ে গিয়েছিল। শিশিররা তখন আপার সার্কুলর রোডের পূবে, রাজা রামমোহন রায়ের বসত-বাড়ি এখনকার সুকিয়াস্ স্ট্রীট থানার আপিসের কাছে মুগীপাড়া লেনে একটা দোতলা ভাড়া বাড়িতে থাকত। ঐ বাড়িতেই সপ্তাহখানেক আগে শিশিরের বোন গৌরীর বিয়ে হয়েছিল, শিশিরের ভগিনীপতি শম্ভু, কৃষ্ণনগরে বাড়ি, গিয়ে দেখলুম বরকনে তখন শিশিরদের ওখানেই বিয়ের পরে এসেছে। শিশিরের বাড়িতে পৌঁছে দেখলুম, কিছু আত্মীয় বন্ধুর ভীড় বাইরে, শিশিরের এক জেঠতোদাদা নলিনীবাবু তিনি ডাক্তার, এসে গিয়েছেন, আর শিশিরের দুই হাতে হাতের পাতায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন। শিশির আমাকে দেখে ক্ষোভে কান্নার ভাব যেন চেপে বললে, "এসেছিস ? মেয়েদের সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হবি না।" অঘোরদা সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটকে উপরে নিয়ে গেলেন। মিনিট পনেরো পরে তিনি নেমে এলেন। সার্টিফিকেটের মত মুমূর্ষু উষা দেবীর জবানবন্দী ইংরেজিতে কালি দিয়ে তিনি লিখেছেন, কাগজখানি আমাদের সামনে পড়েছিলেন, আমাদের হাতে দিলেন। তিনি লিখেছিলেন—যতদূর মনে আসছে—Heard the dying declaration of the lady. (তার পরে নাম). She seemed to be in a very bad condition and appeared to be rapidly sinking into unconsciousness. She declared that out of a mistaken idea that her husband neglected her and did not love her that she had herself set fire to her sari after puring kerosine oil on her person. She was sorry for what she did, and no one was to blame for this. Before she could reply to other questions, she became unconscious. উপস্থিত দুই চার জনের নামও সাক্ষী-হিসাবে এই সার্টিফিকেটে ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় অতি সজ্জন, তাঁর সহানুভূতির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ি করে তাঁর ফিরবার ব্যবস্থা করে দিলুম। শিশিরের মুখে তখন সংক্ষেপে

কিছুটা ব্যাপার শুনলুম—পরে আরও শুনি। বাড়িতে বিবাহের ব্যাপার নিয়ে আত্মীয় স্বজন এসেছিল, শিশিরের সঙ্গে তার স্ত্রীর সে কয় দিন নিভৃতে সাক্ষাৎ হত না। শিশির একটু খুনসুড়ি করত স্ত্রীর সঙ্গে, স্ত্রী তাতে একটু রাগারাগি করত। দাম্পত্য কলহ—শিশির আজও লজ্জা পেত—নিজেও খামখা রাগ দেখাত, কথা কওয়া লোক দেখানো বন্ধ করে দিয়েছিল। এর মধ্যে স্ত্রী দুবার এসে যেচে শিশিরের সঙ্গে কথা কইতে আসে, পুরুষ-পুঙ্গব বাহাদুরী দেখিয়ে চলে যায়। এটা তার স্ত্রীর মনে লাগে, ভীষণ অভিমান হয়। আক্ষেপের বিষয়, এখানে দাম্পত্য কলহে অল্পারম্ভে এক অভাবনীয় ট্রাজেডি ঘটে গেল শিশিরের জীবনে। শিশির কিন্তু আড়াল থেকে যেন মজা দেখছিল। যেদিন ঐ ভীষণ ব্যাপার হল, সকালে শিশির আর একবার মৌখিক রাগ দেখায়। সমস্ত সকাল তার মনটা যে গুমরে উঠছিল সে খবর কেউ রাখে নি, শিশিরও নয়। তার স্ত্রী-বেশ সহজ ভাবে ননদ আর নতুন নন্দাইয়ের সঙ্গে আলাপ করেছে, নিজের বাপের বাড়ি আগরায় ননদ-নন্দাই গেলে তাদের কি কি দেখাবে সে-সব কথাও বলেছে। শিশির বাইরের ঘরে ছিল। ছোট বাড়ি—হঠাৎ একটা শব্দ হল, যেন একটা বোতল পড়ে গেল। শিশিরের মা জিজ্ঞেস করলেন—"কিসের আওয়াজ? কে যেন বোতল ফেললে?" শিশিরেরও অনুমান ছিল, বোতল স্ত্রীর হাত থেকেই পড়ে গিয়েছে, তাই স্ত্রীকে আরও চটাবার জন্য বলে উঠল—"কে আবার ফেলবে? তোমার গুণবতী বউ।" বলবার পরেই শিশিরের কেমন সন্দেহ হল, কেরাসিন তেলের বোতল ফেলতে গেল কেন? আবার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে তেতলার ছাদের দিকেই বা গেল কেন? দেরী না করে শিশিরও তেতলার ছাতে গেল, ছাতে পৌঁছেই অভাবনীয় ব্যাপার—স্ত্রীর সর্বাঙ্গ আগুনে জ্বলছে, শাড়ীটা গায়ে দুপাট করে শক্ত করে জড়ানো, ঊষা শিশিরকে দেখেই চীৎকার করে বলে উঠল, "ওগো আমায় বাঁচাও।" শিশির সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "মা, মা, শীগগির এসো, সর্বনাশ হয়ে গেল। ওরে তারু, বিশু, শীগগির সব্বাই আয়।" আর নিজের দুই খালি হাতে স্ত্রীর দেহ ধরে চাপড় মেরে মেরে আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে লাগল। দু ভাই তারাকুমার বিশ্বনাথ আর মা এরা এসে পড়লেন। বিশ্বনাথ বুদ্ধি করে ছাতের উপরে একটা ছেঁড়া শপ বা মাদুর পড়েছিল সেইটে দিয়ে বউদিদির জ্বলন্ত শাড়ীর উপরে জড়িয়ে দিলে। তাতেই আগুন নিভে গেল।

কিন্তু শিশিরের কাছে শোনা, তার স্ত্রীর পরণের শাড়ী সবটা পুড়ে যাওয়ায় জ্বলন্ত শাড়ী যেটুকু গায়ে ছিল সেটুকুও ছাড়তে চাইলে না। যা হোক, শেষটায় আগুন নিবে গেল, কিন্তু যা করবার তার চেষ্টা হল, কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেল। ধরে ধরে নিচে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। অসহ্য যন্ত্রণা—শিশিরের প্রশ্নে—"কেন এমন করলে" তার যেন সব ছেলেমানুষি সন্দেহ চলে গেল। শিশিরকে বললে, "আমি ভুল করেছি। এর কী সাজা হবে? আমি কি আবার বেঁচে উঠবো?" আর সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা—"আচ্ছা, যদি বেঁচে উঠি, আর সমস্ত গা তো পোড়ার দাগে ভীষণ হয়ে উঠবে। সবাই দেখে ভয় পাবে—তোমার মনে তখন কি হবে?" যতদূর পারা যায় সান্ত্বনা দিয়ে তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে লাগল। সকলেই মুহ্যমান। জীবনের আশা বেশী নেই। নলিনীদার আর অঘোরদার পরামর্শ মত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ডেকে শেষ জবানবন্দীর ব্যবস্থা হল।

এদিকে শিশিরের দুই হাতের চেটো আগুনে পুড়ে ফেটে গিয়েছে, মাংসের তলায় হাড় দেখা যাচ্ছে। তারও ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই করতে হল। শিশিরের মুখে যেন আর কথা বেরুচ্ছে না।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট চলে যাবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই উপর থেকে কান্নার রোল এল—তার আগেই শিশির উপরে গিয়েছিল।—সব শেষ।

আমরা তৈরী ছিলুম—শেষকৃত্য করবার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠল, পুলিসের অনুমতির আবশ্যকতা আছে কি না—আত্মহত্যা, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের নেওয়া জবানবন্দী, তা সত্ত্বেও পোস্ট মোর্টেমের হাঙ্গামা হবে কি না। মৃত্যু হল সাড়া পাঁচটা আন্দাজ। আমাদের তিন চার জনের চেষ্টায়—বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ দাস, পুলিসের বড় অফিসার রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয়ের জামাতা আমাদের সহপাঠী শিশির-বন্ধু অনিলকুমার সান্যালের যত্নে, সাহেব মহাশয়ের অনুগ্রহে যথাবশ্যক পুলিশের অনুমতি ঐ সার্টিফিকেটের আধারে পাওয়া গেল। সে সমস্ত খুঁটিনাটি বর্ণনার দরকার এক্ষেত্রে নেই।

শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে এবারও আমি কাঁধ দিলুম। শিশিরকে তার হাতের অবস্থা বুঝে নলিনীদা অঘোরদা বাড়িতে আটকে রাখলেন। শিশিরের মায়ের আকুল কান্না কানে ভেসে আসতে লাগল—"ওরে আমার শিশিরের ঘরের লক্ষ্মী এমনি করে চলে গেল রে।" শ্মশানেও শিশিরের ছোট ভাইয়েদের কান্নাও থামানো যায় না।

কি জন্য অনাশঙ্কিত ভাবে এই রকম ঘটনা ঘটে যায়, তার কোনও হদিস আমরা পাই না। 'একটা কথা শিশিরের কাছে পরে শুনেছিলুম —ঐ পাড়ায় মাস খানেক আগে কি কারণে জানি না আর একটি বউ ঐ ভাবে শাড়ীতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। শিশিরের বাড়ীতে ঐ ব্যাপার নিয়ে সকলের মধ্যে অনেক রাত পর্যন্ত কদিন ধরে চর্চা হত। শিশিরের স্ত্রীর মনের অবচেতনায় ঐ ব্যাপারটা ঘুরত হয়তো, তার পরে মানসিক দুর্বলতার কোনও মুহূর্তে হঠাৎ এইভাবে অবচেতনা থেকে কার্যক্ষেত্রে তার প্রকাশ হল। পাড়ার মুসলমান প্রতিবেশীর মেয়েদের মধ্যে দুঃখের সঙ্গে বলতে শুনি—"আহা হা, এমন রাণীর মতন বউ, এমন রাজপুত্তুরের মতন বেটা (শিশিরের এই একমাত্র সন্তান বোধ হয় তখন দুই আড়াই বছরের শিশু), তোর ঐ বেটার কথাও একবার মনে হল না, ঐ দিন সকালেও তো তাকে কোলে নিয়ে পিয়ার করছিলে।"

তার পরে প্রায় ২৪।২৫ দিন, শিশিরের হাতের ঐ ভীষণ হাড়-বের-করা পোড়া ঘা একটু না শুকিয়ে আসা পর্যন্ত আমরা দুপুরে ওর বাড়িতে যেতুম। শিশিরের অনুশোচনা—আমাকে উপদেশ—কখনও মেয়েদের ঐভাবে হেনস্থার ভাব দেখাবে না—আর তা ছাড়া অন্য প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা হল। জীবন আর মৃত্যুর এই রহস্যের মধ্যে আমাদের পরস্পরের মন আর সমানধর্মিতা আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। এই ঘটনা শিশিরকে আমাদের জনকয়েকের কাছে আরও অন্তরঙ্গ আরও আত্মীয় করে তুলেছিল।

চিরজীবন শিশিরের মনে এই দাগ রয়ে গিয়েছিল—শিশিরের মাতৃদেবীর উক্তি—এমনি করে শিশিরের ঘরের লক্ষ্মী চলে গেল—অতি সত্য কথা। উষা দেবী বেঁচে থাকলে শিশিরের জীবনের সম্ভাবনা আর সাফল্য দুইই অনন্যসাধারণও হলেও, বোধ হয় আরও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারত—কতকগুলি বিষয়ে শিশিরকে 'বাউণ্ডুলে' করে তুলত না, তাকে জীবনে reckless বা লা-পরওয়া হবার পথে ঘরের লক্ষ্মী অন্তরায় নিশ্চয়ই হতেন, শিশিরকে আরও পরিপূর্ণ মানুষ করত।

কিন্তু এই গুরুতর দুঃখেও শিশিরকে তার জীবনের ব্রত যা সে গ্রহণ করেছিল তা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। কত ঝড়-ঝাপটা তার উপর দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু শিশির ছিল অটল—তার path of rectitude সততার

পথ ছিল তার পক্ষে একেবারে ধরাবাঁধা। শিশিরের চিত্তের প্রসন্নতা চাপা পড়ে নি—তার মানসিক গুণ, তার নিরাবিল পরিহাস-প্রিয়তা, তার সব মানুষের প্রতি দরদ, এ সমস্ত শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান ছিল। তার পরিহাসপ্রিয়তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করবো। এই ধরণের ছোট-খাট কত কথা মনে আসে—শঙ্কর বাবুর বইখানি পড়তে পড়তে আমাদের সেই পুরাতন দিনগুলির কত স্মৃতি জেগে ওঠে।

শিশির যখন শিক্ষাগুরুদের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা নিয়ে নাট্যকার বৃত্তি অবলম্বন করলে, তার পূর্বে সে কয়েক বৎসর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করে বিদ্যাসাগর কলেজে। শিশির এম-এ পরীক্ষায় পাস করে যেন তুড়ি মেরে—রীতিমত পাঠ করার অভ্যাস ছিল না। আমাদের অন্যতম সহপাঠী সুহৃৎ অম্বিকা মল্লিক, যে বহু বৎসর ধানবাদে থেকে ওকালতি করে, শিশিরের এম-এ পরীক্ষার সময়ে তার তত্ত্বধারক ছিল—শিশির যে কষ্ট করে পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়বে পরীক্ষায় তৈরী হবার জন্য সে ধৈর্যও তার ছিল না। তার অভ্যাসমত মোটা বর্মা চুরুট ধরিয়ে সে টানত, অম্বিকা বইগুলি চেঁচিয়ে পড়ত, তাতে শিশিরও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করত। কিন্তু সাহিত্য-বোধ ছিল শিশিরের অসাধারণ, আর কি ইংরেজি আর কি বাঙলা, দুইয়েতেই তার দখলও ছিল লোভনীয়—প্রকাশ-ক্ষমতা অনেক তথাকথিত "ভাল ছেলে"রও ছিল না। এইজন্য সে সহজেই এম-এ পাস করে, দ্বিতীয় বিভাগে। অধ্যাপকের পদও সে পায়। কিন্তু সব সময়ে ঘরে পড়াশুনা কররার আগ্রহ বা ইচ্ছা তার হত না। অমনি সাধারণ সাহিত্যজ্ঞানের উপর দিয়েই ক্লাসে কাজ চালাত—আর চালাত সুন্দরভাবে। ইংরেজি কবিতার নাটকের পাঠেই যেন তার ব্যাখ্যা হয়ে যেত। কিন্তু এ সত্ত্বেও, মাঝে মাঝে তার একটু আধটু বিপদও ঘটত। যথাসম্ভব শিশিরের মুখের কথাতেই তার অধ্যাপক জীবনের একটি মজার ঘটনা বলি।—"ওরে, কাল বড় বিপদে পড়েছিলুম। কিন্তু গুরু বলে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলুম। জানিস তো, বইটই অভিধান ঘেঁটে পাঠ তৈরী করে যাওয়া আর ধাতে সয় না—উপস্থিত যা মনে হয়, তাই সাজিয়ে গুছিয়ে নাটকানা ভঙ্গীতে বলি, ছেলেরা ভালবাসে, তাতেই খুশী হয়—এইতে আমার রক্ষে। এখন হয়েছে কি, কাল আমি থার্ড ইয়ার ক্লাসে মিলটনের Paradise Regained পড়াচ্ছি। কবে ছাত্রাবস্থায় প্রাচীনকালে একবার ভাসা ভাসা রূপে এই নীরস কাব্য পড়েছিলুম, সব কিছু মনে নেই।

পড়াতে পড়াতে দেখি, তিন চার লাইন নীচে একটা শক্ত শব্দ রয়েছে, তার মানেটা মনে আসছে না। context থেকেও আঁচ করতে পারছি না। কি করি? মনে করলুম ঐখানেই ঐ দিনের মত ইতি করি, ক্লাসের ছুটি দিয়ে দিই। তখনও আধ ঘন্টা বাকী আছে, এত আগে ভাগে ছেড়ে দিলে ভাল দেখাবে না—বিশেষতঃ যখন আগের কয়দিন বাজে গল্প করেই কাটিয়েছি। কপাল ঠুকে তো ভাবের সঙ্গে সেই অংশটার 'রীডিং' পড়ে যেতে লাগলুম, মানে-না-জানা কথাটা অমনি আলটপ্‌কা ডিঙিয়ে এগিয়ে চললুম। সঙ্গে সঙ্গে, যেমন আশঙ্কা করেছিলুম, ক্লাসের গ্যালারির এক কোণ থেকে একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, what is the meaning of this word, sir? মনে হল, বুঝি মাথায় ডাণ্ডা মারলে—সঙ্গে সঙ্গেই যে ব্যাখ্যা চাই। এখন যদি হঠাৎ ভূমিকম্প হয়, কিংবা কোনও ছাত্র যদি ভিরমি যায়, বা চেয়ার-সুদ্ধ প্লাটফর্ম-সুদ্ধ মা যদি আমায় গ্রাস করে, তাহলে যেন বেঁচে যাই। তা তো হবে না—একটু ভাববার জন্য সময় নিলুম—চশমাখানা চোখ থেকে খুলে রুমাল বার করে খুব ভাল করে কষে ২।৩ মিনিট ধরে পরিষ্কার করলুম, তার পরে রুমাল দিয়ে মুখখানা ভাল করে মুছে যেন মুখের চেকনাই করলুম। সঙ্গে-সঙ্গে একটা brain-wave এল—একটা উত্তর জুটে গেল! চশমা পুঁছে মুখ মুছে, চেহারাটা যেন বাগিয়ে ধরে, ছাত্রটির দিকে তাকিয়ে ইশারায় তাকে দাঁড়াতে বললুম—তার পরে তাকে বললুম, you there, my friend : now take a good look at me. Do I look like a dictionary? শুনে ছেলেটী তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়, আর সারা ক্লাস হো হো করে হেসে উঠল—যেন ছেলেটাই কিছু বেকুফি করেছে। তখন গম্ভীরভাবে ছেলেদের, বিশেষ করে ঐ ছেলেটিকে উপদেশ দিলুম—আজকালকার ছেলেরা নিজে খাটবে না, অভিধানে তাদের ভয়, তারা চায় অধ্যাপক সব জিনিস তাদের গিলিয়ে দেবে। এ চলবে না। তারপরে সেই ছেলেটিকে বললুম—Look here, you must find out from the Dictionary what is the meaning of the word, and then tomorrow you must tell me and the class what the word means. See? ছেলেটি yes, sir বলে তো নিষ্কৃতি পেলে—আমিও নিষ্কৃতি পেলুম, পূর্ববৎ আমার এই অধ্যাপনা চলতে লাগল। আমি শুনে বললুম, 'ভাই শিশির, এ হল adding insult to injury, এতটা ধর্মে সইবে না, বেচারি

তোর কাছ থেকে জানতে এসেছে শিখতে এসেছে তো, তার উপরে এই ভার দেওয়া।' তখন শিশির বললে—'আরে ভাই, আমি যে ঠিক মনে করে কালকের ক্লাসের জন্য ডিক্‌শনারি দেখে ঐ শব্দটির সম্বন্ধে যে ওয়াকিফহাল হয়ে আসবো, তারই বা কি স্থিরতা আছে' ?"

এই রকম উপস্থিত বুদ্ধি ছিল শিশিরের—আর তার বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতাও উপরন্তু ছিল খুব উঁচুদরের, সেইজন্য ছেলেরা তাকে বড়ই শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। আমাদের স্কটিশ-চার্চেস-কলেজের বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার আমাদের এক সতীর্থকে বলেছিলেন, (সে যখন তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চাইলে successful professor হতে গেলে কি কি গুণ থাকা চাই)—"দেখ বাবা, তান্ত্রিকদের পঞ্চ-মকার জানো তো? শিখদের পঞ্চ-ককার জানো তো? তেমনি শিক্ষা-ব্যবসায়ে নাম করতে গেলে পঞ্চ-বকারের সাধনা করতে হয়—সেই পঞ্চ-বকার হচ্ছে, in order of their importance—বচন, বপু, বুদ্ধি, বিনয়, বিদ্যা। খুব বক্তার হলে, মুখ দিয়ে যদি খই ফোটে, তা হলে "মুখেন মারিতং জগৎ"—কথায় ছেলেদের বশে আনতে পারবে। তারপর চেহারাখানিও দশাসই হওয়া দরকার—চার ফুট আট ইঞ্চি সাইজের প্রফেসর পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি সাইজের ছাত্রকে কবজা করতে পারবে না। তারপরে চাই বুদ্ধি—ঝানু ছেলে, বার বার ফেল করা পাকা পোড়খাওয়া পাজী ছেলেদেরও বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে, কৌশলে তাদের হাত করতে হয়। তারপরে বিনয় তো আছেই—বাবা, যা প্রাণ চায় করো, তবে আইনের মাত্রা লঙ্ঘন না করে, ছা-পোষা মাষ্টার, আমার বদনাম করো না। আর শেষ দরকার—বিদ্যা। এটার আধিক্য successful professor হতে গেলে ততটা দরকার নেই।" এই উপদেশ অনেকেই মেনে নেবেন। কিন্তু শিশিরের এই উপদেশের দরকার ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তার বচন, বপু, বুদ্ধি, বিনয়, বিদ্যা সমস্তই ছিল, সে-সবের প্রয়োগও ছিল তার স্বভাব-সিদ্ধ। এটা শিশিরের ব্যক্তিত্বের যেন স্বরূপই ছিল।

এই ছিল আমাদের শিশির। কতকগুলি দুরপনেয় বাধা না পেলে, সে বাংলাদেশের, ভারতবর্ষের তথা সমগ্র জগতের সদ্‌বুদ্ধি আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরও কত বড় হতে পারত তার ব্যর্থ কল্পনা করে লাভ নেই। সে যা ছিল তাইতেই বাঙালীর আর ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক জীবনে সে অমর হয়ে থাকবে। যে সাধনায় শিশির লোকোত্তর সিদ্ধি অর্জন করে স্বদেশকে ধন্য করে গিয়েছে, তার কিছুটা পরিচয় শ্রীযুক্ত শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের এই তথ্যপূর্ণ জীবন-আলেখ্য থেকে পাওয়া যাবে, আর সেইজন্যই এই বইয়ের আদর হওয়া উচিত বলে মনে করি।

"সুধর্মা"
১লা নবেম্বর ১৯৭০ ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাক্-কথন

বাঙালীর জাতীয় নাট্য 'যাত্রা'র ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এ ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বাঙলা গীতিকাব্যের আদিগুরু জয়দেব গোস্বামী। ভারতবর্ষের আদি-যাত্রা 'রামযাত্রা'র অনুকরণে বাঙলা দেশে 'কৃষ্ণযাত্রা'র সৃষ্টি হয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' 'কৃষ্ণযাত্রা'র আদিমতম পূর্বলেখ।

ইংরেজ-আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অভিনয় বলতে বাঙালী 'যাত্রা' অর্থাৎ মঞ্চ ও দৃশ্যপটবিহীন খোলা আসরে গীতাভিনয়ই বুঝতো। বদ্ধপ্রেক্ষাগৃহে 'মঞ্চে-অভিনয়' রীতি বাঙালীর অজানা ছিল। ইংরেজের থিয়েটারই এদেশে মঞ্চাভিনয়ের উৎসমুখ খুলে দিল।

কলকাতায় ইংরেজদের মঞ্চাভিনয় দেখে বাঙালী শখের মঞ্চাভিনয়ের হুজুগে মেতে ওঠে। সেই হুজুগের মধ্যে দিয়েই যেমন কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত (৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২) হয় তেমনি এরই মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয় বাঙালীর মঞ্চাভিনয়ের নবযুগ, যে-যুগের স্রষ্টা নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নটকুলচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

গিরিশ-অর্ধেন্দুর সময়ে রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠার যুগ—অভিনেতৃসম্প্রদায় গঠনের যুগ গিয়েছে। গিরিশ ও অর্ধেন্দু ধুরন্ধর প্রতিভাশালী অভিনেতা ছিলেন কিন্তু মঞ্চপ্রযোজক ছিলেন না। তাঁদের নাট্যপ্রযোজনায় মঞ্চশিল্পচেতনার পরিচয় পাওয়া যেত না। "গিরিশবাবুরা চরিত্রের সমগ্রতা ধারণা করে অভিনয় করতেন বটে, কিন্তু নাটকের সমগ্রতার ধারণা রাখতেন না, দৃশ্য থেকে দৃশ্যেই অভিনয় করতেন।"

গিরিশ-যুগে আমাদের নাট্যশালায় দুটি অভিনয়-ভঙ্গির উৎপত্তি হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র সুরেলা অভিনয় আর অর্ধেন্দুশেখর সুরবর্জিত অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

'অভিনয়রীতিতে গিরিশ-অর্ধেন্দুধারায় ভাঁটা পড়ে এলে' যে মহাশক্তিধর পুরুষ অভিনয়-রীতির আর একটি নূতন স্বয়ংসম্পূর্ণ সজীব ধারা বাংলার নাট্যক্ষেত্রে প্রবাহিত করে দিলেন, প্রয়োগবিজ্ঞানকুশলতায় নাট্যের সামগ্রিক-রূপ প্রথম ফুটিয়ে তুলে ভারতবর্ষের মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাসে দ্বিতীয় নবযুগ সৃষ্টি-করলেন তিনিই নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

বর্তমান গ্রন্থে শিশিরকুমারের সেই অলোকসামান্য নাট্যপ্রতিভার বৈচিত্র্য

ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর নটজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাসটুকু তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অলোকসামান্য নাট্য-প্রতিভার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার আধার স্থাপন করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী অভিনয়শাস্ত্রজ্ঞ বিচারকগণের মতামতের ওপর। যাঁদের মতামত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে তাঁরা আমার নমস্য পূর্বাচার্য—তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করছি। বস্তুতঃ তাঁদেরই দৃষ্টির আলোক দিয়ে শিশিরকুমারের প্রতিকৃতিটি ফুটিয়ে তুলেছি।

প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই গ্রন্থের ২৭৮-২৭৯ পৃষ্ঠায় প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-লিখিত যে প্রবন্ধটির ('শিশিরকুমার সম্পর্কে আলোচনার ভূমিকা' ঃ 'বিচিত্রা' —শ্রাবণ ১৩৬৬) অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে সে সম্পর্কে পুনরালোচনার প্রয়োজন আছে। উক্ত প্রবন্ধে (উদ্ধৃত অংশের শেষ অনুচ্ছেদে) সৌমিত্র-বাবু শিশিরকুমারের নাট্যশালা দর্শকশূন্য হওয়ার যেসব রাজনৈতিক তথা সামাজিক কারণ উল্লেখ করেছেন সেগুলির দ্বারা আমার মনে হয় বিষয়টির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

মনে রাখা দরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলাদেশে গণনাট্য-আন্দোলনের জোয়ার আসে। গণনাট্যে মাটির মানুষের দুঃখদৈন্য, বেদনা ও সংগ্রামের কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছিল বলেই গণনাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়-প্রদর্শনীতে দর্শকের অভাব কখনও হয় নি। আবার ওই সময় থেকেই বাংলা দেশে সৃষ্ট হচ্ছিল এক নতুন সম্প্রদায় যাদের neolit নামে অভিহিত করা যায়। চলচ্চিত্র ও ব্যবসায়িক মঞ্চের প্রযোজকরা স্থূল-রুচিসম্পন্ন entertainment আর দৃশ্যপটের জাঁকজমক ও ঝকঝকে আলোর কায়দা দিয়ে নেতিবাচক বিষয়বস্তুসম্পন্ন নাটক পরিবেশন করে এই neolitদের আকৃষ্ট করলেন। এদিকে তখন গণনাট্যসম্প্রদায়ের শিল্পীরা বিভিন্ন শিবিরভুক্ত হওয়ার ফলে গণনাট্যআন্দোলনে ভাঁটা পড়েছে; status quo বজায় রাখবার জন্যে কিছুসংখ্যক আধা-ব্যবসায়িক নাট্য-সম্প্রদায় high-browদের মনোরঞ্জনের জন্যে মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-অমৃত-লাল বসু-সুকুমার রায়-তুলসী লাহিড়ীর নাটক এবং শেক্স্‌পীয়র-ইবসেন-গোর্কির নাটকের অনুবাদকে মঞ্চস্থ করতে লাগলেন। Neolit ও high-browদের রসতৃষ্ণা নিবারণের ভার নিলেন ব্যবসায়িক ও আধা-ব্যবসায়িক

নাট্যসম্প্রদায় এবং প্রথমোক্ত দর্শকদের জন্যে রইলেন গণনাট্যসম্প্রদায়। এই তিনশ্রেণীতে বিভক্ত নতুন দর্শকসমাজের মনোরঞ্জন করার মত নাটক প্রযোজনা করতে পারলেন না বলেই তাঁর নাট্যশালা দর্শকশূন্য হয়ে গেল। আবার এটাও সত্য যে শিশিরকুমার যখন সাধারণ রঙ্গালয় থেকে বিদায় নিলেন তখন ওই নতুন দর্শকসমাজই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও নাট্যোৎসবে তাঁর অভিনয় দেখতে ছুটে যেতেন কারণ ততদিনে তাঁদের উপলব্ধি হয়েছে যে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ত্রিকূটগিরি যেমন মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ তেমনি আধুনিক ভারতীয় শিল্পের ত্রিকূটগিরি গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও শিশিরকুমার।

ভারত সরকারের মানবিকী-বিদ্যায় জাতীয় অধ্যাপক ও ভারতীয় সাহিত্য-আকাদেমির সভাপতি, ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বের বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত, বহুমানভাজন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থটির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। পূজ্যপাদ আচার্যদেবের চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি।

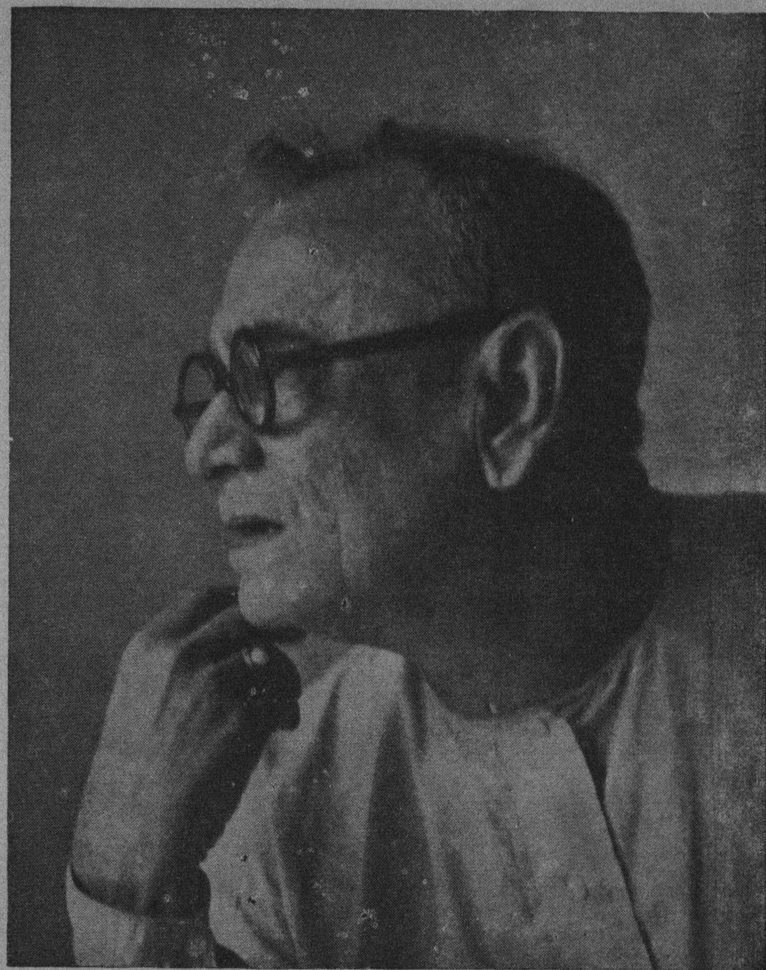
এই গ্রন্থ প্রণয়নের সূচনায় 'রূপমঞ্চ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ নদীবিজ্ঞান মন্দিরের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল মজুমদার ও প্রখ্যাত শৌখিন অভিনেতা শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র ঘোষের উৎসাহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ প্রকাশের প্রাক্কালে এঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার সময়ে আমার সহকর্মী স্নেহভাজন শ্রীমান রঞ্জিতকুমার ভট্টাচার্য্য যে-সাহায্য করেছেন, এই প্রসঙ্গে তাও উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করি।

শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

"A thing has oocurred that yesterday no one would have believed : real life has invaded the stage....The curtain parted and a new theatre came into being."

এই গ্রন্থকারের

বাংলা থিয়েটারে অভিনয়



ফোটোগ্রাফ : পরিমল গোস্বামী (১৯৫১)

শিশিরকুমার ভাদুড়ী যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নাট্যপ্রীতি ছিল। তিনি নাট্যপরিবেশের মধ্যেই পরিবর্ধিত হয়েছিলেন। মেদিনীপুরে মাতামহ গৃহে তাঁর জন্ম; জন্ম তারিখ ২রা অক্টোবর, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

শিশিরকুমারের পৈতৃক বাসস্থান ছিল হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছিতে। সাঁতরাগাছির ভাদুড়ীরা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁরা ছিলেন জমিদার, কিন্তু শরিকী ঝগড়ার ফলে জমিদারী নষ্ট হয়ে যায়। শিশিরকুমারের পিতা স্বর্গত হরিদাস অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হয়েছিলেন। তিনি রুড়কিতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চলে যান এবং সেখান থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে সরকারী পূর্তবিভাগে প্রবেশ করেন। হরিদাসবাবুর চেষ্টাতেই সংসার আবার দাঁড়ায়। তিনি ছিলেন স্বাবলম্বী ও কর্মী, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা। শিশিরকুমারও পিতার চারিত্রিক গুণগ্রামের অধিকারী হয়েছিলেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের পিতৃদেব রাজেন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের পিসতুতো ভাই। রাজেন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথই গিয়েছিলেন হরিদাসের জন্যে পাত্রী দেখতে মেদিনীপুরে। পাত্রী কৃষ্ণকিশোর আচার্যের প্রথম সন্তান ও কন্যা কমলেকামিনী। কমলেকামিনীর সঙ্গেই হরিদাসের বিবাহ হয়। শিশিরকুমারের মাতা কমলেকামিনী রূপেগুণে সত্যই তাঁর নামের উপযুক্ত ছিলেন। সাহিত্যিক প্রবোধকুমার তাঁর এক রচনায় শিশিরকুমারের মাতৃদেবীর চেহারার বর্ণনায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে শিশিরকুমারের মাতার তুলনা করেছেন। হরিদাসের ছ'টি পুত্র ও দুটি কন্যা। শিশিরকুমার দ্বিতীয় সন্তান। প্রথমা কন্যার অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। আর ছটি সন্তানের মধ্যে পঞ্চপুত্র—তারাকুমার, বিশ্বনাথ, হৃষীকেশ, মুরারীমোহন ও ভবানীকিশোর এবং কন্যা গৌরী লাহিড়ী। সকলেই পরলোকগমন করেছেন।

কমলেকামিনী দেবী ছিলেন মহীয়সী রমণী। তাঁর বৈদগ্ধ্য ও ব্যক্তিত্বে সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হতেন। শিশিরকুমারের জীবনে ছিল তাঁর মায়ের প্রচণ্ড প্রভাব। শিশিরকুমার যে সময়ে রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন তখন

ভদ্রসমাজে নটেরা ছিলেন অপাংক্তেয় ও নিন্দনীয়। পুত্রের সেই নিন্দনীয় নটজীবনবরণের সংকল্পে মাতা কোনো আপত্তি করা দূরে থাক সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করেছিলেন। যত রাত করেই ফিরুন না কেন শিশিরকুমার, স্নেহময়ী মা তাঁর জন্যে জেগে বসে থাকতেন। অসামান্য মাতৃভক্ত ছিলেন শিশিরকুমার। জীবনে কোনদিন তিনি মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নি। প্রতিদিন সকালে তিনি মাতৃপদধূলি নিতেন। এতে তাঁর কোন দিনই ভুল হয় নি। কমলেকামিনী দেবীরও থিয়েটার-প্রীতি প্রবল ছিল। প্রায়ই তিনি কলকাতার থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যেতেন। বড় ছেলেটিকেও সঙ্গে নিতেন। তাই অল্পবয়স থেকেই শিশিরকুমার গিরিশ অর্ধেন্দু থেকে আরম্ভ করে সেকালের বাংলা থিয়েটারের সব অভিনেতা অভিনেত্রীদেরই অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শিশিরকুমারের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আরও একজন। তিনি মাতামহ কৃষ্ণকিশোর। কৃষ্ণকিশোর ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ছাত্র। তিনি ছিলেন মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের হেড ক্লার্ক। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। চরিত্রমাধুর্যেও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইংরেজ সিভিলিয়ানরাও তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। মেদিনীপুর শহরে তাঁর নামে রাস্তা আছে—'কৃষ্ণকিশোর রোড'।

হরিদাস কর্মসূত্রে তখন সুদূর বর্মায় থাকতেন। তাই কমলেকামিনী দেবীকে বিবাহের পর দীর্ঘ দশ বারো বৎসর মেদিনীপুরে পিতৃগৃহে কাটাতে হয়েছে। কৃষ্ণকিশোর বালক শিশিরকুমারের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। মাতামহের কাছ থেকে শিশিরকুমার লাভ করলেন গভীর সাহিত্যানুরাগ। মাতামহ দৌহিত্রের কাছে আবৃত্তি করতেন রামায়ণ, মহাভারত, মাইকেল, শেক্সপীয়ার। দৌহিত্রের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় আবৃত্তি-প্রীতি। দুই মাতুল দেবকিশোর আর ফণীন্দ্রকিশোর। তাঁরা স্থানীয় নাট্যসমাজের সভ্য। মাতুল-সাহচর্যে অভিনয়-প্রীতি জেগে উঠছে। কিশোর শিশিরকুমার এক দিন যাত্রা দেখলেন। বাড়ি ফিরে খুব অঙ্গভঙ্গীসহকারে আর যাত্রার ধরণে সুর করে গলা ফাটিয়ে আবৃত্তি করছেন। মাতামহ শুনে বললেন, হ্যাঁ রে, তুই যখন বাড়িতে কথা বলিস, তখন কি ওই ভাবে সুর করে গলা কাঁপিয়ে বলিস? দৌহিত্র বললে, না তো। মাতামহ বললেন, তবে ওই ভাবে বলছিস কেন? যা বলবি স্বাভাবিক গলায় বল। ভাবী মহানট স্বাভাবিক

কণ্ঠে অভিনয়রীতির সন্ধান পেলেন। মাতামহগৃহেই 'প্রাক্তনজন্মবিদ্যা' স্ফূর্ত হয়েছিল।

হরিদাস কলকাতায় বদলী হয়ে এলেন। মেদিনীপুর থেকে পরিবার স্থানান্তরিত হল। উঠলেন সানকীভাঙার বাসাবাড়িতে। আবার বাসা বদল হল। উঠে এলেন বউবাজারে রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে। কিশোর শিশিরকুমারকে বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল।

পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের আবৃত্তির অভ্যাসও চলতে থাকে। বাড়িতে সব সময়েই শোনা যায় তার গলা। যখন যাকে পায় ডেকে এনে কবিতা পড়ে শোনায়। ছেলেটিকে সবাই সেইজন্যে এড়িয়ে চলতে চায়। বাইরের লোকের কাছে অবশ্য কবিতা আওড়াবার সাহস তখনও হয় নি। বাড়িতে অনেক লোকজন, তাদের সবাইকে শোনায়। একদিন মার সঙ্গে গিয়ে 'জনা' দেখে এসেছে। তারপর 'জনা' পড়ে সবাইকে সেকালের নামজাদা অভিনেত্রী তিনকড়ির সুর নকল করে শুনিয়েছে। মাঝে মাঝে দেখা যায় ঘরে রঙবেরঙের কাপড়ের সীন টাঙিয়ে ভাইদের নিয়ে অভিনয় করতে। অভিনয়ের নেশায় মন রঙীন। স্কুলের জলখাবারের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এখন একলা একলা থিয়েটার দেখতেও যায়।

১৯০৫ সালের কথা। স্টার থিয়েটারে নতুন বই খোলা হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ'। ছেলে ছুটলো স্টারে টিকিট কাটতে। তখন ষ্টারের ম্যানেজার রসরাজ অমৃতলাল বসু। যে-সে লোক নন। দুরন্ত প্রতিভাধর। একাধারে লেখক, বাগ্মী, নট, নাট্যকার। তখনকার বাংলা থিয়েটারে গিরিশ-অর্ধেন্দুর পরেই এঁর স্থান। অমৃতলাল কাউন্টারের কাছে বসে আলবোলা টানছেন। দেখলেন বালকের এক ছেলে থিয়েটারের টিকিট কাটছে। তাঁর নৈতিক দায়িত্ববোধ জেগে উঠল। ধমকে ছেলেটিকে তাড়িয়ে দিলেন। অমৃতলাল তখন তো আর জানেন না এই ছেলেটিই গোকুলে বাড়ছে, একদিন বসবে বাংলার নাট্যসিংহাসনে।

*　　*　　*　　*

দুই

সেই বছরেই অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুল থেকে শিশিরকুমার এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন (পরে ডাফ কলেজের সঙ্গে মিলে গিয়ে স্কটিশ চার্চেস কলেজ এবং শেষে স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত) থেকে বি. এ. এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম. এ. পাস করেন। কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুশীলকুমার দে, প্রিন্সিপাল যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী, ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, জে. পি. নিয়োগী, সুশীল মৈত্র, সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্র হালদার, আনন্দ সিংহ, নীহার মিত্র, সাহেদ্‌ সুরাবর্দি, যতীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কান্তি মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা মল্লিক ও অভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্র। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এম. এ. পাস করার কথা কিন্তু পাস করলেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ সম্বন্ধে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—"He was so far as his studies were concerned not determined enough. He took things easy and that was why he was late for his M. A. by two years. He seemed to enter the examination hall in a light spirit. But it was his fine literary taste and excellent command of English that helped him through. His text books were mostly read out to him by his classmate Ambika Mullick." স্বর্গত ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"শিশির পড়িত, কিন্তু পরীক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব ছিল না। নিজের রুচির তাগিদে, খেয়ালখুশীর যদৃচ্ছ নির্বাচনে তাহার পড়ার বিষয় নিরূপিত হইত। যে কেন্দ্রশাসিত, উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত-বৃত্তির অনুশীলনে পরীক্ষায় ভালো করা যায়, তাহা শিশিরের যাযাবর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।" আচার্য সুনীতিকুমার লিখেছেন যে, শিশিরকুমার ছাত্রজীবনে ছিলেন—"সবচেয়ে বিভূতিমান ছাত্র। পরীক্ষায় সে ভালো করতে পারে নি। কিন্তু তার বিষয় অর্থাৎ সাহিত্যে—ইংরেজি ও বাংলায় সে অদ্ভুত জ্ঞান ও বিচারশক্তির অধিকারী ছিল। ইংরেজী সাহিত্যে শেক্‌স্‌পীয়ার প্রভৃতি বড় বড় ইংরেজ

লেখকের অনেক বই তার যেন নখদর্পণে ছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে তার বোধ ছিল খুবই প্রাচীন বা প্রৌঢ়। ইংরেজী ভাষা তার ভালোভাবেই আয়ত্ত করা ছিল; আর ইংরেজী বাংলা পাঠভঙ্গিও তার ছিল অনবদ্য।" শিশিরকুমার শিক্ষক ও অধ্যাপকদের নিকট অকুণ্ঠ স্নেহ ও সমাদর পেয়েছিলেন। সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চালচলন ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হতেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসন মঞ্চে শেক্‌স্‌পীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে 'ব্রুটাস'-এর ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনেতা-রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ। সহপাঠীদের মধ্যে আনন্দকৃষ্ণ সিংহের Casca, শচীন্দ্রনাথ বসুর Cassius এবং যতীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের Portia-র ভূমিকা ছিল। এই অভিনয় প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের জন্য সাজ-পোশাক কলেজের ছাত্ররা (বিশেষ করে আমি ও আমার দুজন সহপাঠী) নিজেরাই রোমান ইতিহাস পড়ে যতদূর সম্ভব রোমানযুগের মতো তৈরি করে নিয়েছিল। ব্যাশকারী হয়ে নেপথ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম আমি। শিশিরকুমারের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। পোশাক দেখে সমঝদার লোক হেসেছিলেন, তবে আমাদের উৎসাহকে তাঁরা ক্ষুণ্ণ করেন নি। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল শিশিরের ব্রুটাসের অভিনয়। আমরাও দর্শকের সারিতে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য আবৃত্তি অভিনয় দেখেছি... ..সাহেব অধ্যাপকরা আর অন্য গুরুস্থানীয় ব্যক্তিরা খুবই তারিফ করলেন। এইভাবে কলেজে শিশিরের প্রথম জয়জয়কার হল।"

শিশিরকুমারের ছাত্রজীবনের একটি মনোরম চিত্র উপহার দিয়েছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন: "১৯০৮ সালে স্কটিশচার্চ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমি পল্লীগ্রামের ছেলে প্রথম শহরে আসিয়া অনভ্যস্ত পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করিতেছি। সুতরাং সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিয়া শিশিরের মত রূপে উজ্জ্বল, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির, বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল ছেলের সহিত আলাপ জমাইবার মত সাহস আমার ছিল না। পল্লীগ্রামের স্কুল-কলেজে যে-সমস্ত সহপাঠীর সহিত মিশিয়াছি, শিশির তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। তাহার গ্রীকদেবতার মত সুঠাম অঙ্গ-বিন্যাস, অনর্গল ইংরাজী বলার ক্ষমতা, অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রায় সমানভাবে মেশার সাহস, সহপাঠী মহলে জনপ্রিয়তা ও প্রভাব—এ সবই আমার মত আনাড়ী নবাগতের পক্ষে অভাবনীয়ই মনে

হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আমাদের অন্তরঙ্গতা মুখ চেনাচেনির, যাতায়াতের সময়ে মাথা হেলাইয়া পরিচয়-স্বীকৃতির বেশী অগ্রসর হয় নাই। তবে আরও একটা কারণ ছিল যে, শিশির ক্লাস-পলাতক ছেলের দলে ছিল—যাহারা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকিত, তাহাদের সঙ্গে শিশিরের ঘনিষ্ঠতা হইবার কথা নয়। ক্লাসে তাহার গতিবিধি অতর্কিত, অনিয়মিত ও খেয়ালখুশী নিয়ন্ত্রিত ছিল। এমন কি ইংরেজী অনার্স ক্লাসের স্বল্পসংখ্যক ছাত্রের মধ্যেও তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তখন কলেজের বহির্ভূত যে বহুবিস্তৃত, নানা প্রতিষ্ঠানে শাখায়িত আড্ডা মজলিশের আয়োজন ছিল, সেইখানে যে তাহার প্রধান আকর্ষণ ও তাহার শক্তির স্বচ্ছন্দ লীলাময় বিকাশ এ রহস্যটি তখন জানিতাম না, পরে জানিয়াছিলাম।

অবশেষে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিবার পর সহপাঠিত্বের এই সামান্য-আলাপ—ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। ইতিমধ্যে হয়তো আমার সহপাঠীদের মনে আমার সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব ধারণার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিবে। আমার গ্রাম্য চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদে রুচিহীনতা ও আলাপ-আলোচনায় আড়ষ্টতা হইতে আমাকে যতটা নির্বোধ মনে হইত ঠিক হয়তো আমি ততটা নই, এরূপ একটা সংশয় তাহাদের মনে জাগিয়া থাকিবে, কাজেই আমার প্রতি আচরণে অবজ্ঞার মধ্যে একটা ক্ষীণ সম্ভ্রমও হয়তো দেখা দিতে শুরু করিল। এই সন্ধিক্ষণেই শিশিরের সঙ্গে গাঢ়তর বন্ধুত্বের সূচনা। এই বন্ধুত্ব অঙ্কুরিত হয় কলেজে নহে, আমাদের ছাত্রাবাসে। সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধবের আকর্ষণে আমাদের আড্ডা-মজলিশে শিশিরের প্রায় দৈনিক আগমনই ঘটিতে লাগিল ; এই তরুণ-সমাজে তখন কি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা আমোদ-উদ্ভাবনে কি নব-নব প্রয়াস, প্রাণ-চাঞ্চল্যের কি উদ্দাম কল্লোলিত প্রবাহ। এই মজলিশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি খেলা-ধূলার নেশা, কি কৌতুক-রঙ্গরসের উচ্ছ্বাস, আলোচনার কি প্রচণ্ড আলোড়ন! পরবর্তী জীবনে শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে যাহারা দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইজন—শিশির ভাদুড়ী ও নরেশ মিত্র—এই আড্ডায় অজ্ঞাতসারে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করিতেছিল।

এই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী-সম্মেলনেই শিশিরের অন্তরের সবটুকু পরিচয় পাইলাম—তাহার অদম্য জ্ঞান-পিপাসা, ক্ষুরধার মনীষা, কাব্য সাহিত্যের প্রগাঢ় রস-

বোধ, যুক্তি-তর্কের সাহায্যে পরমতখণ্ডন ও নিজমত-প্রতিষ্ঠার আশ্চর্য, কৌশল, সংলাপের সরসতা ও আঘাত-প্রতিঘাত-নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি তাহার উদার আত্মভোলা, বন্ধুবৎসল হৃদয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবেশে সেই আমাদের প্রথম পথ-প্রদর্শক। আমাদের কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ তখনও স্কুল-কলেজের ছাত্রদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত ছিলেন ঃ মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রই আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ কবিত্বের আদর্শ স্বরূপ বিরাজিত। শিশির মাইকেল-প্রতিভা স্বীকার করিত ; কিন্তু হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না ; রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ কবি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে সে বদ্ধপরিকর ছিল। কবিত্ব-বিচারের যে মানদণ্ড সে উপস্থাপিত করিত তাহা তখন আমাদের নিকট প্রায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। হেমচন্দ্রের একটি দুর্বল পংক্তি—'মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি'—উদ্ধার করিয়া সে তাঁহার কবিযশঃ-স্পর্ধিতাকে শ্লেষবাণে জর্জরিত করিত। আর যুক্তি-বিচার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ও প্রত্যক্ষতর উপায়ে—তাহার মধুর উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্র-নাথের কাব্য হইতে দীর্ঘ আবৃত্তি করিয়া—সে আমাদের রবীন্দ্রকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে বাধ্য করিত। আমরা হয়তো যুক্তিকে যুক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু অনুপম কণ্ঠস্বরে অনর্গল উদ্গীরিত, ভাব ও রসের সুষ্ঠু প্রকাশের মোহময় সেই ছন্দসংগীতপ্রবাহকে ঠেকাইব কি দিয়া? বাস্তবিক, কাব্য-আবৃত্তি যে এত মধুর হইতে পারে, কবিতার রস যে এমন প্রাণস্পর্শীভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে, বিশুদ্ধ, ভাবানুগামী উচ্চারণ যে অন্তরের এত গভীরে আবেদন সঞ্চার করিতে পারে, আমরা শিশিরের সুধাস্রাবীকণ্ঠ হইতে তাহার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে যেমন মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ হরিদাসী বৈষ্ণবীর তালমানলয়শুদ্ধ, ভ্রমর-গুঞ্জনবৎ এক অব্যক্ত অনুভূতি-মূর্চ্ছনার অন্তশ্ছন্দে অনুরণিত অপূর্ব সংগীত হতবুদ্ধি হইয়া শুনিয়াছিল, আমরাও সেইরূপ মন্ত্রমুগ্ধবৎ শিশিরের আবৃত্তি শুনিতাম।

আমার মনে হয় এই ভাবানুগামী, রসোচ্ছল আবৃত্তিই শিশিরের অভিনয়-কলা-সিদ্ধির প্রথম অঙ্কুর। আবৃত্তি হইতে অভিনয় মাত্র একপদ অগ্রসর হওয়া। বিশেষতঃ তাহার আবৃত্তির মধ্যেই অভিনয়ের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল। শিশির শেষের দিকে আবৃত্তিকেও অনেকটা অভিনয়সঙ্কেতবাহী করিয়া তুলিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের শিল্পীর প্রয়োগে ইহা যে অনেকটা

ভঙ্গীপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না, তবে শিশিরের অসাধ্যসাধনক্ষম প্রতিভা এই বিপদ-সম্ভাবনাকে অনায়াসে কাটাইয়াছিল।”

শিশিরকুমারের আবৃত্তির মধ্যেই যে অভিনয়ের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল সেটি তাঁর আবাল্য বন্ধু স্বর্গত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মশায়েরও সে-সময়ে চোখে পড়েছিল। তিনি লিখেছেন: “সে সময়ে পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইনষ্টিটিউটের জ্ঞানপ্রিয় মিত্র এবং আরও অনেকে আবৃত্তি করতেন। এঁরা প্রধানতঃ রৌদ্র, করুণ ও হাস্যরসকে কণ্ঠস্বরে ফুটিয়ে তুলতেন। কিন্তু শিশির এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আনলে ভঙ্গী ও অভিনয়। সেদিন সে রবীন্দ্রনাথের বন্দীবীর আবৃত্তি করছিল। দেখলুম—কণ্ঠস্বরের উপর তার কি আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণী শক্তি! সে শক্তি দুর্লভ সাধনার অপেক্ষা রাখে! কবিতার প্রত্যেকটি পংক্তির ভাবকে সে ভঙ্গিমার ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুললে। যখন সে বললে—‘ছুরি বসাইল বুকে’—তখন সে ভঙ্গিমায় এবং ছুরি কথাটির উচ্চারণের বিশেষ কায়দায় মনে হল যেন, সত্যই একটা ছুরি এসে বসল। আমরা লক্ষ্য করেছি শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই বুকে হাত বুলোচ্ছে।”

তিন

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের জুনিয়ার মেম্বার হন। এই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের শৌখীন রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আবৃত্তি ও অভিনয় প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা গেল তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ অধ্যায়ে। এই পর্বটিকে তাঁর জীবনব্রতসাধনের প্রস্তুতি পর্ব বলা চলে। সে-জীবনব্রত গিরিশোত্তর জীর্ণ বাংলা রঙ্গমঞ্চকে নতুন জীবন দান করা। ছাত্রজীবনেই তিনি নটগুরু গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। তখন তাঁর সতেরো বছর বয়স।

কলকাতার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্রদের সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের জন্য ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল “Society for the higher training of youngmen.” এই প্রতিষ্ঠানটির জন্মলগ্নে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস, রমেশ দত্ত, সুরেন বাঁড়ুয্যে, আনন্দমোহন বসু ও

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ইনষ্টিটিউটের প্রথম নাট্যানুষ্ঠান হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী। মেঘনাদবধ অভিনীত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাটকাকারে রূপ দেন। অভিনয় পরিচালনা করেন নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। এই অভিনয়ের উদ্বোধনী-ভাষণে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন: "I believe that this performance will in future determine and guide the national stage." আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী; বাইশ বছর পরে ইনষ্টিটিউটই আমাদের উপহার দিয়েছিল বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় নবযুগপ্রবর্তক অদ্বিতীয় অভিনেতা শিশিরকুমারকে। তখনকার নাট্যজগতে ইনষ্টিটিউটই নবযুগের সূচনা আনে।

ইনষ্টিটিউটের সর্বাঙ্গীন উন্নতির মূলে ছিল বিশেষ করে একটি মানুষের দান। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এইচ্. আর্. জেম্স্ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "Prof. Benoyendra Nath Sen wielded a great influence among the general body of the students in Calcutta....He was for many years Honorary Secretary of the Calcutta University Institute and here his influence was very great. He quickened its life and enlarged its activities." বিনয়েন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠিত বিনয়েন্দ্রনাথের সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভায় শিশিরকুমার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন: "তখন ইনষ্টিটিউটে আমাদের আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্র ছিলেন বিনয়েন্দ্রনাথবাবু। তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি, ছাত্রজীবনে তা আর কারও কাছ থেকে পাই নি। নাটক ও রঙ্গমঞ্চকে তিনি যে কতখানি ভালবাসতেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর একটি বিখ্যাত বক্তৃতায়— Student life and the stage. এ বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন ১৯০১ সালে। এ বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য যে কত গভীর, তা তাঁর এই বক্তৃতাটি পড়লে বোঝা যায়।"

ইনষ্টিটিউটে শিশিরকুমার 'নিজ স্বচ্ছন্দ মানস-বিহারের সিংহাসন' পাতলেন। এ প্রসঙ্গে অমল হোম লিখেছেন: "He was easily the most popular junior member of the Institute with his wide reading, ready wit and charming manners. He took kindly

to me from the very begining. We shared our love of literature and deep admiration for Rabindranath. He soon drew me inside the inner circle of his friends, who had formed a small club of their own within the Institute. It came to be known as the Marigold club, because it used to meet on the steps of the southern porch of the premises, then occupied by the Institute, facing a plot, adjoining College Square, overgrown with rich shrubs of marigold. There was no subject under the sun, which was not discussed there, and there was no one who held the attention and admiration more than Sisir Kumar did in that gathering of 'student elect.' It was mainly through his active support that I could win my election as an under-Secretary of the Institute in 1911-12. He was more pleased than I was at my success. His close acquaintance with Shakespeare, whose plays he knew from cover to cover, was more than evident as he would delight and edify us with his magnificent recitals often followed by critical comments revealing the depth of his knowledge. There was hardly anyone to match him there except K. C. Sen and S. K. Haldar."

কবিশেখর কালিদাস রায়ও ইনষ্টিটিউটের সভ্য ছিলেন। তিনিও তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ

"শিশিরের চলাফেরা, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, বাচনভঙ্গী, উচ্চারণ ছিল সবই অসাধারণ। দেখেই মনে হয়েছিল—এই যুবকটি আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ। তবে কোন্ পথে তার স্বাতন্ত্র্য অসামান্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে, তা তখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি। শিশির ইংরাজী, বাংলা কবিতা চমৎকার আবৃত্তি করত, যেমন সুনীতিকুমার সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করত চমৎকার। যখন-তখন তার গলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্গীরিত হত স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ইনষ্টিটিউট হলে ঢুকত সে আবৃত্তি করতে করতে। শিশির কবিতা খুব ভালবাসত, আমি তখনকার ছাত্র-সভ্যগণের মধ্যে একাই কবিতা লিখতাম।

কাজেই আমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা সহজেই ঘনীভূত হয়েছিল। তখন আমার কবিতা বেরুত ভারতী, প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকায়—শিশির সেগুলো সাগ্রহে পড়ত এবং যাতে আবৃত্তিযোগ্য কবিতা আমি বেশি বেশি লিখি সেজন্য আমাকে উৎসাহিত করত। শিশিরের ভাবগদ্‌গদ্‌ ভঙ্গী, কাব্যরসবোধ, বাহ্য বিষয়ে ঔদাস্য আবৃত্তির তরঙ্গিত ঔদাত্ত্য দেখে মনে হত—সে নিশ্চয়ই কবিতা লেখে। পরে বুঝলাম, সে কবিতা লেখে না—তার জীবনটাই একখানি রসাঢ্য কাব্য।

আমার মনে হয় ১৯১০-১৩ সাল আমাদের ইনষ্টিটিউটের বিক্রমাদিত্যের যুগ (Augustan age) তখন ইনষ্টিটিউটে যাঁরা সভ্য ছিলেন, তাঁদের কেউ দেশ ও সমাজে পরবর্তী জীবনে নগণ্য হয়ে থাকেন নি। আমি তাঁদের সকলেরই বন্ধুত্ব লাভ করেছিলাম, বিশেষ করে কবি বলেই। প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আমাদের একটি স্বতন্ত্র বন্ধুগোষ্ঠী ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা কলেজ স্কোয়ারের সামনে হলের বারান্দায় কখানি বেঞ্চিতে বসতাম. সামনে ছিল গাঁদা বন। সুনীতিকুমার তার নাম দিয়েছিল মেরি গোল্ড ক্লাব। রঙ্গ-রসিকতাই ছিল এর প্রধান উপজীব্য। শ্রীশ (স্থাপত্য শিল্পবিশারদ) ছিল সবচেয়ে রঙ্গরসিক। শিশির আবৃত্তি করে আমাদের বৈঠকটিকে সঞ্জীবিত রাখত। আমি আমার বল্লরী নামক কবিতার বইখানিকে সুনীতিকুমার-শিশিরকুমার প্রমুখ মেরি গোল্ড ক্লাবের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে এই বলে উৎসর্গ করেছিলাম। শিশির উৎসৃষ্ট প্রস্তক পেয়ে আমাকে বলেছিল—যাক, আমাদের মেরি গোল্ড ক্লাব স্মরণীয় হয়ে থাকল কিন্তু এ বইটাতে একটিও আবৃত্তিযোগ্য কবিতা নেই—আমি এর প্রতিদান দেব কি করে ?"

চার

এইবার ইনষ্টিটিউটের নাট্যাভিনয়-প্রয়াসের প্রসঙ্গে আসা যাক। কলকাতায় ইনষ্টিটিউটই তখন নাটকের প্রযোজনায় আনে নূতনত্ব। এই জন্যই ইনষ্টিটিউটের নাট্যাভিনয়ের এত সুনাম হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার লিখেছেন : "বাংলাদেশে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের অভিনয়গুলির একটি বিশেষ সার্থকতা এবং মূল্যবান স্থান আছে। প্রাচীন ভারতীয় পারিপার্শ্বিকে যে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় হত তার বাতাবরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাস্তুকৃতি, শিল্পবস্তু প্রভৃতি যাতে

যথাসম্ভব প্রাচীন ভারতেরই মতো হয়, যাতে আমাদের যাত্রার ঝলমাচুমকি, ঝলমলে পোশাক, রঙীন ভেলভেটের হাপপ্যাণ্ট, কোট, ওয়েস্ট কোট, আচকান, পিঠবস্ত্র প্রভৃতি মিলে জিনিসটাকে জবরজং আর কিম্ভূতকিমাকার না করে, সে বিষয়ে গোড়া থেকেই আমরা দৃষ্টি রাখতুম।"

অবশ্য এ চেতনা এনে দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পুনরায় সুনীতিকুমারের লেখা উদ্ধৃত করি : "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিয়ে তিনি সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করালেন—কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র'। শাস্ত্রী মহাশয় নিজে ছিলেন ইতিহাসবিদ। তাই প্রাচীনকালের পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সংস্কৃত বই থেকে ও প্রাচীন নক্সা ও চিত্র থেকে ঠিক করে ঐ নাটকের অভিনয়ের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভারত আর সাঁচীর পাগড়ির নকলে সেলাই করা পাগড়ি, ডাকের সাজের নানারকম গয়না, বিভিন্ন রঙিন কাপড়ের জরিপাড় বেনিয়ান আর আংরাখা…এসব তিনি করেছিলেন। তাঁর প্রযোজনার এইরকম একটা নূতন সুরুচিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের অভিনয় বিভাগের সদস্যরা বিশেষভাবে উপকৃত হন।"

ইনষ্টিটিউটের অভিনয় সাফল্যের মূলে আর একটি বড় জিনিস ছিল। সেটি হল team spirit বা সংঘচেতনা। সুনীতিকুমারের কথায় : "এই সংঘচেতনা গড়ে তুলবার মতো আকর্ষণী শক্তি ছিল শিশিরের। চেহারায়, চালচলনে, কথাবার্তায় একটা সহজ আন্তরিক হৃদ্যতায় শিশির সকলকেই আপনার করে নিতে পারত।"

আগেই বলা হয়েছে ইনষ্টিটিউটের প্রথম অভিনয় 'মেঘনাদ বধ' অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই নাট্যানুষ্ঠানে বাংলার ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন উপস্থিত ছিলেন। মেঘনাদের ভূমিকায় অভিনয় করেন দ্বারকা বন্দ্যোপাধ্যায় আর রামের ভূমিকায় কিরণচন্দ্র দত্ত।

লক্ষ্মণকে বিদায় দেওয়ার আগে রাম আশীর্বাদ পাবার জন্য যখন দেবী-পূজায় নিরত তখন স্যার জন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'এখানে কি করা হচ্ছে?'

শাস্ত্রীমশাই উত্তরে বলেন,—'রাম প্রার্থনা করছেন।'

'ও, প্রার্থনা ?'—অমনি স্যার জন শ্রদ্ধাভরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দর্শকও চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়াস সীজার অভিনীত হয়। ছোট লাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার দেখতে এসেছিলেন। তৃতীয় অঙ্কে জুলিয়াস সীজারকে যখন হত্যা করা হয়, সেই সময় কবি সিন্নার দু' একটি সামান্য কথা ছিল, অভিনেতা কথাগুলো ভুলে গিয়েছিলেন। স্মারক বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেও অভিনেতার মুখ দিয়ে কথা আর বেরোয় না। অনেক পরে হঠাৎ সে বলে ওঠেঃ **'Liberty ! Freedom ! Tyranny is dead ! Run hence, proclaim, cry it about the streets."** এবং এই বলে দ্রুত প্রস্থান করে। এই অংশটুকুর অভিনয়ে ছোট লাট বহুক্ষণ পর্যন্ত হাততালি দেন এবং অভিনেতাকে একটি সোনার পদক দিয়ে অভিনন্দিত করেন। ছোট লাট বলেন, সিন্না রক্ত দেখে একেবারে বাক্-রহিত হয়ে পড়েছিল এবং অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পেলে তার কথা বলে। ছোট লাট বলেন, এইটুকুর অভিনয়েই অভিনেতা খুব কলাসম্মত অভিনয় করেছেন। সকলে অবাক—পার্ট ভুলে গিয়েও অভিনেতা সোনার মেডেল পেলেন। মার্কাস ব্রুটাসের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

পরের বছরই অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার জুনিয়ার মেম্বার হয়ে ইনষ্টিটিউটে যোগ দিলেন। সে বছর রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' অভিনীত হয়। শিশিরকুমারকে রেবতীর ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি ঐ নাটকে কোন অংশই গ্রহণ করেন নি।

ইনষ্টিটিউটের অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। "সে সময় ইনষ্টিটিউটে যতগুলি নাটক অভিনীত হয়েছে, প্রত্যেকটিরই নাট্যশিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। তাঁর আন্তরিক সাহায্য ব্যতিরেকে এতগুলি নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হত কিনা সন্দেহ। সন্তানের প্রতি মায়ের টানের মত মন্মথমোহনের নাড়ীর টান ছিল ইনষ্টিটিউটের সভ্যগণের প্রতি। শিশির-প্রতিভার বিকাশ সাধনের মূলে ছিল তাঁর অভিনয় শিক্ষা-পদ্ধতির অভিনব কৌশল।"

শ্রীকুমারও লিখেছেন যে শিশিরকুমারের "প্রতিভার নবোন্মেষিত অঙ্কুরে কে বারি-নিষেক করিয়াছিল জানি না—আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ, সৌভাগ্যক্রমে

এখনও জীবিত—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু (শিশিরকুমারের মৃত্যুর তিন মাস পরেই ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর মন্মথমোহনের মৃত্যু হয়) হয়তো এই হাতেখড়ির ব্যাপারে কিছুটা কৃতিত্বের অধিকারী বিবেচিত হইতে পারেন। কিন্তু মনে হয় শিশিরের অভিনয়ে জন্মগত অধিকার, নৈসর্গিক নৈপুণ্য। মাছ যেমন স্বচ্ছন্দে জলে সাঁতার দিতে শেখে, পাখী যেমন জন্মের পরই নীল অখণ্ড আকাশে পক্ষ বিস্তারের শক্তি অর্জন করে, শিশিরও সেইরূপ রঙ্গমঞ্চের মায়ালোকে সহজ বিচরণের অধিকারী হইয়াছিল।"

মন্মথমোহনের জন্ম ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। স্কটিশ চার্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। পরে স্কটিশচার্চ কলেজে তিনি বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন এবং শেষে সহকারী অধ্যক্ষ হিসেবে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি Emeritus Professor হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গিরিশ লেকচারার' রূপে তিনি 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্মথমোহনকে 'সরোজিনী স্বর্ণপদক' দানে সম্মানিত করেন। শিশিরকুমার বলেছিলেন: "আমার জীবনের এক স্মরণীয় ক্ষণে নটের বৃত্তি গ্রহণ করবার সময়ে আমি আচার্য্য মন্মথমোহনের কাছ থেকেই উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলাম। তিনিই আমার জীবনের গতি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন এবং তারই ফলে বাংলাদেশের পেশাদারমঞ্চে দেখা দিল নূতন জীবন।" শিশিরকুমারের মৃত্যুতে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পান। শিশিরকুমারের পরলোকগমনে স্কটিশচার্চ কলেজে অনুষ্ঠিত শোকসভায় মন্মথমোহন এক লিখিত ভাষণে বলেছিলেন: "পিতার শ্রাদ্ধ পুত্রে করিয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যদি দৈবক্রমে পিতাকে পুত্রের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তবে তাহা কিরূপ কষ্টকর সকলেই বুঝিতে পারেন। শিশিরকুমার ছিল আমার পুত্রাধিক স্নেহাস্পদ শিষ্য।"

মন্মথমোহনের সম্পর্কে সুনীতিকুমার লিখেছেন: "আমাদের মাষ্টারমশাই অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু একাধারে ছিলেন শিক্ষক ও নাট্যাচার্য্য। মন্মথবাবু স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, কিন্তু কলেজে আমাদের বাংলা ক্লাস নিতেন। নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল। আমাদের ছাত্রদের অভিনয় ব্যাপারে অতি সহজেই তিনি শিক্ষাগুরুর আসন

পেয়েছিলেন। তাঁরও ছাত্রদের আপন করার শক্তি ছিল আর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি এই বিষয় ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। অধ্যাপকের মর্যাদার সঙ্গে নাট্যগুরুর মর্যাদা দুই-ই তাঁতে মিলে গিয়েছিল।"

* * * *

পাঁচ

ইনষ্টিটিউটের অভিনয়ে শিশিরকুমার প্রথম অংশ গ্রহণ করেন 'হ্যামলেট' নাটকে। অভিনয় হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ। শিশিরকুমার একসঙ্গে দুটি ভূমিকা গ্রহণ করেন—ক্লডিয়াস আর হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা। "তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য তখন থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ইনষ্টিটিউটে তাঁর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।"

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর নবীনচন্দ্র সেনের বিখ্যাত কাব্য 'কুরুক্ষেত্র' মঞ্চস্থ হয়। কুরুক্ষেত্রের নাট্যরূপ দেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। তিনি অভিনয়-শিক্ষকও ছিলেন। শিশিরকুমার অভিমন্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তির দ্বারা সকলকে মোহিত করেন। এই নাটকে শিশিরযুগের আর এক দিকপাল অভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্র 'দুর্বাসা'র ভূমিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ছাত্র-সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য 'কুরুক্ষেত্র' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ওই বছরেরই ১১ই অক্টোবর।

শ্রীমণি বাগচীর 'শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে অ্যান্টোনিওর ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি লিখেছেন: "কলেজে তিনি 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে অ্যান্টোনিওর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, নরেশ মিত্র শাইলকের। শিশিরকুমার তখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।"

এই প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার বর্তমান লেখককে এক চিঠিতে লিখেছেন: "After I passed my Intermediate Examination in Arts, I joined Presidency College and it is very likely that when in his 4th year, Sisir took part in the staging of Merchant of Venice. But I do not know what part he took [illegible]

কিন্তু শ্রীরবি মিত্র ও শ্রীদেবকুমার বসুর 'শিশির সান্নিধ্যে' গ্রন্থ থেকে অন্য সংবাদ পাচ্ছি। সেই গ্রন্থ থেকে শিশিরকুমারের উক্তি উদ্ধৃত করি : "মাকু (স্কটিশচার্চ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ম্যাকলীন সাহেব) মানুষটি খুব সরল ছিল আর থিয়েটারের ওপর ওর ঝোঁকও ছিল। শেক্‌স্‌পীয়ারের যে কটি নাটক ও অভিনয় করেছিল সে কটি খুব ভালো জানত। নরেশের সঙ্গে অভিনয় করেছিল—নরেশ শাইলক আর ও অ্যান্টোনিও।"

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইনষ্টিটিউটে গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব' নাটক অভিনীত হয়। শিশিরকুমার নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তিতে সকলেই মুগ্ধ হয়। 'মার'-এর অনুচর—এই একটি ছোট্ট ভূমিকায় নরেশ মিত্র অদ্ভুত অভিনয় করেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইনষ্টিটিউটে দ্বিজেলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনীত হয়। শিশিরকুমার 'চাণক্য' আর নরেশচন্দ্র মিত্র 'কাত্যায়ন'। এঁদের দুজনের অভিনয়ে যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়েছিল। অন্যান্য ভূমিকা-লিপি : চন্দ্রগুপ্ত—ইন্দুকান্তি বসু, সেকেন্দার শাহ—বীরেন দাশগুপ্ত, চন্দ্রকেতু—শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, নন্দ—রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্ধ ভিক্ষুক—জ্ঞান-প্রিয় বসু।

ইনষ্টিটিউটের হীরক জুবিলি স্মারক-গ্রন্থে এই অভিনয়-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ডি. এল. রায়ের চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন ইনষ্টিটিউটের একজন অতি উৎসাহী অবর সম্পাদক। তিনি প্রস্তাব করেন গ্রীক সৈন্যের পোশাক পরিচ্ছদ ঐতিহাসিক ভিত্তিতে নিজেরাই তৈরি করবেন। সভ্যগণের ভিতর যেন উৎসবের বন্যা বয়ে চলল। সুনীতিবাবু ছুটলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পুরানো নথিপত্র ঘাঁটতে। তাঁর সহকর্মীগণের সহায়তায় প্রস্তাব কার্যে পরিণত হতে বিলম্ব হল না। গ্রীক-সৈন্যের বিচিত্র সাজ-সজ্জা প্রস্তুত হল। স্যর গুরুদাস তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি চন্দ্রগুপ্তের নব রূপায়ণ দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। সেদিন চাণক্যের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় প্রদর্শন করে শিশিরকুমার ভবিষ্যৎ বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয়ের উচ্চমান স্থাপন করেন।

এই অভিনয়-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমারও লিখেছেন : "চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়ে প্রাচীন ভারতীয় আর প্রাচীন গ্রীক পোশাক মায় যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র বর্ম প্রভৃতি

পুরনো ছবি ও ভাস্কর্য দেখে তৈরি করা হয়। শিশিরকুমার ও তাঁর সহ-অভিনেতাদের কৃতিত্ব এবং পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও সৌন্দর্য—এই দুইয়ে মিলে এই অভিনয়কে বাংলাদেশে নাট্যকলার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত উঁচু জায়গায় তুলে দিয়েছিল। শিশিরকুমার চাণক্য, নরেশ মিত্র কাত্যায়ন, রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দর ভূমিকায় নেমেছিলেন।"

এই অভিনয়ের স্মৃতিকথায় কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন: "ইন্‌স্টিটিউটে বছর বছর নতুন নতুন নাটকের অভিনয় হত। সেই উপলক্ষেই শিশিরের অভিনয়শক্তির স্ফুরণ। নাট্যাভিনয়ে শিশিরের সহযোগী ছিল নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীশ চক্রবর্তী, কান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। জনা ও চন্দ্রগুপ্ত নাটকে এদের অভিনয় দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। অভিনয়-কলা যে এত উন্নত হতে পারে, তা আগে ভাবতেই পারি নি। শিশির ছিল এদের মধ্যমণি, সবচেয়ে প্রধান ও দুঃসাধ্য ভূমিকাই শিশির নিত এবং আর সকলের সঙ্গে নিজের অভিনয়কলার সামঞ্জস্য সাধন করে নিত। গানের দিকে ব্যবস্থাপনা ছিল জ্ঞানপ্রিয় দাদার, আর অভিনয়ের দিকটার পুরা ভার নিত শিশির। নেপথ্য-বিধানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল সুনীতিকুমার।"

ইনস্টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের এই অভিনয় রাত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেন পাশাপাশি বসে সে-অভিনয় দেখেছিলেন। অনেকে বলেন দানীবাবুও নাকি এই অভিনয় আগাগোড়া দ্বিজেন্দ্রলালের পাশে বসে দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইনস্টিটিউটের কান্তি মুখোপাধ্যায় মশায় আমাকে বলেছিলেন দানীবাবু এ অভিনয় দেখেন নি। দানীবাবুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি গোলদীঘির ধার থেকে ফিরে গিয়েছিলেন ইনস্টিটিউটের বাড়ি চিনতে পারেন নি বলে।

এর আগে পেশাদার থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় অতুলনীয় অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন দানীবাবু। সে অভিনয় হয় মিনার্ভা থিয়েটারে। প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই। ভূমিকালিপি ছিল: চাণক্য—দানীবাবু, চন্দ্রগুপ্ত—প্রিয়নাথ ঘোষ (ইনিই দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে 'সাজাহান'-এর ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন), নন্দ—অহীন্দ্র দে, কাত্যায়ন—হীরালাল, সেকেন্দার শাহ ও চন্দ্রকেতু—নগেন ঘোষ, সেলুকস—

হরিভূষণ, অ্যান্টিগোনস্—সত্যেন দে, মুরা—হেমন্তকুমারী, ছায়া—নরীসুন্দরী ও হেলেন—সরোজিনী। সেইজন্যই কি ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন শিশিরকুমার দানীবাবুর কাছে 'এই অভিনয়ে তৈয়ার হওয়ার জন্য শিক্ষা নেন'? কিন্তু এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

শিশিরকুমার যেদিন ইনষ্টিটিউটে 'চাণক্য' করেন সেদিন সকালে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে গিয়েছিলেন। শ্রীদেবকুমার বসু ও শ্রীরবি মিত্র প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে' গ্রন্থ থেকে এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমারেরই উক্তি উদ্ধৃত করা যাক: "দানীবাবু অভিনয় করতে শেখেন দ্বিজুবাবুর কাছে, ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে প্রথম। অবশ্য তাঁর (দ্বিজুবাবুর) চরিত্রের conception আর আমার conception-এ অনেক তফাৎ ছিল। চাণক্য করার প্রথম দিন সকালে দু-ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছিলুম, তবে তর্কাতর্কিই হল।

"উনি বললেন, কাত্যায়ন একটি fool. (হয়তো নাটকের দিক থেকে প্রয়োজন নেই বলেছিলেন)।

"তা আমি বললুম, কি করে হবে। চাণক্যই তো বরং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ধরনের। পায়ে কুশ ফুটেছিল বলে একটা বিতিকিচ্ছিরী কাণ্ড করলে, তাকে সভায় নিয়ে এসে অপমান করিয়ে প্রতিহিংসার কথা খুঁচিয়ে তুললে কে? মুরাকে চন্দ্রগুপ্তের সামনে অপমান করালে কে? সেলুকসকে আনালে কে?

"তবে কাত্যায়ন চরিত্রের দুর্বলতা হল, কোন একটি জিনিস শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবার ক্ষমতা ছিল না তার, সে ক্ষমতা ছিল চাণক্যের। আর চাণক্য তো মিথ্যে কথা বলত না, মেয়েকে পেয়ে বললে, আমি চলে যাব, কিন্তু তুমি তোমার সুযোগ্য মন্ত্রীর সাহায্যে সুখে রাজ্য শাসন কর, ভয় নেই। কাত্যায়ন fool হলে কি বলতে পারত?

"দ্বিজু বাবু শুনে বললেন, খুব ভেবে পড় তো? ওঁর শেখান খুব একটা ভাল কিছু ছিল না। মনে একটা ধারণা ছিল, আমার লেখা কেউ বুঝবে না, কাজেই যাতে জমে যায় তাই করাই ভাল।"

ইনষ্টিটিউটে শিশিরকুমারের 'চাণক্য' অভিনয় দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল শিশির-কুমারের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন: "শিশিরকুমারের চাণক্য ...প্ত এক অসাধারণ অভিনয়। আমি কল্পনায় যে চিত্র এঁকেছি, এই

অভিনয় তার চেয়েও এগিয়ে গিয়েছে—ইতিহাসের চাণক্য আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।”

ছয়

এইবার দানীবাবুর ‘চাণক্য’ ও শিশিরকুমারের ‘চাণক্য’ অভিনয়ের পার্থক্য প্রসঙ্গে আসা যাক। পরবর্তী কালে পেশাদার নট হিসেবে শিশিরকুমার ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ম্যাডান থিয়েটারে প্রথম ‘চাণক্য’ করেন। রসজ্ঞ নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ‘চাণক্য’ প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

“দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে ‘চাণক্য’র ভূমিকায় স্বর্গীয় দানীবাবুর অভিনয় দেখবার পূর্বে লোকমুখে শুনে শুনে একটা বড় ধারণা নিয়ে প্রথম যেদিন গিয়ে দেখি, তখন ধারণার চেয়ে অনেক বড় একটা জিনিস পেয়েছিলাম। প্রত্যাশার চেয়ে বড় জিনিস প্রত্যক্ষ করার আনন্দ বর্ণনাতীত। তখনও থিয়েটার বড় একটা দেখতাম না, রসাস্বাদের ক্ষমতা ছিল সহজ। ক্রমে রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধি জাগ্রত হয়। তারপর দানীবাবুর সেই চাণক্য অভিনয় আরও দেখেছি, কিন্তু আর তেমন চমৎকৃত হই নি। অথচ দানীবাবু কোনও কালে একটি অভিনয় রাত্রেও আপন স্থির অভিনয়-নিষ্ঠা থেকে এক চুল বিচ্যুত হন নি।

“অপ্রস্তুত মন আর বিদগ্ধ মনের খোরাক এক নয়। এইখানেই অভিনেতার মুশকিল। আসর বুঝে যিনি কীর্তন করতে না পারেন তিনি ব্যর্থ হন। কোন কোন অভিনেতার দর্শক সম্বন্ধে নাড়ীজ্ঞান টনটনে। এরূপ অভিনেতাই সহজে খ্যাতি আর বিত্ত দ্বারা পুরস্কৃত হন। আবার সর্বদেশের জনসাধারণই কিছুকাল বৈদগ্ধ্যের এক একটা স্তরের উপযোগী, জনপ্রিয়তা তাঁর কুক্ষিগত। নিছক ব্যবসাদারি থিয়েটারের কারবার বেশীর ভাগ এই শ্রেণীর নাটক বা অভিনয় নিয়ে। দর্শক সাধারণের রুচি বা শিক্ষাকে অনুসরণ করে এই ধরণের নাট্যকার বা অভিনেতারা বড়। এঁরা থিয়েটারের সৃষ্টি।

“আর এক শ্রেণীর নাট্যকার ও অভিনেতা মাঝে মাঝে থিয়েটারে আবির্ভূত হয়ে গেছেন যাঁরা থিয়েটারের স্রষ্টা পদবাচ্য। এঁদের কল্যাণেই রঙ্গালয় শিক্ষায়তনের মর্যাদালাভ করে। দর্শকের রুচিকে এঁরা অনুসরণ করেন না,

মার্জিত করবার শক্তি ধারণ করেন, সাধারণ রসবোধকে এঁরা সূক্ষ্মতর করে তোলেন। ব্যবসাদারী থিয়েটার এঁদের আবির্ভাবেই শুধু এগিয়ে চলতে পেরেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র একজন বড় স্রষ্টা, আর দানীবাবু এক বড় সৃষ্টি।......

"দ্বিজেন্দ্রলাল অঙ্কিত 'চাণক্য' একটি ভারাক্রান্ত ভূমিকা। কিন্তু বাজার চলতি হিসাবে এ ভার—সম্ভার। এক সময়ে চাণক্যের ভূমিকা বাংলা থিয়েটারকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। চাণক্যের ভূমিকা ছিল অভিনেতার কষ্টিপাথর, অনেক ব্যবসাদার ও সৌখীন অভিনেতার লোভের বস্তু। উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী সহকারে বেগবতী আবৃত্তিই ছিল অভিনয়-সাফল্যের হেতু। এ বিষয়ে দানীবাবুর সঙ্গতি ছিল অপরিমাণ। কাজেই তিনি দর্শককে অভিভূত করে ফেলতেন। চরিত্র বিচারের প্রয়োজনবোধ দর্শকচিত্তে উঠতেই দিতেন না।

"শিশিরকুমারের 'চাণক্য' অভিনয়ে চরিত্রবিশ্লেষণ প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়।

"দ্বিজেন্দ্রলাল চাণক্যের একজন রহস্যময়ী অশরীরী প্রেয়সীর অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। দানীবাবু এ রহস্যময়ীকে রহস্যময়ীই রেখে গেছেন। শিশিরকুমার একে প্রকাশ করলেন চাণক্যের নিজেরই অনন্যসাধারণ বুদ্ধিরূপে। চাণক্যেরই উক্তিতে পাওয়া যায়ঃ –'যে বুদ্ধিকে এতদিন দৈববাণীর মত অনুসরণ করে এসেছি' ইত্যাদি। এই সূত্রকে শিশিরকুমার বিশদ করে দেখান। দ্বিজেন্দ্রলাল গোড়ায় যেভাবে এই প্রেয়সী-কল্পনা শুরু করেছিলেন, তাতে একটু অস্পষ্টতা আছে। চাণক্যের প্রথম আবির্ভাব ঘোলা ঘোলা আলোতে শ্মশানের পারিপার্শ্বিকে। শ্মশানের বীভৎসতাকে তিনি সম্বোধন করছেন ঃ—'হে সুন্দরী বীভৎসতা। তুমি এত সুন্দর, তাই আমি নিত্য প্রত্যূষে গ্রাম পরিত্যাগ করে তোমার এই কদর্যতায় স্নান করতে ধেয়ে আসি; তুমি আমায় অনেক শিখিয়েছ, প্রেয়সী আমার,' ইত্যাদি। চাণক্যের প্রথম প্রেয়সী-সম্বোধন সুন্দরী বীভৎসতাকে। আপন বুদ্ধিকে সুন্দরী বীভৎসতা বলে সম্বোধন, গণ্ডগোলের ব্যাপার। গোল এড়ানো যায়, বাক্যমধ্যস্থ সেমিকোলনটিকে পূর্ণচ্ছেদে পরিবর্তন করে নিলে, বীভৎসতা যেই 'তুমি', প্রেয়সী সেই 'তুমি' না হলে। নাটকে এরূপ ছোট্‌খাটো পরিবর্তন প্রযোজকের অধিকারভুক্ত।

" 'প্রেয়সী'কে কোনরূপ দৈবশক্তিসিদ্ধি বা সিদ্ধাই হিসাবে গ্রহণ করে

অভিনয় করা যায় কিনা দেখবার বিষয়। কোনো বড় অভিনেতা এ পর্য্যন্ত তা করেন নি। অবশ্য নানা প্রশ্ন তাতে উঠতে পারে। সিদ্ধাই তন্ত্রের ব্যাপার। তন্ত্র বুদ্ধ-পূর্ব কি বুদ্ধ-পর ঐতিহাসিক প্রশ্ন। তখনো বৌদ্ধধর্মের বন্যা আসে নি, 'বন্যা আসছে' চাণক্য দেখতে পাচ্ছেন। আর তান্ত্রিক সিদ্ধাইর সঙ্গে সাধারণত সংশ্লিষ্ট থাকে অলৌকিক ব্যাপার। অসাধারণ ব্যাপার মাত্রই অলৌকিক নয়। আকাশে যদি ঈশ্বর থাকেন, চাণক্যের সৃষ্টি মুগ্ধ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করতে পারেন সত্য, তাহলেও সেই সৃষ্টি আলাদিনের দৈত্যের মত কারও সাহায্যে সংঘটিত অনৈসর্গিক ব্যাপার কিছু নয়। সেরূপ মুগ্ধ বিস্ময়ে ঈশ্বর হয়তো আজকাল বেতার, উড়োজাহাজ প্রভৃতি নিরীক্ষণ করছেন, হিটলারের অসাধারণ উত্থান, আর বর্তমানে তার পতনের গতি নিরীক্ষণ করছেন। কাজেই প্রেয়সীকে সিদ্ধাইরূপে গ্রহণ করে অভিনয় করবার আবশ্যকতা নেই। তবে 'মানে হয় না, মজা হয়' হিসেবে কেউ অভিনয় করে দেখতে আর দেখাতে পারেন কেমন মজা হয়। প্রেয়সী চাণক্যের নিজের সত্তারই অংশ, তাকে বুদ্ধিই বলা যাক বা আর যাই বলা যাক। যেমন 'মা' ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণেরই সত্তার অংশ (অথবা, তাঁর সত্তা ছিল 'মা'-রই অংশ)। মার কাছে তিনি পরামর্শ চাইতেন, আবদার জানাতেন, কিন্তু অলৌকিক বা অনৈসর্গিক কিছু করিয়ে নেন নি। গলার অসুখের যন্ত্রণায় যখন তিনি আহার পর্যন্ত করতে পারতেন না, তখন নরেন তাঁকে পরামর্শ দেন মার কাছে আরোগ্য চেয়ে নিতে। বালস্বভাব রামকৃষ্ণ তাই করতে গেলেন, ফল হল,—'মা তোদের সবাইকে দেখিয়ে বললেন, 'এই যে দশমুখে খাচ্ছিস।' —আমি লজ্জায় মরে গেলাম।' অনৈসর্গিক কিছু ঘটলো না, কিন্তু খুব বড় কিছুর পরিচয় পাওয়া গেল। চাণক্যের প্রেয়সীও যাদুদণ্ড বুলিয়ে চাণক্যের জন্য কিছু করে দেয় নি, তাকে দিয়ে বড় কিছু ঘটিয়েছে, এই ভারতে বিবিধ জাতির সমবায়ে এক মহাসঙ্গীত রচনা করিয়েছে—ধাপে ধাপে। এই প্রেয়সী চাণক্যের অসাধারণ বুদ্ধি ছাড়া আর কি ?"

এই সূত্র ধরেই নাট্য-সমালোচক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী তাঁর 'অভিনেতৃ আর অভিনয়' শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"যাঁহারা শিশিরকুমারের 'চাণক্য' দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, চাণক্যের অভিনয়ে শিশিরকুমার বুদ্ধিকেই প্রধান সূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। এমন কি স্থূল দর্শককে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার নিমিত্ত স্থূল অভিনয়-

কলার আশ্রয় পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া হস্তদ্বারা মস্তিষ্কের প্রতি ইঙ্গিত করেন। আকারে, ভঙ্গীতে, চলায়-ফেরায় এক বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত অতি-মানবকেই পাদপ্রদীপের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন শিশিরকুমার।

" 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের একটি দৃশ্যের কথা উল্লেখ করিতেছি। সেটি প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য। দৃশ্যটি প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যও বটে। সেই দৃশ্যেই চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের প্রথম সাক্ষাৎ। আর এই সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়কেই চিনিতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত চিনিয়াছিলেন কুশাগ্রবুদ্ধি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চাণক্যকে ; তাই তিনি তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'গুরুদেব, আপনি শুদ্ধ আজ্ঞা দিন, আমি আর সব পারব' এবং চাণক্যও চিনিয়াছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীর্যবান চন্দ্রগুপ্তকে। বুঝিয়াছিলেন,—কেবল আপন প্রতিহিংসা-সাধনই নয়, ভারতে বিবিধ জাতির সমবায়ে এক মহাসঙ্গীত রচনার কার্যেও চন্দ্রগুপ্তের মতো একজন ক্ষাত্রশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আবশ্যক। চন্দ্রগুপ্তের শক্তি আছে, কিন্তু সেই শক্তিকে পরিচালিত করিবার বুদ্ধি নাই। চাণক্য সেই পরিচালনার ভার নিজহস্তে তুলিয়া চন্দ্রগুপ্তকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। নাটকের ঐ দৃশ্য পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের সংলাপ এইরূপ :—

'চাণক্য। আর ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত, ওঠ। আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখছি জান ?

চন্দ্রগুপ্ত। কি গুরুদেব ?

চাণক্য। এই প্রধূমিতা, প্রজ্জ্বলিতা, প্রবাহিতা রক্ত-স্রোতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্তে এক রত্নালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীত-মুখরা, হাস্যময়ী জননী। জলধি হতে জলধি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক সাম্রাজ্য, সেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য।'

"চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবু এই সংলাপ বলিতেন আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বরে। তাহাতে গমক, কম্পন এবং স্বরের আরোহণ অবরোহণ এতই মনোহর হইত যে, দর্শক-বৃন্দ মুগ্ধ আনন্দে তাঁহাকে অভিনন্দন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু দানীবাবুর অভিনয়ে চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়াস ছিল না বলিয়াই কেবল সুন্দর ভাবে বলিয়া যাইতেন। 'আর তার পুরোহিত এই দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য' বলিতেন নিতান্ত সাধারণ অর্থেই। ভাবটা হইত এই যে, আমি বিশেষ কিছুই নই, চন্দ্রগুপ্ত, তোমার কর্মসাধনে

এক সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত মাত্র। কিন্তু আসলে চাণক্য-চরিত্রের কোথাও এই দীনতার ভাব নাই। উক্ত দৃশ্যেই চাণক্য একবার চন্দ্র-গুপ্তকে বলিয়াছেন সত্য—'আমি কে? কেউ না, দীন ব্রাহ্মণ…আজ ব্রাহ্মণের মত দীন কে? তার শাপে সগরবংশ ভস্ম হওয়া দূরে থাক, প্রদীপটি পর্যন্ত জ্বলে না, তার উপবীত আজ ভিক্ষুকের চিহ্ন' ইত্যাদি, কিন্তু উহা চাণক্যের স্বগত-আক্ষেপ মাত্র, অন্তর তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয়ে পূর্ণ। এই দৃঢ় প্রত্যয়, কূটবুদ্ধি এবং প্রভুত্বগর্বী মনোভাবই শিশিরকুমারের অভিনয়ে পরিস্ফুট হয়। কীরূপে, তাহার সামান্য আভাস দিতেছি। শিশিরকুমার উক্ত সংলাপটি বলিবার সময়, 'সে-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা' এই পর্যন্ত বলিয়াই একটু থামেন, তার পর বলেন 'তুমি'। অতঃপর 'আর তার পুরোহিত' পর্যন্ত বলিতেই তাঁহার বক্ষদেশ স্ফীত হইয়া ওঠে, চক্ষে একটা গর্বমিশ্রিত ব্যক্তিত্বপূর্ণ দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে এবং সেই ক্ষণ-বিরতির পরেই তিনি বলেন, 'এই ব্রাহ্মণ চাণক্য।' 'দীন দরিদ্র' কথা দুইটি তিনি বাদ দেন। তাঁহার এইরূপ বলিবার ভঙ্গিটাই চাণক্য-চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিয়া তোলে।

"আর একটু বিশদ করিয়া বলা যাক। 'সে-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা' বলিয়া থামিবার অর্থ এই যে, চাণক্য উহারই পরে প্রায় বলিয়া ফেলিয়া-ছিলেন, 'আমি'। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির জানিতেন, তিনি ছাড়া আর কাহারও সে-শক্তি নাই যে, খণ্ড ছিন্ন ভারতকে এক করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। শক্তি থাকিলেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, উহার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও প্রয়োজন হয়। বুদ্ধিহীন শক্তি নিষ্ফল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চাণক্যের মধ্যে রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। ভাবিলেন, যাহা সত্য, তাহা সত্যই। কিন্তু, রাজনীতির খাতিরে এখানে সেই সত্যের বক্র প্রয়োগ আবশ্যক। চন্দ্রগুপ্তকে তাঁহার হাতের পুতুল করিতে হইবে। সুতরাং সেই পুতুলের গায়ে একটু হাত বুলাইতেই হইবে, সাদা বাংলায় আমড়াগাছি করিতে হইবে। তাই বলিলেন—'তুমি।' তবে 'তুমি' বলিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত যেন মনে না করেন যে, সেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চাণক্য কিছুই নহেন—এই অভিপ্রায়ও চাণক্য জানাইয়া দিতে ছাড়িলেন না। 'আর তার পুরোহিত এই ব্রাহ্মণ চাণক্য' শিশিরকুমারের এই সংলাপের মধ্য দিয়া

সেই ভাবটিই ফুটিয়া ওঠে। অপর কেহ চাণক্যের চেয়ে বড়—ইহা চাণক্যের নিকট অসহ্য। উপরন্তু তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বগর্বী একটি মনও রহিয়াছে। চাণক্যের এই দুই স্বরূপ উদঘাটিত হয় 'আর তার পুরোহিত এই ব্রাহ্মণ চাণক্য' সংলাপের মাধ্যমে। বস্তুতঃ উক্ত সংলাপের যতি, বিরাম এবং 'দীন দরিদ্র' কথা দুইটির অবলোপ যে ইচ্ছাকৃত সজ্ঞান শিল্পীর রূপ-কর্ম তাহাতে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না। গভীর রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন, কূটবুদ্ধি, ব্রাহ্মণত্ব-গর্বী চাণক্যকেই আমরা ঐটুকু সংলাপের অভিনয়ে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। শিশিরকুমারের চরিত্র-বিশ্লেষণী অভিনয় এইরূপই।"

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ও বাংলার সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে দানীবাবু ও শিশিরকুমারের 'চাণক্য' অভিনয়ের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেই অংশটি তুলে দিচ্ছি: "এক-দিন নাট্যাচার্যকে বলেছিলাম—'আপনার চাণক্যের চেয়ে দানীবাবুর চাণক্য আমার ভাল লাগে, যেমন ভাল লাগে, দানীবাবুর যোগেশের চেয়ে আপনার যোগেশ।'

"তিনি হেসে বললেন—'আপনার রসবোধের খুব নিন্দা করতে পারছি না। দানীবাবুর চাণক্য আমার খুব ভাল লাগে, যোগেশও মন্দ লাগে না। যদি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমাকে চাণক্য না করতে হোত, তাহলে আমি হয়তো দানীবাবুর মতই অভিনয় করতাম। কিন্তু ইনষ্টিটিউটে অভিনয় করতে হবে, নইলে ইনষ্টিটিউটের বিশেষত্ব বজায় রাখা যাবে না, নিজেরও প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া সম্ভব হবে না। দানীবাবুর গলায় রিজোনেন্স্ ছিল না। আমার বড় সম্পদ তাই। ভাবলুম নতুন কিছু করলে মেরে দিতে পারব। দিলামও তাই। দানীবাবুর চাণক্যের কিংবা যোগেশের নিন্দে করতে পারি না। কিন্তু মাঝে মাঝে যদি আমার চাণক্য দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন জায়গায় জায়গায় আমিও খুব ভাল অভিনয় করি।' একদিন তা বুঝেও ছিলাম……

"…মাঝে মাঝে চাণক্য দেখতে বলেছিলেন, তাই মাঝে মাঝে চাণক্য দেখতাম। একদিন দেখলাম দানীবাবুর অভিনয় থেকে তাঁর অভিনয়ের পার্থক্যটা কোথায়। আমার দানীবাবুর চাণক্যের সবচেয়ে ভাল লাগত, কন্যাকে ফিরে পাবার দৃশ্য। যেদিনের কথা বলছি, সেদিন শিশিরকুমার ওই দৃশ্যটির এমনই অভিনয় করলেন, যা আগে কখনো দেখি নি। দানীবাবু অভিনয়

করতেন যেন ট্রান্সে অভিভূত হয়ে, তাঁর চিত্তের বেদনা যেন আপনা-আপনি গলে পড়ত গম্ভীর-নির্ঘোষে ; পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে দূরের জলপ্রপাতের ধ্বনি যেমন শোনা যায়, অনেকটা সেই রকম। কিন্তু সে-দিন শিশিরবাবুর অভিনয়ে যেন চাণক্যের মর্মের মর্মর-ধ্বনির মূর্চ্ছনাও পেলাম। দুয়ে তফাৎ আছে। দানীবাবুর ওই প্রকাশনা স্বাভাবিক, কিন্তু অভিনয়ে কিছু অস্বাভাবিক মনে হয় ; শিশিরবাবুর প্রকাশনায় কৃত্রিমতা রয়েছে, কিন্তু অভিনয়ে তা স্বাভাবিক হয়েছে। স্বভাবের স্বাভাবিকতা আর অভিনয়ের স্বাভাবিকতা এক নয়। অভিনয়ে যদি অভিনেতার অভিব্যক্তি না পাওয়া যায়, যদি কেবল নাট্যকারের লাইন-স্কেচরূপে প্রতিফলিত হয়, তাহলেই তা কৃত্রিম বলে মনে হয়। রিয়ালিটি সম্বন্ধেও ওই একই কথা। আশে-পাশে যে রিয়ালিটি দেখি, অবিকল তাই যদি নাটকে তুলে ধরি, তাহলেই তা নাটকে রিয়াল হয়ে ওঠে না। তাকে নাটকীয় রিয়ালিটি দিতে হবে। সে যাই হোক, সেইদিন চাণক্য দেখে শিশিরবাবুকে আমার অনুভূতির কথা বললাম। তিনি বললেন—'আজ অভিনেতা হতে পেরেছিলাম, রোজ পারি না। যা কুৎসিত পৃথিবী! নিশ্চিন্ত হয়ে অভিনয়ই কি করতে দেয় ?'

"চুরুট ধরিয়ে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—'অভিনয়টা যে আজ ভাল হয়েছে, তা অভিনয় করতে করতে আমিও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু ওর জন্যে যে আজ বিশেষ কোন চেষ্টা করেছি, তা মনে করতে পারছি না।'

"আবার খানিকটা পায়চারি করে এসে বললেন—'দেখুন, অভিনয় সম্বন্ধে অনেক ভারী ভারী কথা, ভাল ভাল কথা পুঁথি-পত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কথাই শেষ কথাও নয়, সেরা কথাও নয়। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, যে পারে, সে আপনি পারে ; পারে সে ফুল ফোটাতে, তাই কি ঠিক ? ফুল কোন্ মুহূর্তটিতে ফুটবে তা ফুলই জানে না।' "

শিশিরকুমারের 'চাণক্য' অভিনয়ের একটি মনোজ্ঞ আলোচনা পাই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার স্মৃতি-তর্পণ' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন : "শিশিরের চাণক্যর অভিনয়—তাহার অভিনয়-প্রতিভার একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আত্রেয়ীর পুনঃপ্রাপ্তির দৃশ্যে নাট্যকার চাণক্যের অন্তর্জগতে যে তুমুল ভূমিকম্পরূপ

বিপর্যয়ের কল্পনা করিয়াছেন, আবেগের শ্বাসরোধী আতিশয্যে তাহাকে যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দোলায়িত করিয়াছেন, তাহার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে যে-স্খলিত-উক্তির সমাবেশে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিপুলতার ইঙ্গিত দিয়াছেন, শিশিরের অপূর্ব অভিনয়ে তাহা সমস্ত প্রত্যক্ষরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কবি-কল্পনার সুদূর নভোচারী-ধূমকেতু যেন মাটির জগতে নামিয়া আসিয়া, মানুষের ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া নিজ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু আমি আর একটি দৃশ্যের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। নন্দের হত্যার পর যখন রক্ত-রঞ্জিত হস্তে তাহার অসংবদ্ধ শিখাকে বাঁধিতেছে, তখন তাহার মুখে অস্বাভাবিক উল্লাসের কি একটা বিকৃত, কুঞ্চিত-কুটিল ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে! এ আনন্দ যেন ফেলিবারও নয়, পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবারও নয়—চাণক্য প্রকৃতির এক অংশ যাহা গভীর তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেছে অপর অংশ তাহার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাইতেছে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে-বিষামৃতের সংমিশ্রণ, তপ্ত ইক্ষুচর্বণবৎ যে-অস্বস্তিকর আনন্দের কথা বলিয়াছেন, চাণক্যের মুখে যেন তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে! আর এই দৃশ্যের চরম অভিব্যক্তিরূপে শিশির নাট্যকারের অপরিকল্পিত আর একটি অঙ্গসঞ্চালনের আশ্রয় লইয়াছে। বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ চাণক্য, পৃথিবীর সকল আনন্দ হইতে নির্বাসিত চাণক্য, কূটনীতির পাকে সমগ্র প্রাণশক্তিকে গুটাইয়া-রাখা চাণক্য, ঠিক আনন্দ-বিহ্বল স্কুলের ছেলের ন্যায় তিনটি লম্ফ-প্রদানের দ্বারা তাহার অন্তর-নিরুদ্ধ উদ্বৃত্ত আবেগকে মুক্তি দিয়াছে! এই তিনটি লাফ চাণক্যের স্বাভাবিক চরিত্রের কত বিসদৃশ, অথচ বর্তমান মুহূর্তে কত অনিবার্যরূপে সুসঙ্গত। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, রঞ্জন-রশ্মির ন্যায় অস্থিচর্মভেদী নট-প্রতিভাই শিশিরকে এই আঙ্গিক প্রচেষ্টার রহস্যটি শিখাইয়াছে।"

এই দৃশ্যটির অভিনয়-প্রসঙ্গে বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীর মন্তব্যটিও উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "আর এক রকম চরিত্রাভিনয়ে শিশিরকুমার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। উহাকে বীভৎস-রসানুসারী চরিত্র বলা যাইতে পারে। গিরিশ-অর্ধেন্দুর কথা বলিতে পারি না, তবে দানীবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত বাঙলা মঞ্চে একমাত্র শিশিরকুমার ভিন্ন আর কোন নটের মধ্যে ওই রসের সার্থক অভিনয় দেখি নাই। বীভৎসভাবে সাজিয়া অভিনয় করিলেই উহা বীভৎস রসের অভিনয় হইয়া উঠে না; অভিনয়ের ভঙ্গীতে

ওই রসকে প্রকাশ করিতে হয়। আর বীভৎসরসের পরিস্ফুটন এতই কঠিন যে, উহার মাত্রা একচুল ছাড়াইয়া গেলেই উহা হাস্যকর অভিনয়ে পরিণত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চন্দ্রগুপ্ত নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যটির উল্লেখ করিতেছি। নন্দের বলির পর তাহার রক্তরঞ্জিত হস্তে চাণক্য যখন মঞ্চে প্রবেশ করতঃ শিখা বাঁধিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রস্থান করেন, দৃশ্যের সেই অংশটুকুর কথাই আপনাদিগকে স্মরণ করিতে বলি। দানীবাবু সেখানে কেবল অট্টহাস্যই করিতেন। কিন্তু যাঁহারা শিশিরকুমারের চাণক্য দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, সে-দৃশ্যে শিশিরকুমার যে-পৈশাচিক উল্লাসে নৃত্য করেন সেরূপ নৃত্যের তুলনা খুঁজিতে হইলে গ্যারিক-আর্ভিং-এর দেশে যাইতে হইবে।”

সাত

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দানীবাবুর (জন্ম: ১১ই ডিসেম্বর ১৮৬৮, মৃত্যু: ২৮শে নভেম্বর ১৯৩২) আত্মপ্রকাশ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের ‘চণ্ড’ নাটকে ‘রঘুদেব’-এর ভূমিকায়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ স্টার থিয়েটারেই শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ‘পোষ্যপুত্র’ নাটকে (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কৃত নাট্যরূপ) ‘শ্যামাকান্ত’র ভূমিকায় তাঁর শেষ অভিনয়।

গিরিশযুগের প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গীয় নাট্যশালা’ (বাং ১৩১৬ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে বলেছেন: “শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) তাঁহার আদিশিক্ষক শ্রীঅমৃতলাল মিত্রের মত একজন আড়ষ্ট অভিনেতা ছিলেন। স্বীয় পিতা গিরিশবাবুর শিক্ষাতেও তাঁহার এই আড়ষ্টভাব ও সর্বত্র করুণ (যেন কান্নার মত) সুরে অভিনয়ের ঢং বদলান নাই। তিনি রঙ্গমঞ্চে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্ধেন্দুবাবুর নিকট অভিনয়-প্রণালীর কোন উপদেশ লইতেন না; কিন্তু ‘সিরাজদ্দৌলা’, ‘মীরকাশিম’, ‘বলিদান’ প্রভৃতির অভিনয়ে আমরা তাঁহার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি। এই পরিবর্তন অর্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় শিক্ষিত পারিপার্শ্বিক অভিনেতৃবর্গের অভিনয় প্রভাবে ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন আর আড়ষ্টভাব ও

কান্নার সুর ততটা নাই, তবে অস্থানে চীৎকার করা এখনও তিনি ছাড়িতে পারেন না।...সহচর অভিনেতার দিকে চাহিয়া কথাবার্তা না কহিলে যে কতটা দোষ ঘটে, তাহা ষ্টার থিয়েটারের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানীবাবুর) অভিনয় যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই দুই প্রসিদ্ধ অভিনেতার অপরিহার্য দোষ ওইটিই।"

দানীবাবুর অভিনয়-ক্ষমতার বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে শিশিরকুমার যে-সব মন্তব্য করেছেন সেগুলো শ্রীরবি মিত্র ও শ্রীদেবকুমার বসুর "শিশির-সান্নিধ্যে" গ্রন্থ থেকে তুলে দিচ্ছি: "দানীবাবুর অনেক দোষ ছিল, কিন্তু কমেডি ভাল করতেন, বোধগম্য হলেই ভালো করতেন।...দানীবাবুর গলা! Wonderful গলা, ওরকম ভগবান যদি আমায় দিতেন! কিন্তু দিলেন না।... দানীবাবুর গলা ছিল অপূর্ব্ব। উদারা, মুদারা, তারা—তিন গ্রামেই গলা চলত। বিলেত হলে বিপদে পড়তেন, তবে গলার জন্য হয়তো ওদেশেও দাম পেতেন।...দানীবাবু চাণক্য আর ঔরংজেব না করলে দেশে অভিনয় আসত না, নয়তো দানীবাবু বা অমর দত্ত অভিনয়ই বা করলেন কোথা, 'শুধু এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল'।...দানীবাবুকেও দাঁড় করালেন. গিরিশবাবু। অভিনেতার একটা ডোল বা **conventional mode of acting** ঠিক করে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি সেই অনুযায়ী লিখে ছেলের সুবিধে করে দিলেন।...গিরিশবাবু একটা ডোল করলেন, ছেলেকে বড় করবার জন্যে কতকগুলো বড় বড় পার্ট লিখে গেলেন।...দ্বিজুবাবুর সঙ্গে মঞ্চে কারোরই যোগ ছিল না, কাউকে শেখান নি, শুধু দানীবাবুকে সাজাহান আর চন্দ্রগুপ্তে কিছুটা নড়াচড়া করতে শেখালেন।...দানীবাবু যদি বলে থাকেন বাপী শিখিয়েছেন তা হ'লে ভুল বলেছেন। বাপের কাছে কখনও শেখেন নি। তবে বাপকে খুব ভক্তি করতেন।...আগেকার দিনে গিরিশবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু আর অমৃত বোস ছাড়া বাকি সবাই চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না ভেবেই হাততালি পাবার জন্য অভিনয় করতেন।...অমরবাবুর মতো দানীবাবুও ভালো অভিনয় করতেন না। তবে কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব। গিরিশবাবুর পরেই তাঁর গলা, অমৃত মিত্র মশায়ের গলা ভালো ছিল, তবে নড়াচড়া করতেন না। দানীবাবু অবশ্য শরীরটা একটু বাঁকাতেন, তবে সব চরিত্রে একই রকম করতেন বলে মোটেই মানাতো না।...অশিক্ষিত দর্শকদের জমিয়ে দেবার

কায়দা গিরিশবাবু খুব ভালো জানতেন, দানীবাবুও কিছুটা পারতেন, অশিক্ষিত পটুত্ব কিছুটা ছিল তাঁর। আর কি দম, একটানা বাইশ-তেইশ লাইন বলতে পারতেন।...দানীবাবুর অভিনয়ের মধ্যে ছিল অপূর্ব গলা, অমন গলা দেখা যায় না। তবে গিরিশবাবুর অভিনয়ের কাছে কিছুই নয়।... একবার কমবাইণ্ড নাইটে 'ভ্রান্তি' দেখেছিলুম, পুরঞ্জন দানীবাবু, নিরঞ্জন অমর দত্ত আর রঙ্গলাল গিরিশবাবু। সে অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল— Girish Babu first and everybody else nowhere."

আট

ইনষ্টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করেই শিশির-কুমার 'অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রথম মাদকতা' আস্বাদন করলেন। এর পর তিনি আর একটি ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশোত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ (ইং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী) কলকাতায় টাউন হলে কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পরিষদ-মন্দিরে পরিষদের ছাত্রসভ্য-বৃন্দ ২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী) এক সান্ধ্য-সম্মেলনে কবিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সেই উপলক্ষে ইনষ্টিটিউটের জুনিয়ার মেম্বাররা কবির 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করেন। এই নাটকে শিশিরকুমার কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ অমল হোমকে ২৩শে মাঘ তারিখের এক চিঠিতে লেখেন : "তোমার ইনষ্টিটিউটের বন্ধুদের জানিও তাঁদের অভিনয় আমার খুব ভালো লেগেছিল। বৈকুণ্ঠের খাতার এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়িতে গগন, অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল।" দেখা যাচ্ছে শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভাকে রবীন্দ্র-নাথ প্রথম দর্শনেই অভিনন্দিত করেছেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর ইনষ্টিটিউটের সভ্যরা গিরিশচন্দ্রের 'জনা' মঞ্চস্থ করলেন। শিশিরকুমার 'প্রবীর'-এর ভূমিকায় অভিনয় করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং পুরস্কৃত হন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্রের 'অশোক' নাটকে নাম-ভূমিকায় অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। 'মার'-এর ভূমিকায় নরেশচন্দ্র মিত্র অপূর্ব অভিনয় করেন। "এই অভিনয়-প্রসঙ্গে সভ্যগণের আর একটি কীর্তি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ রঙ্গালয়ে তখন 'মার'-এর ভূমিকাটি অত্যন্ত নগণ্যভাবে রূপদান করা হত। সুনীতিবাবুর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তা পছন্দ হয় না। তখন স্থির হয় সুনীতিবাবুর পরিকল্পনানুযায়ী 'মার'-কে নবকলেবরে সজ্জিত করা হবে। অন্যান্য পোশাকও ইতিহাস-সম্মতভাবে তৈরি করা হয়। এই ভাবে সভ্যগণ অভিনয় কলার গতানুগতিক ধারাকে আমূল সংস্কৃত করে নানাদিকে তার উৎকর্ষ সাধন করেন।"

পরবর্তীকালে শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও 'অশোক'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের একটি দৃশ্যের অত্যাশ্চর্য অভিনয়ের বর্ণনা করেছেন প্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি লিখেছেন ঃ " আরম্ভ হোল কলিঙ্গ যুদ্ধজয়ের দৃশ্য। কলিঙ্গ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিহত মানুষের ভয়াবহ স্মৃতি অনুতপ্ত চণ্ডাশোককে ধর্মাশোকে পরিণত করে। অশোক ঘুমিয়েছিলেন, হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন, চারিদিক হতে আগুন এসে তাঁকে যেন গ্রাস করছে। 'আগুন, আগুন, জ্বলে গেলুম, পুড়ে গেলুম' বলে আর্তনাদ করে ওঠেন অশোক। আকাল ছুটে এসে তাঁর আর্তনাদ শোনে। আকাল দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না; কোথায় আগুন। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ে মানুষ যেমন শেষ মরণ-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে, উন্মত্তের মত দু হাত দিয়ে লেলিহান অগ্নিশিখাকে নিজের দাহ্যমান্ অঙ্গবস্ত্র থেকে ছিটকে ফেলে দেবার নিষ্ফল চেষ্টা করে, শিশিরকুমার ঠিক তেমনিভাবে নিজেকে অগ্নিজ্বালা হতে মুক্ত করবার প্রয়াস করতে থাকেন। শুধু আঙ্গিক অভিনয়, মুখে ওই এক কথা, 'জ্বলে গেলুম, পুড়ে গেলুম।' প্রেক্ষাগারের উৎকণ্ঠিত মানুষগুলি দারুণ উত্তেজনায় দাঁড়ায়। তারপর উচ্ছ্বসিত সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে অপরাজেয় শিশিরকুমারের জয়ধ্বনি।"

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পাশ করলেন শিশিরকুমার। শিশিরকুমারের বাবার ইচ্ছা ছিল শিশিরকুমারকে হাইকোর্টের উকীল করা এবং সেইজন্য বিখ্যাত আইনজীবী ভবানীপুরের দাশরথি সান্ন্যালের কাছে তাঁর শিক্ষানবীশীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আইন পরীক্ষার সময় তিনি সহপাঠীদের

মেসে দ্বিপ্রহরটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতেন। তারপর অন্য পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে মসীচিহ্নিত প্রশ্নপত্র ধার করে সুবোধ ছেলের ন্যায় পিতাকে দেখিয়ে বোঝাতে চাইতেন যে সত্যই তিনি পরীক্ষা দিচ্ছেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতৃবিয়োগ হল আর সমস্ত লুকোচুরির প্রয়োজনও ফুরোলো। পিতার মৃত্যুর পর বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব-বহনের ভার তাঁর ওপরই পড়লো। বৃহৎ যৌথ পরিবারের দায়-দায়িত্ব আজীবন তিনি বহন করে গেছেন। একান্নবর্তী পরিবারের কর্তারূপে তিনি আজীবন যে ভাবে কর্তব্য পালন করে গেছেন তার দৃষ্টান্ত এ-যুগে বিরল। বাধ্য হয়ে তখন তাঁকে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ) ইংরাজী অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করতে হল; এই সময়ের কথাটা শিশিরকুমারের নিজের মুখেই শোনা যাক: "বাবা মারা যাবার পর মা অবশ্য ছোটদের নিয়ে ওখানে (মেদিনীপুরে) ছিলেন লেখাপড়া শেখানোর জন্যে, তা কারও লেখাপড়াই হল না। তারাকুমার পোস্টাপিসে ঢুকে পড়ল। আমি কলকাতাতেই থাকতুম। আর বিশুও আমার কাছেই ছিল। পনেরো থেকে সতেরো সালের ভেতর একটা ওলট পালট হল।" ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমারের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার নামজাদা ডাক্তার রায় বাহাদুর নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর দুহিতা ঊষা দেবীর সঙ্গে শিশিরকুমারের বিবাহ হয়। একমাত্র পুত্র অশোককে রেখে ঊষা দেবী পরলোকগমন করেন।

নয়

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত শিশিরকুমার বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। কলেজে তাঁর বেতন ছিল ১৫০৲ টাকা। কলেজে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উত্তরকালে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁরা হলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, সাহিত্যিক শ্রীপরিমল গোস্বামী ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চলচ্চিত্র-পরিচালক দেবকীকুমার বসু। তাঁর আর এক ছাত্র শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: "১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি হই। সেই সময়ে শিশিরকুমারকে সেখানে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে পাই। তিনি আমাদের পড়াতেন **Xenophone**। তারপর বি. এ.-তে ইংরেজী অনার্স

ক্লাসে তাঁর কাছে পড়েছি Duckit and Wragg's 'Letters'। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর। পোশাকের পারিপাট্য ছিল। তিনি প্যাণ্ট কোট পরে আসতেন। প্রত্যহ নূতন নেকটাই বদলে আসতেন। মাথায় একটা কালো গোল টুপি থাকত। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪৷২৫। সেই বয়সেই তিনি ছাত্রদের প্রিয় হয়েছিলেন।" তাঁর পড়ানোও ছিল চমৎকার। তাঁর অধ্যাপনা সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন: "শিশিরের অধ্যাপনা সম্বন্ধে আমি তার ছাত্রদের কাছে শুনেছি, ইংরেজী সাহিত্যের এমন অপূর্ব অধ্যাপনা তারা কোথাও শোনে নি। তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শিশিরের অধ্যাপনা শোনে। কেবল চমৎকার অভিনয়াত্মক আবৃত্তি করে সে শেক্স্পীয়ার পড়াত যে, শুধু আবৃত্তি শুনেই তাদের অনেকটা অর্থবোধ হয়ে যেত।"

কবিশেখরের উক্তি সমর্থন করেছেন শিশিরকুমারের আর একজন খ্যাতিমান ছাত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীপরিমল গোস্বামী। তিনি তাঁর 'স্মৃতিচিত্রণ' গ্রন্থে লিখেছেন:

"শিশিরকুমার ভাদুড়ী যেমন ছিলেন চেহারায়, তেমনি ছিলেন পোশাকে। প্রায় প্রতিদিন নতুন সাজে আসতেন। সর্বদা বেশ একটা হাসি-খুশি ভাব। উচ্চারণ এবং বলবার ভঙ্গি ছিল চমৎকার। ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন। ক্লাসে একদিন বক্তৃতা দেবার সময় দেখেন একটি ছেলে ঘুমোচ্ছে। তিনি মাথা উঁচু করে বারবার তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন। তখন তার পাশের ছাত্র তাকে জাগিয়ে দিলে শিশিরকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'were you sleeping ?" ছেলেটি উত্তর দিল, "No Sir" শিশিরকুমার আরও হেসে বললেন, "Oh, I beg your pardon." কথাটি এমন ভঙ্গিতে বললেন যাতে ক্লাসের সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। এই ভাষাতত্ত্বের ক্লাসেই একদিন এক ছাত্র একটি অপ্রচলিত ইংরেজী শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে শিশিরকুমার তৎক্ষণাৎ "Do I look like a dictionary ?" বলেই যেমন পড়াচ্ছিলেন তেমনি পড়িয়ে যেতে লাগলেন গম্ভীরভাবে।

"ইংরাজী টিউটোরিয়াল ক্লাসও নিতেন তিনি মাঝে মাঝে, কিন্তু তাঁর ইংরেজী রচনা-লেখা শেখানোর রীতি ছিল তাঁরই নিজস্ব। একদিন 'শাজাহান' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন আগাগোড়া। তারপর বললেন যা শুনলে তা সংক্ষেপে ইংরেজীতে লেখ। আরও একদিন 'মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে' ইত্যাদি সবটাই আবৃত্তি

করলেন। কবিতাটির নাম 'কলিকা'। বললেন 'যা শুনলে তার ভাবার্থ ইংরেজীতে লেখ।' শিশিরকুমারের আবৃত্তি আমার এই প্রথম শোনা।

"ইংরেজী টিউটোরিয়াল ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি এবং তারপর বলা—এর ভাবার্থ ইংরেজীতে লেখো—শিশিরকুমার ভাদুড়ীর এ শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব এবং মনোহর। যাঁরা ইংরেজী কবিতা পড়াতেন তাঁরাও যদি ক্লাসে এসে বার বার শুধু কবিতা এই ভাবে আবৃত্তি করতেন, কবিতার ছন্দ এবং শব্দঝংকার আমাদের কানে বারবার ধ্বনিত করতেন, তা হলে ইংরেজী কাব্য গোড়া থেকেই হয়তো সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠত। কিন্তু পড়াবার রীতি তা নয়। রীতি হচ্ছে ক্লাসে এসেই কবিতার প্রথম লাইন প'ড়ে তার ব্যাখ্যা শোনানো। ৪৫ মিনিটে হয়তো ৬ লাইন পড়া হল। অংশ জুড়ে জুড়ে বহুদিন ধরে মোট চেহারার পরিচয়, সামগ্রিক রূপ তাতে ধরা পড়ে না, সে সামগ্রিক রূপ অনেকগুলি অংশের যোগফলে তৈরি হয় না।

"শিশিরকুমার ইংরেজী পাঠ্যের নোট লিখতেন, যতদূর মনে পড়ে নোট বইতে তাঁর নাম ছাপা হোত না। সেন-রায় ছিলেন তার প্রকাশক। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে পাশাপাশি কয়েকটি প্রকাশক ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বভাবতই প্রতিযোগিতা ছিল। একদিন এক ইংরেজী প্যাম্ফলেট নিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রমহলে খুব হৈ-চৈ সুরু হল। এই প্যাম্ফলেটের লেখক ছিলেন জে. এল. ব্যানার্জী। তিনিও ছিলেন অন্য প্রকাশকের নোট লেখক। তিনি সেন-রায়ের প্রকাশিত ইংরেজী নোটের ভুল দেখিয়ে সেই ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। শিশিরকুমারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে আমরা ম্রিয়মাণ। কিন্তু বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। পাল্টা প্যাম্ফলেট বেরোল। শিশিরকুমার দেখালেন (ইংরেজী পণ্ডিতদের প্রচুর প্রমাণ সহ) যে তাঁর শব্দ প্রয়োগে কোথাও ভুল হয় নি, জে. এল. ব্যানার্জিই ভুল করেছেন। তখন আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, যেন একটা বড় যুদ্ধে আমরা জিতে গেলাম। একটি মাত্র 'ভুল' প্রয়োগের কথা মনে আছে। জে. এল. ব্যানার্জি বলেছিলেন sweet-scented flower ভুল প্রয়োগ, হবে sweet smelling flower. শিশিরকুমার প্রমাণ সহ দেখিয়েছিলেন sweet-scented flower অতি নির্ভুল ইংরেজী, ইংরেজ সমর্থিত ইংরেজী।"

এই সময়কার কথা স্মরণ করেই প্রেমাঙ্কুর আতর্থী উত্তরকালে লিখেছেন: 'সে সময়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

অধ্যক্ষ ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র সেন প্রভৃতি কোন না কোন-ভাবে এই ইন্‌স্টিটিউশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ'রা সকলেই শিশিরের গুণে তাকে পছন্দ করতেন। এ'দের মধ্যে অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র সেন তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও চরিত্রমাধুর্যে শিশিরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। বিনয়বাবুর অকাল মৃত্যুতে শিশির অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল। মৃত্যুকাল অবধি সে বিনয়বাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করত।

"মৃত্যুর পাঁচ-ছ' বছর আগে শিশিরের বন্ধু পরলোকগত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী একবার বিনয়বাবুর স্মৃতিসভায় শিশিরকে বিনয়বাবু সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। বক্তৃতার শেষাংশে শিশির বলেছিল বিনয়বাবু যদি আরো কিছুকাল জীবিত থাকতেন তাহলে আমার জীবন-নদী অন্য খাতে প্রবাহিত হত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব হত না।

"...এরপর এম. এ. পাশ করে শিশির কলেজের অধ্যাপনার কাজ নিলে। সে সময়ে ছাত্রসমাজের ওপর সে যেন একটা ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইন্‌স্টিটিউটে ও তার বাইরে দলে দলে ছাত্র তার অনুগত হয়ে পড়ল। সে সময়ে আমাদের মস্ত একটা আড্ডা ছিল বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের ওপর। লোকে এটাকে ভারতীর আড্ডা বলে জানত। বোধহয় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই একদিন শিশিরকে আমাদের আড্ডায় নিয়ে এলেন।

"শিশির প্রথম দিনেই বেশ জমিয়ে ফেলল। আড্ডার প্রধান ব্যক্তিদের লেখার সঙ্গে সে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিল। সত্যেনবাবুর কবিতা সে আবৃত্তি করল। তারপর প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়াতে লাগল। আমরা বলামাত্র সে বন্দীবীর কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলে। অতি পুরাতন সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে বাংলা সাহিত্যের অতি আধুনিক কবিদের কবিতাও তার ভালোরকম পড়া ছিল। সে নিজে ছিলে বিদগ্ধজন তাই বিদগ্ধ-সমাজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে তার মোটেই বিলম্ব হল না। এরপর থেকে সে আমাদের ভারতীর আড্ডার নিয়মিত আড্ডাধারী হয়ে দাঁড়াল।

"শিশিরের ছিল অনিদ্রারোগ। বেচারীর রাত্রে ঘুম হত না, তাই সে সর্বদাই রাত জাগবার ফন্দী খুঁজে বেড়াত। সে সময় সে বৌবাজারের ওল্ড

ক্লাবের সভ্য ছিল। ওল্ড ক্লাবের হয়ে দুতিনবার সে অভিনয়ও করেছে। সেখানে কয়েকজন সভ্য রাত্তিরে ঘুমোতে আসত। সঙ্গী পাবার জন্য শিশির কতদিন ওল্ড ক্লাবে শুয়েছে, আমরা কতদিন রাত দুপুরে তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে এসেছি তার ঠিকানা নেই। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে বিরাট একটি আড্ডা ছিল। সেখানে সাহিত্যিক, অভিনেতা, হাস্যকৌতুকাভিনেতা, গাইয়ে, বাজিয়ে, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, চোর-জোচ্চোর, সাধু-সন্ন্যাসী—সব রকমের লোক আসত, যেত। সকাল আটটা থেকে রাত্রি দুটো অবধি আড্ডা চলত। গজেনদার কাছে সবাই ছিল—'লোকটি বেশ'। শিশিরও সেখানে নিয়মিত আড্ডা দিতে আসত। গজেনদা প্রায়ই বলত—ওহে কাল যখন শিশির এল তখন রাত্রি একটা।

"হেদুয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে মানসী-মর্মবাণীর অন্যতম সম্পাদক বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশায় বাস করতেন। দোতলায় থাকত প্রভাতদা আর তেতলায় থাকত শিশির। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা আমরা জনচারেক—আমি, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাতদার ওখানে গিয়ে জুটতুম। সেখানে সাহিত্য সমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনায় পরমানন্দে সময় কেটে যেত। শিশির থিয়েটারের পর কোনো কোনোদিন আমাদের সঙ্গে যোগ দিত এবং অনেক রাত্রে আড্ডা সেরে বাড়ি যাবার জন্যে উঠলে শিশির বলত, 'এরি মধ্যে চললে ?' "

দশ

ইনস্টিটিউটে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' নাটকের অভিনয় হল। শিশিরকুমার এই নাটকে অভিনয় করেন নি কিন্তু অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন। একটি অমাত্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের ভাইস-চ্যান্সেলার স্বর্গত নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত।

পত্নীবিয়োগের পর শিশিরকুমার অভিনয়ে খুব বেশী অংশ গ্রহণ করেন নি।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনস্টিটিউটে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নাটক অভিনীত হয়। দুবার এই নাটকের অভিনয় হয়। প্রথম বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের

জন্য, দ্বিতীয়বার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্মানার্থে। শিশিরকুমার 'রঘুবীর'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

নাট্যাভিনয়ে শৌখিন দল হিসেবে তখন ওল্ড ক্লাবের প্রচুর খ্যাতি। এই ক্লাবের সভ্য শিশিরকুমার। বিখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীও এই ক্লাবের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্টার থিয়েটারে ওল্ড ক্লাবের সভ্যরা গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক অভিনয় করলেন। শিশিরকুমার 'ভীম' ও 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ', নির্মলেন্দু লাহিড়ী 'বৃহন্নলা' আর ডাক্তার হীরেন বসু 'দ্রৌপদী'র ভূমিকায় অভিনয় করেন।

এই নাট্যানুষ্ঠানে স্বর্গীয় হেমেন্দ্রকুমার রায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ "ঠিক এই সময়েই শৌখীন নটরূপে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়ে যথাসময়েই প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে হাজিরা দিতে বিলম্ব করলুম না। পালা ছিল 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', শিশিরকুমার গ্রহণ করবেন ভীম ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকা। যবনিকা উঠল। অভিনয় যা দেখলুম, আমার কল্পনাতীত। সে অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করেছিলুম তখনকার বিখ্যাত দৈনিকপত্র 'হিন্দুস্থানে' (সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় ললিতমোহন গুপ্ত)।

"বাংলা রঙ্গালয়ে তখনও 'প্রডিউসার' বা প্রয়োগ কর্তা বলে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না। এবং প্রয়োগনৈপুণ্য কাকে বলে সে সম্বন্ধে কারুর কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল বলেও আমার বিশ্বাস নেই।...... জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর বাইরে বাংলা নাট্যজগতে সর্বপ্রথমে নব-যুগোপযোগী প্রয়োগকৌশলের পরিচয় পেয়েছিলুম সেই 'পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস' নাট্যাভিনয়েই। শিশিরকুমারের অভিনয় তখনও যে অতুলনীয় ও প্রথম শ্রেণীর উপযোগী হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই সঙ্গে বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলুম তাঁর প্রয়োগপটুতা দেখে (আগেই শুনেছিলুম এই অনুষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন তিনিই)। অমন যে সেকেলে পালা, প্রয়োগপটুতার গুণে তাও হয়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ নূতন ও বর্তমান যুগের উপযোগী নাটকের মত। সাজপোশাক ও অভিনয়ের নূতন ভঙ্গীও দিলে নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত। অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠলুম। মনে বারংবার প্রশ্ন জাগতে লাগল, অধঃপতিত বাংলা নাট্যজগতে একদিন যাঁর পদধ্বনি শোনবার জন্যে নিরাশার মধ্যেও আশার স্বপ্ন দেখেছিলুম

ইনিই কি তিনি? এঁর শুভাগমনে আবার কি নূতন করে জ্বলে উঠবে আমাদের রঙ্গালয়ের নিবু নিবু পাদপ্রদীপ?

"...সেই অভিনয়ে তিনি একটি সরল, স্পষ্টবাদী, দয়াজপ্রাণ অথচ উদ্ধত ও কোপনস্বভাব মহাবলিষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্র এমন অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলুম। তাঁর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকাও এতটুকুরও মধ্যে অনেকখানি ভাবের অভিব্যক্তি দেখাতে পেরেছিল (প্রাচীন বয়সেও তিনি এই ছোটকে বড় করে তোলবার শক্তি থেকে বঞ্চিত হন নি—প্রমাণ 'রিজিয়া'র ঘাতকের ভূমিকা)। একটি ঘোরদর্শন প্রায়-অপার্থিব মূর্তি, মুখে তার ভয়াবহ অমঙ্গলের বাণী। সেই মূর্তি আজও চোখের সামনে দেখছি এবং সেই নিদারুণ 'কা কা' রব আজও ধ্বনিত হচ্ছে কানের কাছে।"

হেমেন্দ্রকুমার ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় যে-সমালোচনাটি লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করি: "সেদিন আমরা ষ্টার রঙ্গালয়ে, 'ওল্ড ক্লাবে'র সভ্যগণের দ্বারা অভিনীত গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' দেখিতে গিয়াছিলাম।

"আজকাল বাঙ্গালীর অভিনয়-শক্তির সম্বন্ধে নানা কারণে আমাদের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সখের অভিনেতার কথা দূরে থাক, এখানকার প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনয় যাঁহাদের পেশা, তাঁহাদেরও অধিকাংশের অভিনয় দেখিয়া অনেকবারই আমাদের গায়ে দস্তুর মতন জ্বর আসিবার উপক্রম হইয়াছে। সেই মুখোসের মতন স্থির মুখ, পাথরের পুতুলের মতন আড়ষ্ট দেহ, সংযমহীন, বিকৃত ও উচ্চকণ্ঠস্বর এবং ভ্রমপূর্ণ অসঙ্গত শব্দোচ্চারণ আমাদের মনকে যথেষ্ট দমাইয়া দিয়াছে এবং বঙ্গ রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যার-পর নাই হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।

"প্রকাশ্য পেশাদার থিয়েটারের যখন এ হেন অবস্থা, তখন কোন সখের নাট্য-সম্প্রদায়ে যে অভিনয়-কলার বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাইব, এমন দুরাশা আমরা স্বপ্নেও করি নাই। কেবল এক বন্ধুর উচ্ছ্বসিত উৎসাহে কৌতূহলী হইয়া সেদিন আমরা স্টার রঙ্গালয়ে গমন করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, দুই-একটা দৃশ্য দেখিয়াই চলিয়া আসিব।

"কিন্তু গিয়া যা দেখিলাম, সত্যই তাহা আশাতিরিক্ত। পেশাদারী অভিনয় দেখিতে গিয়া আমাদের মন ক্রমাগত পালাই-পালাই করিয়াছে;

—বিদ্রোহী মনকে কোন রকমে দমন করিয়াই সে অভিনয়ের তিক্তরস ঔষধের মত অনিচ্ছায় আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেদিন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে'র মত একখানি বহু পুরাতন নাটকের অভিনয় (তাও সখের নাট্য-সম্প্রদায়ের দ্বারা অভিনীত) দেখিতে গিয়া, বিশেষ একটি জরুরি কাজ থাকা সত্ত্বেও আমরা কিছুতেই উঠিয়া আসিতে পারি নাই, মন্ত্রমুগ্ধের মতন বসিয়া বসিয়া আমরা অভিনয় দেখিয়াছি। এর চেয়ে আর বেশী প্রশংসা কি আছে, আমরা তা জানি না।...

"ভীমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন: শ্রীযুত শিশির ভাদুড়ী। ভাল অভিনেতা বলিয়া আগেই আমরা তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়াছি—যদিও তাঁহার অভিনয় দেখার সৌভাগ্য এর আগে আমাদের হয় নাই। কিন্তু পরের মুখে ঝাল খাওয়ায় আমাদের আপত্তি ছিল বলিয়া সে সুখ্যাতিতে আমরা আস্থা স্থাপন করি নাই। সেদিন শিশিরবাবুর অভিনয় দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গিয়াছে। কীচকের কবলে দ্রৌপদীর অপমান দেখিয়া ছদ্মবেশী ভীম যখন যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়াও করিতে পারিতেছে না (দ্রৌপদীর সকাতর অনুনয় ও অভিমানেও নয়), তখনকার সময়োপযোগী নিষ্ফল আক্রোশ এবং রুদ্ধ ক্রোধাবেগের ভাব শিশিরবাবু চমৎকার অতি চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে শিশিরবাবুর অভিনয়-ক্ষমতা এমন অপূর্ব যে, বর্ণনায় তাহা বুঝাইবার নয়।...

"সর্বশেষে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পেশাদারী রঙ্গালয়েও আজকাল কোন নাটকের এতটা সর্বাঙ্গসুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় আমরা দর্শন করি নাই।"

সংবাদ পত্রে শিশিরকুমারের অভিনয়-সম্পর্কে এইটিই প্রথম সমালোচনা।

উত্তরকালে শিশিরকুমার পেশাদারী রঙ্গালয়ে (তাঁর নিজের রঙ্গালয় 'নাট্যমন্দির') ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই এই 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকেই ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'নাচঘর' পত্রিকা থেকে সে-অভিনয়ের সমালোচনা তুলে দিচ্ছি: "তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর বিস্ময়কর অভিনয় শিশিরপ্রতিভার অপূর্ব-অভিব্যক্তি। ভীম শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ— এই তিনটি পরস্পরবিরোধী চরিত্রের যে বিভিন্ন মূর্তি, রঙ্গমঞ্চের ওপর ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা একমাত্র তাঁর মতন প্রতিভাবান নটের পক্ষেই সম্ভব

ছিল। 'ভীম' বলতেই সাধারণত দর্শকদের মানসচক্ষে যে ভীমের ছবি ফুটে ওঠে, এ-সেই যাত্রাদলের নাটুকে 'ভীম' নয়। এই অমিত বলদৃপ্ত মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব যখন মদমত্ত মাতঙ্গের মতো সদম্ভচরণপাতে বিরাট রাজসভায় সূপকার পদপ্রার্থী হয়ে প্রবেশ করেন, তখন তিনি যে শুধু একজন বলিষ্ঠদেহ সূপকার মাত্র নন, তাঁর মধ্যে যে একটা অসাধারণত্বের বৈশিষ্ট্য আছে সেটুকুও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্রৌপদীর অপমান ও লাঞ্ছনায় রোষরুষ্ট কেশরীর ন্যায় প্রচণ্ড ক্রোধে কম্পিত উত্তেজিত ভীমের সেই প্রতিশোধস্পৃহা যা অজ্ঞাতবাসের প্রচ্ছন্নতাও প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারত না, কেবল জ্যেষ্ঠের অনুরোধেই যাকে নিষ্ফল করে দিচ্ছে, সেই কঠিন নিরুপায় ভাব শিশিরকুমারের ভীমের অভিনয়ে অপূর্ব ভাবাভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অতি চমৎকার ফুটে উঠেছিল। অমিতবিক্রম শক্তিশালী ভীমের নিরুপায় রুদ্ররোষে রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় সেই ঘন ঘন বজ্র নির্ঘোষ, সেই শালপ্রাংশুভুজদ্বয়ের নিষ্ফল আক্রোশে দুরন্ত আস্ফালন, সেই অজগরভুজঙ্গ গর্জনতুল্য দীর্ঘশ্বাস, সেই অবমাননাহত রোষদীর্ণ বিরাট বক্ষের ব্যথিত স্পন্দন, শত্রুনিষ্পেষণ পিপাসায় তাঁর সেই অধীর ব্যাকুলতা সে যে কী সুন্দর অভিনয়, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। যে প্রচণ্ড শক্তির দুর্নিবার বেগ নিয়ে ভীম ছুটে এসেছিলেন কীচকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, কীচক সে আক্রমণ সহ্য করতে পারে নি, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় ক্ষুদ্রপতঙ্গের মত পলকের মধ্যে প্রাণ দিল। কীচককে বধ করে ভীমের কিন্তু তৃপ্তি হল না। অসমযোগ্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধান্তে শ্রেষ্ঠতম বীরের যে অসন্তোষ, শিশিরকুমার তাঁর অসামান্য প্রতিভার গুণে সেই ভাবটির যে অতুলনীয় প্রকাশ দেখিয়েছিলেন—তা সেদিন বাংলা দেশের অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে দুর্লভ বলেই বিবেচিত হয়েছিল। রঙ্গক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট রাজসভার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দৌবারিকের মল্লবীর তুল্য আকৃতির প্রতি ভীমের সেই কৌতূহল দৃষ্টিটুকু, তাঁর সেই-গজরাজের মতন মেদিনীটলন চরণভরে চলাফেরা, সেই বলদৃপ্তের মত আশে-পাশের লোকের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ চাহনী, অজ্ঞাতবাসান্তের দিন তাঁর সেই অধীর উল্লাস ও উত্তেজনা, যার ঝোঁকে তিনি বিরাট রাজাসনের মূল্যবান উপাধানগুলি ক্রীড়নকের ন্যায় ঊর্ধে নিক্ষেপ করে দিলেন এবং বিরাটরাজাকে আলিঙ্গন দিতে গিয়ে আনন্দে তাঁকে বাহুবেষ্টনে শূন্যে তুলে ফেললেন—এ সবের তুলনা হয় না, এ অভিনয়ের মাধুর্য শোভাসম্পদ লিখে বোঝাবার নয়।

"এই একই মানুষ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় দেখা দিলেন। নাটকে দেখা যায় কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্রপাল যদুকুলপতি পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্যাম সৌম্য মূর্তি নিয়ে শান্ত মধুর কণ্ঠে সহাস্য প্রসন্ন বদনে যে শ্রবণাভিরাম বচনসুধা বর্ষণ করে যান তা দর্শকের কর্ণকে তৃপ্ত করে, চক্ষুকে প্রীত করে। গিরিশচন্দ্রের অতুল প্রতিভা যেমন এই একটি মাত্র দৃশ্যে কয়েকটি মাত্র কথার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট চরিত্রকে সম্যক পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছে, শিশিরকুমারের অভিনয় প্রতিভাও ঠিক তেমনি অনায়াসে এই একটি মাত্র দৃশ্যে স্বল্পক্ষণ অভিনয়ের মধ্যেই মহাকবির সেই ধ্যানদৃষ্ট মূর্তিকে দর্শকদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছিল। তারপর ঈষৎ বিকৃতমস্তিষ্ক কাকচরিত্রাভিজ্ঞ রাজপুরীর আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় কাতর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ব্রাহ্মণের ভূমিকাতেও শিশিরকুমার যে আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রকাশ করেন, তা তাঁরই প্রতিভার উপযুক্ত। এই চরিত্রটি যেন তাঁরই নিজের এক অভিনব সৃষ্টি।"

এই 'ব্রাহ্মণ' চরিত্রের রূপায়ণ-প্রসঙ্গে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী লিখেছেন : "আর এক রকম চরিত্রাভিনয়ে শিশিরকুমার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। উহাকে বীভৎস-রসানুসারী চরিত্র বলা যাইতে পারে। গিরিশ-অর্ধেন্দুর কথা বলিতে পারি না, তবে দানীবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত বাংলা মঞ্চে একমাত্র শিশিরকুমার ভিন্ন আর কোন নটের মধ্যে ঐ রসের সার্থক অভিনয় দেখি নাই। বীভৎসভাবে সাজিয়া অভিনয় করিলেই উহা বীভৎস রসের অভিনয় হইয়া উঠে না ; অভিনয়ের ভঙ্গীতে ঐ রসকে প্রকাশ করিতে হয়। আর বীভৎস রসের পরিস্ফুটন এতই কঠিন যে, উহার মাত্রা একচুল ছাড়াইয়া গেলেই উহা হাস্যকর অভিনয়ে পরিণত হইয়া থাকে।... বীভৎস রসের আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের ব্রাহ্মণের চরিত্রটি। ঐ নাটকের অভিনয় অনেকের নিকটই অজ্ঞাত। অথচ ঐ নাটকে শিশিরকুমারের 'ভীম' এবং 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ' চরিত্রের রূপায়ণ বাংলা মঞ্চজগতের ইতিহাসে একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা। 'বৃদ্ধব্রাহ্মণ'-রূপী শিশিরকুমারের 'কা-কা' ধ্বনির কথা মনে হইলে অন্তর অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া ওঠে। সে অভিনয়ের কথা রেখায় ফুটে না, উহা অনুভব করিবার বিষয়।"

এগারো

পুনরায় ওল্ড ক্লাবের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের অভিনয়ের কথায় ফিরে আসি। সেদিনের অনুষ্ঠানে আরও একজন বিদগ্ধ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিবরণ তুলে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন: "তাঁর অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় সাধারণে কি করে পেয়েছিল বলা প্রয়োজন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তিনি ছিলেন অভিনয়-ব্যাপারে সকলের পুরোবর্তী। অদ্বিতীয় নটকুশলতায় ছাত্র-মহলে এবং ইনস্টিটিউটের সুধী সদস্যদের কাছে তাঁর প্রতিভার পরিচয় অপরিজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু সেখানকার অভিনয় দেখার সৌভাগ্য সাধারণে লাভ করতে পারত না—কারণ সে-সব অভিনয়ে নিমন্ত্রণ-লিপি ছিল প্রবেশের একমাত্র উপায়। ইনস্টিটিউটে ছাড়া শিশিরকুমার ছিলেন তখন ওল্ড ক্লাবের প্রাণ-স্বরূপ। কৃতবিদ্য এবং কলাকুশলী কজন সদস্যকে নিয়ে ক্লাবে যে নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত ছিল, সে-সম্প্রদায় শিশিরকুমারের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে করেছিলেন নাট্যশিক্ষক। শিশিরকুমারের অধ্যক্ষতায় ওল্ড ক্লাব অভিনয় করেন গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। এ নাটকের অভিনয় ১৯০৮-০৯ সালে কোহিনুরে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দানীবাবু নেমেছিলেন বৃহন্নলার ভূমিকায়—ভীমের ভূমিকায় নেমেছিলেন মনীন্দ্র মণ্ডল (মণ্টুবাবু)। সে অভিনয়ে দানীবাবু ছাড়া আর কেউ আমার মনে রেখাপাত করতে পারেন নি—এবং অভিনয়ের দোষে নাটকখানির ঐশ্বর্য এবং নাটকত্ব তেমন খোলে নি। ষ্টার থিয়েটারে ওল্ড ক্লাব এ নাটকের অভিনয় করলেন—টিকিট বেচে যে টাকা উঠবে, তাতে ক্লাবের বহু উৎকর্ষ সংসাধিত হবে—এই ছিল উদ্দেশ্য। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা ডি-ডি-তে পুলিস ইন্‌স্পেক্টর—আমার সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। একখানি পাঁচ টাকার টিকিট এনে আমাকে গছালেন। আমি টিকিট কিনলুম শুধু শিশিরকুমারের অভিনয় দেখব বলে। তাঁর নাট্যকুশলতার কথা অনেকের মুখে শুনেছিলুম—কিন্তু সে কুশলতার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। শুনেছিলুম—শিশিরকুমার বিদ্যাসাগর কলেজের প্রফেসর—তাঁর আবৃত্তি এবং অভিনয়ের খ্যাতি বেশ প্রসার লাভ করেছে। বলেছিলুম, ও নাটক নিয়ে নামছ? আরও ভালো নাটক তো রয়েছে। প্রভাতকুমার

বললেন, দেখবেন দাদা…শিশিরকুমারের ভীমের ভূমিকায় অভিনয় দেখুন। তো গিয়ে যা দেখলুম—সব দিক দিয়েই অপূর্ব লাগল। সব আগে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়েছিল সাজ-পোশাকের অপরূপ বৈশিষ্ট্যে। সাধারণ মঞ্চে যুধিষ্ঠির-অর্জুনেরা সার্টিন বা কিংখাপের হাফ প্যাণ্ট বা থ্রী কোয়ার্টার্স ব্রীচেশ পরে নামেন; এ অভিনয়ে সে প্যাণ্টের চিহ্ন নেই। দিব্যি বেনারসী ধুতি সাবেক-কেতায় পরা পঞ্চ-পাণ্ডব এবং কৌরবের দল। যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় নেমেছিলেন ললিত লাহিড়ী। ভারী চমৎকার লেগেছিল তাঁর অভিনয়। কিন্তু শিশিরকুমার? আজো মনে আছে…তিনি অপরূপ ছবি ফুটিয়েছিলেন। ভীমের বীর্য, ভীমের তেজ, যুধিষ্ঠিরের অতিরিক্ত ধর্মান্ধতায় ভীমের অভিমান, তারপর দুরাত্মা কীচককে দণ্ডদান। থিয়েটারের মামুলি সুরের রেশ ছিল না। আরও অপূর্ব লেগেছিল দ্রৌপদীর অভিনয়। দ্রৌপদী সেজেছিলেন ডাক্তার হীরেন্দ্র বসু। অভিনয়ের মাঝখানে পট-অবসরে প্রভাতকুমার আমাকে নিয়ে গিয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। নানা কথার মধ্যে শিশিরকুমার একটি কথা আমাকে বলেছিলেন। বলেছিলেন, আপনারা যখন মাঝে মাঝে বই লিখে থিয়েটারে অভিনয় করতে দেন, তখন অভিনয় শিক্ষা দেবার সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন কেন? এ খুব অনুচিত। সে-কথা অস্বীকার করতে পারি নি। এবং তাঁর এ-কথা মেনে পরবর্তীকালে আমি যে যে বই অভিনয়ের জন্য থিয়েটারে দিয়েছি—সব ক্ষেত্রেই অভিনয় শিক্ষার ভার নিয়েছি। অভিনয় শেষ হলে তারাসুন্দরীর সঙ্গে আমার কথা হয় এ অভিনয় সম্বন্ধে। তিনি আগাগোড়া বসে অভিনয় দেখেছিলেন। তাঁদের অভিনয়ের সঙ্গে ক্লাবের অভিনয়ের পার্থক্য দেখিয়ে দিতে গেলে তারাসুন্দরী বলেছিলেন—শিশিরবাবুর চেয়ে আমি অনেক বেশী তারিফ করছি, যে ভদ্রলোক দ্রৌপদীর ভূমিকায় অভিনয় করলেন তাঁকে। মেয়েমানুষের ছলাকলা, তেজ, অভিমান প্রভৃতির বিচিত্র ভঙ্গী তিনি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, আমরা স্ত্রীলোক হয়েও তা পারি নি এবং পারি না। তারাসুন্দরীর সে-কথা খুব সত্য। ডক্টর বোসের আরও নানা স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয় আমি দেখেছিলুম মেডিকেল কলেজের বার্ষিক নাট্যাভিনয়ে; কিন্তু দ্রৌপদীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সত্যই হয়েছিল তুলনাবিহীন। এ অভিনয়ে সকলের বাচনে, সুরে, ভঙ্গীতে আশ্চর্য হার্মনি সংরক্ষিত হয়েছিল—শুধু একজনের অভিনয় ছাড়া। সে অভিনয় বৃহন্নলার ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর।

শিশিরকুমারকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলুম—হঠাৎ বৃহন্নলা অন্য সুর ধরলেন কেন? নির্মলেন্দু দানীবাবুর অভিনয়-ভঙ্গীর নকল করেছিলেন—তাঁর বাচন-ভঙ্গীতে হার্মনি নষ্ট হয়েছিল। উত্তরে শিশিরকুমার বলেছিলেন—রিহার্শালে উনি আমার পদ্ধতি মেনে চলেছিলেন—তারপর অভিনয়কালে হঠাৎ সুর বদলেছেন। তার কারণ, গোপনে তিনি দানীবাবুর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন—এবং আমাদের সম্পূর্ণ না জানিয়ে তাঁর এ সুর-বদল।”

এই অভিনয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ সৌরীন্দ্রমোহনের আর একটি রচনায় পাই। সেই রচনাটি পাঠকের সামনে তুলে ধরি। সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন : “১৯২১ সালের কথা…তখন বন্ধুবর মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদনা করি। একদিকে ওকালতি পেশা, অন্যদিকে ভারতীর সেবা…বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও পরোক্ষভাবে সংযোগ রক্ষা করি। পূজার পরেই বন্ধুবর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পরে কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হয়েছিলেন…১৯২১ সালে তিনি জোড়াসাঁকো থানায় সাব-ইনস্পেক্টর…সেকেণ্ড অফিসার…পুলিশে চাকরি করলেও তাঁর নাট্যানুরাগ ছিল প্রবল…সভা-সমিতিতে কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি একদিন কোর্টে আমাকে বললেন—স্টার থিয়েটারের স্টেজে ওল্ড ক্লাবের ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’ নাটকের অভিনয় হবে…একখানি টিকিট তোমাকে কিনতে হবে। শিশির ভাদুড়ী আমাদের ক্লাবের শিক্ষাদাতা…তিনি নামবেন ‘ভীম’-এর ভূমিকায় এবং আর একটি ছোট ভূমিকায়।

“তখনি টিকিট কিনলুম। তার কারণ ‘শিশির ভাদুড়ী’ নামটির সঙ্গে দু-এক বছর আগে থেকেই ছিল পরিচয়—রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি খুব ভালো আবৃত্তি করে খ্যাতি লাভ করেছেন, তা ছাড়া ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকের অভিনয়ে চাণক্যের ভূমিকা অভিনয় করে তিনি তখনকার বিদ্বৎ-সমাজকে বিমুগ্ধ করেছিলেন…তাঁর সে অভিনয় দেখে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত বিমুগ্ধ। নামই শুনেছিলুম—তখন তাঁর আবৃত্তি শুনি নি, অভিনয়ও দেখি নি। শিশিরকুমার তখন মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। ছাত্রসমাজেও তাঁর অজস্র সুখ্যাতি—এমন ভালো করে তিনি কাব্য-নাটক পড়ান…সে-সবের মর্ম এমন আশ্চর্য নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে দেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে এমন সমবয়সী বন্ধুর মতো মেশেন যে, ছাত্রসমাজ তাঁকে একেবারে প্রাণের স্বজন-স্বরূপ বলে দেখেন।

"যথাসময়ে অভিনয় দেখতে গেলুম। মনে খুব বড় আশা নিয়ে যাই নি… ভেবেছিলুম, সাধারণ এ্যামেচারী অভিনয় যেমন হয়…সাধারণ থিয়েটারী অভিনয়ের নকল…তার চেয়ে হয়তো সরেস কিছু দেখবো। কিন্তু যা দেখলুম… শুধু বিমুগ্ধ নয়, আশাতীত কল্পনাতীত বস্তু দেখলুম। নাটকখানিতে শিশিরকুমার শুধু অভিনয় শিক্ষা দেন নি…প্রযোজনাও তাঁর নির্দেশে। সে-প্রয়োগনৈপুণ্যেও দেখলুম অসাধারণত্ব।

"ওল্ড ক্লাবের এ-নাটকের অভিনয় দেখার পূর্বে কোহিনুর থিয়েটারে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের অভিনয় দেখেছিলুম। অবশ্য গিরিশচন্দ্র সে-অভিনয়ে নামেন নি বা কোহিনুরের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের তখন কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে বাংলার সাধারণ মঞ্চে এ-নাটকের অভিনয় যেমন হোত, কোহিনুরে সেই মামুলি রকমই হয়েছিল। সে-সব পৌরানিক নাটকের রাজা রাজড়ারা মখমলের জরিদার ব্রীচেশ, গায়ে মখমলের জরিচুমকির কাজ করা কোট পরতেন…পায়ে থাকতো নাগরা…মাথায় পালকওয়ালা পাগড়ি—কিন্তু শিশিরকুমারের প্রযোজনায় 'ওল্ড ক্লাবে'র এ অভিনয়ে দেখলুম, বিরাট রাজা, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির পরণে বেনারসী জোড়…মাথায় তাজ…কারো তাজে একটু পালক, কারো তাজ পালকবিহীন। পোশাকের এই প্রাচ্য আদর্শ সর্বাগ্রে মনকে স্পর্শ ক'রে বিপুল সম্ভাবনায় ভরিয়ে তুলেছিল। তারপর অভিনয়… বীরত্বের ব্যঞ্জনায় গগনভেদী উচ্চনাদ নেই…করুণ রসের অবতারণায় নাকিসুর বা ফোঁপানি নেই…অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গী! এই স্বাভাবিক ভঙ্গীটুকু গিরিশ-চন্দ্রের পরলোক গমনের পর বাঙলা রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসারিত হয়ে তার জায়গায় গগনবিদারী উচ্চনাদ, নাকিসুর, ন্যাকামি রঙ্গালয়ের অভিনয়কে এমন কদর্য করে তুলেছিল যে আজো তা ভুলি নি। অবশ্য সকলেই এমন অভিনয় করতেন না…There were many exceptions…দানিবাবু, অপরেশবাবু, তারক পালিত, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি, সুশীলাবালা—এঁদের অভিনয় তখনো যা দেখেছি, এ যুগের বহু নাট্যরথীর অভিনয় তার শতাংশের একাংশের ধার ঘেঁষে যায় না।

"সে অভিনয়ের কথা আজো আমার মনে আছে। যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় ললিতবাবু, দ্রৌপদীর ভূমিকায় একজন এম.বি. ডাক্তার (তিনি পরে মেডিকেল কলেজের গাইনকলজিক্যাল ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন) এবং ভীমের ও ব্রাহ্মণের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় অবিস্মরণীয়। ভীম এবং যম…এ

দুটি ভূমিকায় বাঙলা রঙ্গমঞ্চে পূর্বে যাঁকেই নামতে দেখেছি, তাঁরাই এমন অতি-অভিনয় করতেন যে হাস্যাস্পদ মনে হোত। যম-এর ভূমিকায় ভোঁদা কদাকার গুণ্ডা-চেহারা অভিনেতাকে নামানো হোত···আর ভীম হয়ে নামতেন থিয়েটারে সব চেয়ে জোয়ান পালোয়ান ষণ্ডামূর্তির অভিনেতা। কণ্ঠের উচ্চনাদে, লম্ফঝম্ফ, চোখ-কটমটানি এবং সব সময় গদা-আস্ফালন···এই পুঁজি নিয়েই থিয়েটারের ভীমের কারবার ছিল। ভীমের রূপসজ্জাতেও 'গালপাট্টা' লাগানো হতো···যেন কোন মার্চেণ্ট অফিসের ভোঁদা দরোয়ান। শিশিরকুমার ভীমের রূপসজ্জায় সে-ভোল শুধু পালটে দেন নি, তাঁর অভিনয়ে হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি ছিল না···পাণ্ডব-চরিত্রানুরূপ বৈশিষ্ট্য যেমন প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি প্রকাশ পেয়েছিল দুষ্ট দানবকে দলন করার বীর্য-শৌর্য, নারী-নিগ্রহী কীচককে হেয়জ্ঞান কতখানি, তাও প্রকাশ পেয়েছিল। সেই রাত্রেই প্রথম অঙ্কের পটক্ষেপের পর স্টেজে গিয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে আলাপ করেছিলুম। অভিনয়ে এমন প্রতিভা, এতখানি প্রয়োগ-নৈপুণ্য···ভেবেছিলুম দেখবো মানুষটি অহঙ্কারী। কিন্তু তা নয়···প্রথম পরিচয়েই দেখলুম, আশ্চর্য অমায়িক এবং শিক্ষা ও কালচারের যে প্রধান গুণ বিনয়, সেই বিনয়ের প্রতিমূর্তি। নাটক, নাট্যালয় এবং অভিনয় সম্বন্ধে সেই রাত্রেই তার সঙ্গে যেটুকু আলাপ হয়েছিল··· বুঝেছিলুম, অপূর্ব প্রতিভাধর। তখনি গুজব রটেছিল যে, প্রোফেসরি ছেড়ে ম্যাডানের বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানিতে যোগ দিয়ে তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন। বাঙলা রঙ্গমঞ্চকে নূতন রূপ দেবার বাসনা তাঁর।"

বারো

গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের (৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯১২) সঙ্গে সঙ্গেই গিরিশযুগের অবসান হয়ে গেল। বাংলা রঙ্গমঞ্চ দ্রুত অবনতির পথে এগিয়ে যেতে লাগল। দীর্ঘ দশ বৎসর বাংলা অভিনয় ক্ষেত্র বন্ধ্যা হয়েই রইল। যতই দিন যাচ্ছে বাঙালীর প্রাণে ততই নতুন নাট্যরস-পিপাসা জেগে উঠছে কিন্তু সেই রসপিপাসাকে মিটোবার জন্যে কোন সৃজনশীল শিল্পী উপস্থিত নেই। গিরিশযুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি দানীবাবুও তখন অতীতের রোমন্থন করে চলেছেন। কলকাতায় তখন টিমটিম করছে তিনটি থিয়েটার— স্টার, মিনার্ভা ও মনোমোহন। স্টার থিয়েটার চালাচ্ছেন অপরেশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়, মিনার্ভা চালাচ্ছেন উপেন্দ্রকুমার মিত্র আর মনোমোহন থিয়েটারের মালিক মনোমোহন পাঁড়ে। দানীবাবু মনোমোহনের ম্যানেজার এবং অর্ধেক শেয়ারেরও অধিকারী।

বাংলা রঙ্গালয়ের এই শোচনীয় অধঃপতনের সুযোগ গ্রহণ করলেন পারসী ধনকুবের জে. এফ. ম্যাডান। তখন ভারতবর্ষে সিনেমা জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন ম্যাডান সাহেব। কলকাতায় ম্যাডান সাহেবের একাধিক চিত্রগৃহ—তার মধ্যে একটি হচ্ছে কর্ণওয়ালিশ সিনেমাগৃহ (এখনকার 'শ্রী' সিনেমা গৃহ)। সিনেমা ও হিন্দী-উর্দু নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারে ম্যাডান কোম্পানীর তখন অসীম প্রতিপত্তি। ধর্মতলা ষ্ট্রীটে কোরিন্থিয়ান স্টেজেরও মালিক ম্যাডান সাহেব। তিনি এইখানে 'পারসী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' নাম দিয়ে একটা থিয়েটারও খুলেছিলেন। সেখানে মহাসমারোহে হিন্দী উর্দুতে অভিনয় হত—নল দময়ন্তী, আলাদিন, ভগীরথ ইত্যাদি। তাঁদের নাট্যকার আগা হাসার কাশ্মীরী সাহেবকে হিন্দী ও উর্দু সমালোচকেরা বলতেন—ইণ্ডিয়ান শেক্‌স্‌পীয়ার। "অজস্র অর্থব্যয়ে দৃশ্যপট, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আলোর দুর্দান্ত খেলা দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতেন তাঁরা। ভাষা না বুঝলেও বহু বাঙালী দর্শক শুধু এই বিস্ময়কর দৃশ্যপটের বাহার দেখতেই দলে দলে সেখানে টিকিট কাটতেন।" বাঙলা থিয়েটারের হীন অবস্থা দেখে ম্যাডান কোম্পানী বাংলা থিয়েটার চালাবারও সংকল্প করলেন। কলকাতার সমস্ত থিয়েটার বাড়ি হস্তগত করে একচেটে ব্যবসা চালানোই ম্যাডান কোম্পানীর আসল উদ্দেশ্য। এককোটি টাকা মূলধন নিয়ে ম্যাডান কোম্পানী থিয়েটার ব্যবসায়ে নামে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডান কোম্পানী কর্নওয়ালিশ সিনেমা-গৃহের (এখনকার 'শ্রী' সিনেমা গৃহ) পাশে 'ক্রাউন' সিনেমা-গৃহ (এখনকার 'উত্তরা' সিনেমা-গৃহ) খুললেন আর কর্নওয়ালিশ সিনেমা-গৃহটিকে রঙ্গমঞ্চে রূপান্তরিত করলেন। ঘোষণা করলেন শনিবার এবং রবিবার ম্যাটিনীতে কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে সিনেমার পরিবর্তে বাংলা নাটকের অভিনয় হবে। সম্প্রদায়ের নাম হলো 'বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'। দল খোলা হল প্রবোধ বসু, হীরালাল দত্ত, গোপাল ভট্টাচার্য, কুসুমকুমারী, প্রভা, বসন্তকুমারী প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে। ম্যাডান কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন জে. এফ. ম্যাডানের জামাতা রুস্তমজী সাহেব।

বাংলা থিয়েটারের মালিকরা রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন।

আগা হাসার সাহেব হিন্দীতে নাটক লিখলেন এবং সে নাটক সত্যেন দে কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত হয়ে "অপরাধী কে?" নামে মঞ্চস্থ হলো ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে।

"অপরাধী কে?" নাটক নয়। তাতে কয়েকটা থ্রিলিং সিন্ মাত্র ছিল। স্থূলরুচিসম্পন্ন বোম্বাই মার্কা ডিটেক্‌টিভধর্মী নাটক। এতে বাঙালী দর্শকের মন জয় করা গেল না। তখন তাঁরা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে নিয়ে এলেন তাঁদের নাট্যকার করে আর এদিকে শক্তিমান অভিনেতার খোঁজে লোক লাগিয়ে দিলেন। ম্যাডান কোম্পানীর সিনেমা বিভাগের প্রধান কর্মচারী প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (কালী ফিল্মসের প্রতিষ্ঠাতা ও চিত্রপরিচালক) নূতন প্রতিভাধর অভিনেতার সন্ধান করতে লাগলেন শহরের শৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ে। শিশিরকুমারের সন্ধান পেলেন প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তিনিই তাঁকে ম্যাডান কোম্পানীতে যোগ দেবার সাদর আমন্ত্রণ জানালেন।

নটের বৃত্তি গ্রহণ করবেন কিনা শিশিরকুমার এই কথা স্যার আশুতোষ ও আচার্য মন্মথমোহন বসুকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন। মন্মথমোহন শিশিরকুমারকে আশীর্বাদ জানালেন। স্যার আশুতোষও তাঁর সম্মতি জানালেন। অধ্যাপনায় ইস্তফা দিয়ে ম্যাডান কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন শিশিরকুমার। ম্যাডানে তাঁর মাইনে হলো হাজার টাকা।

এদিকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের 'রাখীবন্ধন' অভিনীত হলো। তারাসুন্দরী ও তারক পালিত ভালো অভিনয় করা সত্ত্বেও বই জমলো না। অপরেশচন্দ্র 'ছিন্নহার' ধরলেন। এও জমলো না। অপরেশচন্দ্র আবার নতুন নাটক লিখলেন—'অযোধ্যার বেগম'। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় দেওয়ালের গায়ে 'পোস্টার' পড়ল :—

স্টারে

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-বিরচিত

নূতন ঐতিহাসিক নাটক

অযোধ্যার বেগম

শ্রেষ্ঠাংশে—শ্রীমতী তারাসুন্দরী

তার পাশে আর একটা 'পোস্টারে' দেখা গেল :—

ম্যাডান কোম্পানী পরিচালিত

কর্নওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে
বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর নাট্যনিবেদন
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ.-বিরচিত
নূতন ঐতিহাসিক নাটক

নাম-ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম. এ.

তেরো

এই সংবাদ কলকাতার শিক্ষিত সমাজ ও নাট্যরসিকমহলে যে তুমুল চাঞ্চল্য ও বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা এ যুগের লোকেদের ধারণার বাইরে। সে যুগে এ ঘটনা ছিল অভাবনীয়—তাই অতিমাত্রায় বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "অবশেষে ১৯২১ সালে শিশিরের মনে গতানুগতিক ভদ্র জীবনযাত্রা ও প্রতিভার নির্দেশ অনুসরণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহার অবসান হইল। সে অধ্যাপনা ছাড়িয়া ম্যাডান থিয়েটারে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা ও অভিনয় ব্যবস্থাপকের বৃত্তি গ্রহণ করিল। তার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধবই এই গুরুতর সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছিল। প্রথম প্রথম যে একটু উন্নাসিক সমালোচনা হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু প্রতিভার অপূর্ব ক্রমবিকাশ, নব নব সৃষ্টির মুগ্ধ বিস্ময়ের নিকট নিন্দা ও প্রতিবাদের সে ক্ষীণ কণ্ঠ ডুবিয়া গেল। আজ ভাবি যে শিশির যদি সেদিন তথাকথিত ভদ্রজীবনের মোহে নিজ প্রতিভাকে অস্বীকার করিত, তবে আজ দেশের চারুশিল্পে তাহার যে অবিস্মরণীয় অবদান তাহা কি সে দিতে পারিত? অধ্যাপক শিশির আর দশটা অধ্যাপকের মত দিনগত পাপক্ষয় করিয়া বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া যাইত—অভিনেতাশ্রেষ্ঠ ও বাংলা রঙ্গমঞ্চের নবস্রষ্টা শিশির কালের পাষাণ-ফলকে নিজ নাম চিরতরে মুদ্রিত করিয়াছে। প্রাক্তন যুগের কত খ্যাতিমান পণ্ডিত নিজ নিজ পর্বত-প্রমাণ জ্ঞানের বোঝা লইয়া মহাকালের খেয়াতরীতে স্থান পান নাই। আবার সৃষ্টি-ধর্মী শিল্পী দুই একটি ছোট কাব্য-গ্রন্থে, রঙ-তুলিকার দু-একটি টানে, মনের গভীর ভাবদ্যোতক কয়েকটি বাণী ও উচ্চারণ-অঙ্গভঙ্গির সহায়তায় অক্ষয়, কালজয়ী কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন।

"শিশিরকুমারের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব সত্যসত্যই বাংলা নাট্যকলার নবযুগের তোরণদ্বার উন্মুক্ত করিল। ঠিক এই সময়ে নাট্যজগতে একটা সাময়িক অবসাদ ও জীর্ণ প্রথাবদ্ধতার যুগ চলিতেছিল। গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, অমৃতমিত্র, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি পূর্বযুগের নটশ্রেষ্ঠ-গোষ্ঠী তখন হয় জীবন না হয় রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর লইয়াছেন। আধুনিক যুগের কাব্যসাহিত্যের তুলনায় নাটক ও অভিনয় অতীত যুগকেই আঁকড়াইয়াছিল, যুগ-প্রগতির চিহ্ন উহাতে ছিল না। নাট্যাভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ-বিন্যাস উনবিংশ শতকের রোমান্টিক ভাববিলাস ও কল্পনাপ্রধান অবাস্তবতাকেই আশ্রয় করিয়াছিল। সেই রাজ-রাজড়ার জমকালো পোষাক, সেই স্বদেশপ্রেম ও সুলভ আদর্শের মাতামাতি, সেই বীররসের অবিচ্ছিন্ন সিংহহুঙ্কার, সেই করুণ রসের শোকোচ্ছ্বাসের আতিশয্য—কণ্ঠদীর্ণকারী হাহাকার ও প্রেক্ষাগৃহ-ভাসানো অশ্রুপ্লাবন, সেই হাস্যরসের উতরোল অসংযম ও অশালীনতা, সেই বাঁধা-ধরা ছকে-আঁটা জীবন-চিত্রণ—সমস্ত মিলিয়া কেমন যেন একটা স্বপ্নাচ্ছন্নতা, অতিরিক্ত মিষ্ট ভোজনের পর যে অতৃপ্তি জাগে তাহারই অনুরূপ একটা অসঙ্গতিবোধ মনের উপর অপরিচয়ের কুহেলিকা বিস্তার করিত। এ জীবন যেন আমাদেরই অথচ আমাদের নয়। এ যেন বর্তমানের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একটা অতীতের স্বপ্ন-রোমন্থন, এ যেন প্রাত্যহিক ঘটনার ছদ্মবেশে একটা অপরিচিত জগতের মায়াবিভ্রম – এই অস্পষ্ট ধারণা আমাদের মনকে সংশয়-দোলায় দোলাইত। নাটক-চিত্রিত জীবনের অবাস্তবতা অভিনয়ের আতিশয্যের দ্বারা আরও ঘনীভূত হইত। অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে শুধু যে স্থান-ব্যবধান থাকিত তাহা নহে, আত্মিক যোগের পথেও একটা দুরতিক্রম্য ব্যবধান থাকিত। প্রধান নট ও প্রধানা নটী আত্মশ্রেষ্ঠতার নিঃসঙ্গ গৌরববোধে বন্দী হইয়া সহযোগী অভিনেতা অভিনেত্রীর সাহচর্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকিত। সাধারণ নট-নটীর হাব-ভাব, অঙ্গ-ভঙ্গী, কটাক্ষ-ইঙ্গিত, নৃত্যগীত প্রভৃতির মধ্যে এমন একটা স্থূল লালসা উদ্দীপনের আমন্ত্রণ প্রকট হইয়া উঠিত, যাহা রুচিবান্ দর্শকের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। ইহার সঙ্গে রুচিহীন শ্রোতৃমণ্ডলীর ইতর হাসি হুল্লোড়, কুৎসিত রসিকতা ও অভদ্র মন্তব্য যুক্ত হইয়া রঙ্গালয়ে একটা কদর্য, কুরুচিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিত। সুতরাং নাট্যালয়ের প্রতি শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি 'সমাজের যে একটা তীব্র ঘৃণা, একটা ক্ষমাহীন বিরোধিতা ছিল তাহাকে নিতান্ত অকারণ বলা যায় না।

"এই অস্বাস্থ্যকর ও জীবনের সহিত শিথিল-সংযুক্ত পরিবেশে শিশিরের নাট্যপ্রতিভা অসাধ্যসাধন করিয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। তাহার যাদুদণ্ড প্রয়োগে এই বিশৃঙ্খলা ও অসঙ্গতির একটা অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সমস্ত রঙ্গমঞ্চে এক নূতন আদর্শ প্রেরণা ও শৃঙ্খলাবোধ ইহার দূষিত আবহাওয়াকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও কলাসঙ্গতিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। নাটকের উপস্থাপনা-কৌশল ও অভিনয়-পদ্ধতি আমাদিগকে এক নূতন বাস্তবতাবোধের ও জীবনানুসৃতির সন্ধান দিয়াছে। রঘুবীর, রিজিয়া প্রভৃতি পুরাতনধর্মী রোমান্সকেও শিশির নূতনভাবে উপস্থাপিত করিয়াছে, অবিমিশ্র রোমান্সের মধ্যেও যে চিরন্তন ভাব-সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে শিশিরের অভিনয় প্রতিভা তাহাই আবিষ্কার ও পরিবেশন করিয়াছে। বীরচরিত্রসুলভ একটানা চেঁচামেচি ও দীর্ঘ-প্রলম্বিত আবেগ প্রবাহের মধ্যে যে সত্য জীবনানুভূতি আছে, কণ্ঠস্বর ও আবৃত্তি ভঙ্গীর সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই শিশির তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। অভিনয়ের পূর্ণ সাফল্য যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত সমস্ত নর-নারীর সমপ্রাণ সহযোগিতার উপর নির্ভর করে তাহাও সে দেখাইয়াছে। যে সাময়িক বক্তা আর যাহারা মঞ্চস্থিত নীরব শ্রোতা উভয়ে মিলিয়াই নাটকের উদ্দেশ্য সাধন করে। কাজেই আগে যে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্টেজ কাঁপাইয়া বক্তৃতা করিত, আর সকলে শূন্য দৃষ্টিতে, ভাবলেশহীন মুখে চারিদিকে তাকাইয়া থাকিত, যেন তাহাদের ইহাতে কোন অংশ নাই—এইরূপ প্রয়োগে দৃশ্যের রস যে জমে না তাহা শিশিরের আবিষ্কার। সপ্ততন্ত্রীবিশিষ্ট বীণায় যেমন যে তারের সুর বাজে তাহার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য তারগুলিতে শিহরণ জাগে ও সমস্ত মিলিয়া একটা বিচিত্র-জটিল ঐকতানকম্পন সৃষ্ট হয়, তেমনি অভিনয়ক্ষেত্রেও একের ভাব অন্যের মুখদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া ও নানাবিধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া এক পরস্পর-নির্ভর, অথচ বহুমুখী ভাবসমবায় গঠিত করে। দৃশ্যসজ্জায় ও প্রসাধননৈপুণ্যেও শিশিরের রঙ্গমঞ্চ ব্যবস্থাপনার এক উন্নততর মানে পৌঁছিয়াছে। সব দিক দিয়া অভিনয়কে আধুনিক যুগ ও আধুনিক মানুষের চিত্তবৃত্তি ও বাস্তবতাবোধের উপযোগী করিয়া শিশির-প্রবর্তিত নাট্যকলা মঞ্চের সহিত জীবনের ব্যবধানকে ঘুচাইয়াছে ; অসাধারণ পরিবেশের মধ্যেও তাহার অভিনয় জীবনের অকৃত্রিম সুর ধ্বনিত করিয়াছে।"

চোদ্দ

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর। শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। ডক্টর শ্রীকুমারের ভাষায়ঃ "শিশিরের রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ যেন কোন স্বভাব রাজার নিজ রাজত্বে অভিষেক—প্রথম হইতেই দিগ্বিজয়ীর আত্মপ্রত্যয় ও জয়গৌরব লইয়াই তাহার পাদপ্রদীপের সম্মুখে আবির্ভাব।"

বিস্ময়কর আবির্ভাব—বাদশা আলমগীর-রূপে।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেনঃ "তিনটি বিস্ময়কর আবির্ভাব দেখেছি—একটি আকাশে, একটি জীবনে ও আর একটি ষ্টেজে। সহসা একদিন খুব ভোরে জেগে উঠে সমস্ত রাত্রির ঝড়ের পর সূর্যোদয় দেখেছিলাম। তা আজ ভাবলেও আমার আনন্দে হৃৎকম্প হয়। দ্বিতীয়টি ভোরবেলায় স্নান করে ক্ষৌমবাসে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলার বসবার ঘরে এসে দাঁড়ান—যেন একটি স্তব মূর্তি নিয়েছে। আরেকটি দেখেছি আলমগীরের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ি যখন রঙ্গমঞ্চে এসে প্রথম দেখা দেন।"

শ্রীমণি বাগচি লিখেছেনঃ "মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পিছনে হাত দুখানি রেখে, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষিপ্রপদে পাদচারণা করতে করতে শিশিরকুমার সেই স্বগত উক্তিটিকে এমন ভঙ্গীতে রূপ দিতেন যা মুহূর্তমধ্যে দর্শকের মনকে উন্মুখ করে তুলতো।"

স্বর্গীয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রথম অভিনয়-রাত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেনঃ "শিশিরকুমারকে মঞ্চে দেখলুম আলমগীর বাদশার ভূমিকায়। তাঁর হাতে মঞ্চের ভোল ফিরে গিয়েছিল। কুসুমকুমারী নেমেছিলেন উদিপুরী বেগমের ভূমিকায়। শিশিরকুমারের শিক্ষার গুণে কুসুমকুমারী তাঁর চিরদিনের মজ্জাগত থিয়েটারী সুর ভুলে শিশিরকুমারের সুরে সুর মেশাতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে অভিনয় হয়েছিল অতি অপূর্ব। 'আলমগীরে' দৃশ্যসজ্জা বেশভূষা সমস্তই অপরূপ লেগেছিল। রূপনগরের রাজকন্যা রূপকুমারীর ভূমিকায় প্রভা আমাদের চমৎকৃত করেছিলেন। তরুণ তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামবকস্ ছবির মত আজও মনের পটে আঁকা আছে। 'আলমগীরের' অভিনয় কতবার দেখেছি বলতে পারি না, এবং

যতবার দেখেছি, ততবারই ভালো লেগেছে, একঘেয়ে মামুলি বলে মনকে কোনদিন পীড়া দেয় নি—এমন জীবন্ত জাগ্রত সে অভিনয়। ··· প্রথম-অভিনয় রাত্রেই বন্ধুবর সত্যেন্দ্র দত্ত (কবি) এবং আমি সে-অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। সে-অভিনয় আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল···শ্রদ্ধায় শিশিরকুমারের প্রতিভাকে আমরা নতি জানিয়েছিলুম। তাঁর শিক্ষার গুণে দেখেছিলুম, বাংলা রঙ্গমঞ্চের কজন নটনটী···যারা মামুলি ভঙ্গীতে অভিনয় করে অভিনয়কে প্রাণহীন এবং নাট্য কলালক্ষ্মীর মুখে চুণকালির প্রলেপ দিচ্ছিলেন, তাঁদের আশ্চর্য পরিবর্তন। আলো বাতাস পেলে নির্জীব তরুলতা যেমন সজীব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তাঁরা তেমনি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলেন। মনে হয়েছিল, তাঁদের যেন পুনর্জন্ম হয়েছে!

"আলমগীরের অভিনয় দেখার পর শিশিরকুমারের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হই। তিনি তখন থাকতেন ঘোষ লেনে (২২ নম্বর ঘোষ লেন, মানিকতলা স্ট্রীটে) ···আলাপ হল নিবিড়।···তারপর গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে তাঁর অভিনয় প্রতিভার কথা শুনে তাঁরাও গেলেন 'আলমগীর' দেখতে এবং শিশিরকুমারকে তাঁরাও সাদর অভিবাদন জানালেন।

গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ বললেন—'এমন একজন মানুষ এলেন যিনি বাঙলা রঙ্গমঞ্চকে আবার খাড়া করে তুলতে পারবেন।'"

প্রথম অভিনয়-রজনীর অন্যতম দর্শক শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন:

"আলমগীরের প্রথম অভিনয়-রজনীতে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, বিশেষ কৌতূহল নিয়েই সে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ, এক নূতন ধরণে অপূর্ব সূক্ষ্মশিল্পকলার অভিনব প্রকাশ দেখলাম শিশিরকুমারের অভিনয়ে। গতানুগতিক উচ্চ চীৎকার ও চিরাচরিত ভঙ্গীতে অভিনয় প্রদর্শনের কোন প্রচেষ্টা নেই—অতি সহজ, শান্ত, সাধারণভাবে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার আবির্ভাব প্রতিক্ষণে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল—দিল্লীর প্রাসাদের অভ্যন্তরে মহাকূটকৌশলী অথচ সহৃদয় সম্রাট আলমগীর যেন প্রত্যক্ষ দর্শকদের চক্ষুর সামনে আবির্ভূত হয়েছেন।"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "তাহার আলমগীর নির্মম, কূটকৌশলী আত্মগোপন দক্ষ মোগল সম্রাটের এক অপূর্ব প্রতিকৃতি। তাহার লৌহ-বর্মের পিছনে যে আবেগ-স্পন্দিত, কোমল রক্তমাংসে গড়া হৃদয়-নিঃসঙ্গতার ছদ্মবেশের মধ্যে সহানুভূতির কাঙাল-প্রকৃতি লুকান ছিল তাহা কোন

ঐতিহাসিক আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন নাই। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ইহার ক্ষীণ ইঙ্গিত দিয়াছেন, কিন্তু নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমারই ইহাকে পরিপূর্ণ সর্বজনসংবেদ্য রূপ দিয়াছেন—দূর ইতিহাসের আলোছায়ায় আবৃত, নাট্যকলায় ঈষৎপ্রতিভাত, রহস্যময় চরিত্রটি একেবারে আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের সহজ উপলব্ধির বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় চিরপ্রহেলিকাময় আলমগীরের ইহাই যেন সত্য প্রতিকৃতি, যেন অন্তরলোকের যে-গোপন চাবিকাঠির দ্বারা তাহার মনের কলকব্জার জটিল প্যাঁচ খোলা যায়, তাহাই শিশিরকুমার আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল-পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আলমগীরে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে তাঁর কলানৈপুণ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন: "মাসাধিককাল আগে আলমগীরে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হওয়া অবধি তাঁর কলাকারু সম্বন্ধে দুচারটা কথা অনাড়ম্বর ভাবে লেখার ইচ্ছে জন্মেছিল। অভিনয়কলা সম্বন্ধে যে আজ লিখতে সাহসী হয়েছি, তা এই ভেবে যে, আমাদের দেশে শিল্পকলা সুধীজন সমাজে এতই অবজ্ঞাত যে, সে সম্বন্ধে প্রত্যেক আন্তরিক তারিফ প্রচারেরই একটা কম বেশী মূল্য আছে। য়ুরোপে—যেখানে specialisation-এর প্রতাপ বড়ই বেশী—সেখানে এরূপ dilittante আলোচনার তত দরকার থাকে না—(যদিও তা সত্ত্বেও এর দাম যে সেখানেও একেবারে নেই তা জোর করে বলা যায় না)। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক দেশে বিশেষ করে শিল্পকলা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা শুধু যে পুণ্যবানে শোনে না তাই নয়, জ্ঞানবানেও করা অনুচিত মনে করে।

"অথচ শিশিরকুমারের আলমগীর অভিনয় এতই অপূর্ব হয়েছে যে তাতে মাদৃশ অ-বিশেষজ্ঞও দু-চারটে কথা না বলে থাকতে পারছে না।

"কাল এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি শিশিরকুমারের আলমগীর অভিনয় দেখেন নি। তাঁর এক বিলাত-ফেরত আত্মীয়া তাঁকে বলেছেন যে, শিশিরকুমারের অভিনয় সুন্দর হয়েছে বটে, কিন্তু বিলাতের অভিনয়ের মতন হয় নি।

"কথাটা শুনে একটু হাসিও পেল, দুঃখও হল; সেটা এই কথা ভেবে যে, বিলাত সম্বন্ধে এরূপ অভ্রভেদী ধারণা আমাদের শিক্ষিত সমাজের মন থেকে দূর হতে এখনও অনেক দেরি। বস্তুতঃ আমাদের বিচিত্র মন বস্তুটি কেমন যেন

সহজে বিশ্বাস করতে চায় না যে, 'বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনার রূপোর নয়,—' এখানে আমাকে যেন ভুল বোঝা না হয়। বিলেতের লোকের অনেক মহৎ গুণ আছে এ কথা অস্বীকার করা আমার অভিপ্রায় নয়, বা সে-সব দেশের গুণকে ছোট প্রতিপন্ন করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাই বলে যে তাদের আমরা ধর্ত্তে ছুঁতে পারবো না, এ কথা স্বীকার করতে আমি রাজি নই—যদিও এরূপ ধারণা আমাদের মধ্যে অনেকেরই যেন মগ্নচৈতন্যে (Subconscious mind) শিকড় গেঁথে আছে বলে মনে হয়। যেমন কাউকে কাউকে আমি বলতে শুনেছি যে, শ্বেতচর্মের মত Punctuality গুণটি আয়ত্ত করা আমাদের সাধ্যাতীত বা তাদের মতন নিয়মানুগত্য discipline আমাদের ধাতেই সইতে পারে না। কিন্তু মত প্রকাশের সময় যদি একটু ভেবে দেখতে চেষ্টা করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, কোনও জাতির মধ্যে এ রকম গুণের আদর বাড়ানো নির্ভর করে—এসব বিষয়ে তাদের tradition-এর উপর—তাদের কোনও অতি-মানুষ-সুলভ ক্ষমতার উপর নয়। আমাদের এই আত্মপ্রত্যয়টা অর্জন করা দরকার যে, এ tradition আমরাও গড়ে তুলতে পারি, এবং যেদিন এতে কৃতকার্য হব সেই দিনই আমরা বাইরনের মতন হঠাৎ একদিন উঠে দেখব যে, আমরা প্রখ্যাতকীর্তি হয়ে পড়েছি। বিশেষতঃ ললিতকলায় ওরূপ প্রায়ই ঘটে দেখা যায়, যেমন জার্মানিতে ইতালীয় অপেরার tradition গড়ে ওঠার পর Wagner প্রমুখ সঙ্গীতকারদের অপেরার ক্ষেত্রে ঘটেছিল, বা ইতালীর Renaissance-এর tradition স্পেনে শিকড় নেওয়ার পর Velasquez প্রমুখ শিল্পীর চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে হয়েছিল, বা ফরাসী সারা বার্ণাডের অভিনয়ের tradition ইতালীতে অঙ্কুরিত হওয়ার পর Eleanova Duse প্রমুখ ইতালীয় অভিনেত্রীর শিল্পচাতুর্যের ক্ষেত্রে হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি ; সুতরাং কোনও দেশে কোনও শিল্পীর বিকাশ সাধন কর্তে হলে আসল দরকার হচ্ছে সে শিল্পের একটি মহৎ tradition গড়ে তোলা।

"আমার মনে হয় যে, বর্তমান সময়ে শিশিরকুমার অভিনয় কলায় এই মহৎ tradition-টিকে গড়ে তুলেছেন—অন্ততঃ গড়ে তুলবার পক্ষে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সেজন্য প্রত্যেক কলানুরাগীরই শিশিরকুমারের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

"শিশিরকুমার আলমগীরের ভূমিকায় ভারতীয় অভিনয়কলার এতই উৎকর্ষসাধন করেছেন যে আমার মনে হয় যে ইংলণ্ডের কোনও অভিনেতার

চেয়েই কৃতিত্ব তাঁর কম নয়—যদি এঁদের তুলনায় শিশিরকুমারের handicap (সুযোগাভাব) গুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখা যায়।

"তবে একে বিলেত দেশ—(যে দেশের লোক জুতোর দোকানে আমাদের জুতো পরিয়ে দেবে ভাবলেও আমাদের মন এক সময় অবিশ্বাস ও সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হত) তার ওপর সাহেব, তার ওপর ইংরেজীভাষী, তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেশী শিশিরকুমারের তুলনা (যখন তার ওপর আবার বিলাত-ফেরতও নহেন) ?—এ কথা ভাবলে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যেমন পূর্বোক্ত ভদ্রমহিলার হয়েছিল, অনেক দিনের hypnotism একদিনে দূর করা কঠিন।

"তবে, আমি সাধারণকে আরও একটু shock করে দিতে আজ কৃত-সঙ্কল্প হয়েছি। ইংরেজের চেয়ে ফরাসীরা শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (এ শুধু আমার মত নয়, ভারতীয়দের মধ্যে অভিনয় কলার প্রায় একমেবাদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ সমালোচক সাহিদ সুরওয়ার্দি অপিচ অন্যান্য য়ুরোপীয়দেরও এই মত) ফরাসীদের চেয়ে রুষজাতি শ্রেষ্ঠ। ইতালীয় অভিনয় আমি দেখি নি, কিন্তু বার্লিনে বন্ধুবর সুরওয়ার্দির কাছে শুনেছি যে ইতালীয়ানরাও নাকি অভিনয় দক্ষতায় ইংরেজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কাজেই অভিনয়কলায় বর্তমান সময়ে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ অভিনেতার স্থানও শিশিরকুমারের চেয়ে উচ্চ নয়, এ কথা বললেও যাঁরা নিখিল য়ুরোপের শিল্প কলার খবর রাখেন তাঁরা খুব impressed হবেন না।

"আমি বলতে চাই যে, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান ও রুষ এই কয় জাতির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং আমার মনে হয় যে, বিখ্যাত রুষ অভিনেতা কাচালভ (Katchalov) ছাড়া আর কোনও অভিনেতাকেই আমি শিশিরকুমারের চেয়ে বড় অভিনেতা বলে মনে করি না। তবে আমার মনে হয় যে, শিশিরকুমার যদি একবার ফরাসী দেশ ও রুষ দেশে সুরওয়ার্দির মতন এ বিষয়ে আরও একটু জ্ঞান সঞ্চয় করতে যান তাহলে কাচালভের সমকক্ষ হওয়াও তাঁর সাধ্যাতীত নয়। কেন নয়, তার কারণ একটু বলা ভাল।

"শিশিরকুমারের 'চাণক্য' অভিনয় দেখে মদীয় ৺পিতৃদেব (স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) মুগ্ধ হয়েছিলেন মনে আছে। আলমগীরে কিন্তু শিশিরকুমার সে 'চাণক্য'কে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে এসেছেন (যদিও আমি তাঁর এখনকার

'চাণক্য' অভিনয় দেখি নি)। তাই আমার মনে হয় যে, শত অসুবিধা ও অস্মদ্দেশীয় অ-সমজদারদের হীনরুচির মাঝখানেও যিনি আমাদের অভিনয়-কলার সুর এমনভাবে বদলে দিতে পারেন—তিনি যে সুযোগ পেলে সর্বশ্রেষ্ঠ রুষ অভিনেতারও সমান হতে পারবেন এটা আশা করা বোধ হয় আকাশকুসুম নয়। য়ুরোপে অভিনয়ের standard আমাদের চেয়ে অনেক উঁচু—বিশেষতঃ ফরাসী ও রুষ অভিনয়। তাই সে tradition-এর সাহায্যে সে সব দেশে যত সহজে অভিনয়কলার উৎকর্ষ সাধন করা যায় (কারণ সাধারণের মধ্যে উচ্চশিল্পে রুচির বিকাশ না হলে শিল্পকলার উচ্চতা বজায় রাখা যে কত দুরূহ তা শিল্পী মাত্রেই জানেন), আমাদের দেশে তদভাবে অভিনয়কলার সে উৎকর্ষসাধন শতরূপে বেশী কঠিন।

"সেইজন্যেই শিশিরকুমারের আলমগীর অভিনয় দেখে জনৈক বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক সম্বন্ধে একজন বড় সমালোচকের ছোট্ট সমালোচনাটি মনে পড়েছিল :—Boys ! here is a genius at last, take off your hats.

"বস্তুতঃ শিশিরকুমারের অভিনয়-নৈপুণ্য দেখে মনে হল যে, এখানে আর যাই থাকুক না কেন ফাঁকি নেই। কারণ আলমগীরের মতন 'ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া' রূপ অসাধ্য সাধন করতেও যিনি সাহস করেন ও তাতে কৃতকার্য না হলেও (কারণ এতে কৃতকার্য হওয়ার চেয়ে অসম্ভব কাজ এ মরজগতে বোধ হয় আর নেই) আংশিকভাবেও সফলতা লাভ করেন, তাঁর প্রতিভার সামনে মাথা নীচু না করেই উপায় নেই! তবে আলমগীর নাটকখানি সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় তাই শিশিরকুমারের সম্বন্ধে মাত্র আর দু-একটি কথা বলেই ক্ষান্ত হব।

"শিশিরকুমারের অভিনয় অসম্ভব ভালো হওয়ার দরুণ একটা মুস্কিল হল এই যে, আলমগীরে অন্য কোন অভিনয় চোখেই পড়ল না। এইজন্য প্রতিভার পাশে দাঁড়ানোটা হচ্ছে, যাকে ইংরেজীতে বলা যেতে পারে thankless task.

"শিশিরকুমার আজ অভিনয়কলার এমন একটা স্থলে পৌঁছেচেন যেখানে তাঁর প্রতি পদক্ষেপে স্রষ্টার লাস্য-লীলা প্রকট হতে থাকে—ইংরেজীতে যাকে বলে The hand of a master, অভিনয় বা অন্য শিল্পে ও প্রত্যেক বড় শিল্পীও প্রথম প্রথম ততদিন সন্দিগ্ধচিত্ত থাকতে বাধ্য, যতদিন তাঁর আত্মপ্রত্যয় না জন্মায়। এ আত্মপ্রত্যয় আসে যখন শিল্পী সৃষ্টি করার প্রেরণা পাবার সঙ্গে

technique-কে হস্তামলকীর মতন আয়ত্ত করেন। এক কাচালভ ছাড়া অভিনয়ের technique-এ শিশিরকুমারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণপনা অন্ত কোন অভিনেতার মধ্যেই অন্ততঃ আমি তো দেখি নি।

"প্রতি শিল্পের মধ্যে একটা আবেদন আছে যা উদার হৃদয় শিক্ষিত মানবের কাছে বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে—অবশ্য যদি তাঁদের ও শিল্পীর একটু না একটু চেষ্টা থাকে। তবে এ আবেদন বিশ্বজনীন হয় কেবল প্রথম শ্রেণীর শিল্পের ক্ষেত্রে। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি। ব্যাপারটা এই যে, যদি কেউ বিদেশে গিয়ে কোনও বিদেশী শিল্পের রস গ্রহণ করতে প্রয়াসী হন, তাহলে দেখা যায় যে, বিদেশী শিল্পের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের আবেদনের দাম তার কাছে পনেরো আনা হলে সে শিল্পীর দ্বিতীয় শ্রেণীর আবেদনের দাম হবে এক আনারও কম। কথাটা ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না। তবে দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় আমার বক্তব্যটি আরও পরিস্ফুট করা যাবে। সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত দিলে দেখা যায় যে, কোনও ভারতীয় সঙ্গীতবিৎ য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ জার্মান সঙ্গীতকার Beethoven-এর দাম যদি দেন পনেরো আনা তবে Mozart-এর দাম দেবেন এক আনা,—যদিও কোনও জার্মান সঙ্গীতবিৎ Beethoven-কে Mozart-এর চেয়ে অনুপাতে এত ঊর্ধ্বে স্থান দেবেন না। তাই আমার বক্তব্যটি এই যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পের দাম থাকলেও, তাতে সাড়া দেয় কেবল স্বদেশের লোক; শিল্পকলার আবেদন বিশ্বজনীন হয় কেবল তখনই, যখন সে শিল্প প্রথম শ্রেণীর হয়—যেমন সমগ্র য়ুরোপে রুশ অভিনেতা কাচালভ বা ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণাডের (অবশ্য আমি তাঁর বৃদ্ধ বয়সের অভিনয় প্যারিসে একবার মাত্র দেখেছিলুম L. Armande নামক নাটকে) অভিনয়ের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তেমনি আমার মনে হয় যে, য়ুরোপীয়েরা যদি এখানে কারুর অভিনয় হতে যথার্থ আনন্দ পায়, তাহলে তারা শিশিরকুমারের মতন অভিনয় হতেই সে আনন্দ পাবে।"

অসংখ্য চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে যেগুলি শিশিরকুমারের মহৎ সৃষ্টি, যেগুলির মধ্যে শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেচে, সেগুলির মধ্যে 'আলমগীর' অন্যতম। সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীমণি বাগচি লিখেছেন:

"ব্যক্তিত্বাভিমানী, চিরঅপরাজেয় আলমগীরকে মঞ্চে শিশিরকুমার যেভাবে উপস্থাপিত করতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পক্ষেও তা দুঃসাধ্য। আলমগীরের বিপক্ষে আছে উদিপুরী। বাংলা নাটকে উদিপুরী একটি আশ্চর্য

চরিত্রসৃষ্টি। ঘৃণার সঙ্গে প্রেম, সরলতার সঙ্গে দুর্বলতার অপূর্ব মিশ্রণে গঠিত এই চরিত্রটির বিপরীতে দাঁড়িয়ে আলমগীরকে তার সেবা ও করুণার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। আলমগীর যতক্ষণ জাগ্রত ততক্ষণ তিনি শক্তিমান, অপরাজেয়। কিন্তু নিদ্রাভিভূত, স্বপ্নাভিভূত আলমগীর তেমনি অসহায়—নিজের অজ্ঞাতে স্বপ্নের ঘোরে তিনি আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে যান। মঞ্চে এই দ্বিধাবিভক্ত আলমগীর চরিত্রের অভিব্যক্তিতে শিশির-প্রতিভা যে অপূর্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করত, তার তুলনা নেই। আলমগীরের মুখ আর মন যে এক নয় (মুখে তার ধর্মের বুলি আর অন্তরে সাম্রাজ্যের লিপ্সা) তা অভিনয়ের ভেতর দিয়ে প্রতিটি দৃশ্যে শিশিরকুমার এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলতেন যা ভাষায় বুঝিয়ে বলবার নয়! যে দৃশ্যে তিনি দিলিরকে বলছেন :

'ভুল বুঝছ দিলির খাঁ। আক্রোশ আমার কারো ওপর নেই। ভালবাসা—যে কথাটার সাধারণ অর্থ মমতা—তাও কারও ওপর নেই। ভালবাসি একমাত্র ধর্ম। ফকিরী নিতে গিয়ে সেই ধর্মের জন্য আমি বাদশাহি নিয়েছি।'

"—তখন ঔরংজেবের অন্তরের কপটতাকে শিশিরকুমার যে কি সুনিপুণ সূক্ষ্মতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতেন, চক্ষের দৃষ্টিতে, প্রতিটি কথার উচ্চারণের ভঙ্গীতে, বাদশাহের কপটাচরণ তাঁর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে কি অনির্বচনীয়-রূপে অভিব্যক্ত হোত, সে-শিল্পসৃষ্টি অনুভবের জিনিষ, ব্যাখ্যানের নয়। আবার এই কপট ধর্মাশ্রয়ী সম্রাট যখন মর্মস্পর্শী ভাষায় সুজার ও তার স্ত্রী পিয়ারীবানুর শোচনীয় মৃত্যুর বর্ণনা দেন, তখন শিশিরকুমারের অভিনয় দর্শকের চক্ষের সামনে সম্রাটের যে হৃদয়বান্ মহানুভব রূপকে মঞ্চের ওপর ফুটিয়ে তুলতো, বাঙলা মঞ্চে তেমন অভিনয় পূর্বে কখনও দেখা যায় নি, পরেও আর কখনো দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। এখানে নাট্যকারের ভাষা অভিনেতাকে অবশ্য খুবই সাহায্য করে। সেই মর্মস্পর্শী ভাষাকে শ্রোতার চিত্তস্পর্শী করে তুলে মোগল-বংশ গরিমায় প্রবুদ্ধ সম্রাটের ছবিকে শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে যেভাবে মঞ্চে রূপায়িত করতেন তা অবিস্মরণীয়। সেই দীর্ঘ সংলাপ মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে একা আলমগীর-রূপী শিশিরকুমার দিলির খাঁর উদ্দেশে যেভাবে বলে যেতেন, তা মুহূর্ত মধ্যে দর্শকদের অন্তরে প্রবিষ্ট হোয়ে এমন ভাবসন্ধি ঘটাতো যার সম্যক বর্ণনা অসম্ভব। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে হৃদয়-মন দিয়ে শুনতে হোত সেই সংলাপ। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে আমরা আলমগীরের দর্শন পাই। নাটকে তাঁর সর্বপ্রথম স্বগতোক্তিটিই

আলমগীর-চরিত্রের পরিচায়ক। মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পিছনে হাত দুখানি রেখে, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষিপ্র পদে পাদচারণা করতে করতে শিশিরকুমার সেই স্বগত-উক্তিটিকে এমন ভঙ্গীতে রূপ দিতেন যা মুহূর্ত মধ্যে দর্শকের মনকে উন্মুখ করে তুলতো। এই দৃশ্যে আলমগীরের দ্বৈতসত্তাকে শিশিরকুমার যেভাবে তাঁর অলৌকিক অভিনয়ের ভেতর দিয়ে স্তরে স্তরে ফুটিয়ে তুলতেন যা একমাত্র তাঁর মতন প্রতিভাবান নটের পক্ষেই সম্ভব। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে অপরাজেয় এবং ব্যক্তিত্বাভিমানী আলমগীরের শিশুর মতো নিঃসহায় রূপটিকে শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে যেভাবে অভিব্যক্ত করতেন, তা অভিনয়কলার ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর রোমাঞ্চকর সৃষ্টি।

"আলমগীর ট্রাজেডি। ক্ষমতা, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী ঔরংজেব, জরা, মনোবিকার, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং স্ত্রী-বুদ্ধির কাছে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত আর কখনো হন নি। শক্তির উন্মাদনায়, বুদ্ধির কূটত্বের ভরসায় তিনি হৃদয়ের শাশ্বত সত্যকে আজীবন ফাঁকি দিয়ে এসেছেন। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের শোচনীয় পরিণাম, শিশিরকুমারের অভিনয়ের এই ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে মঞ্চে প্রতিটি দৃশ্যে যে ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠতো, তার বিশদ আলোচনা একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকের স্থান দাবী করে। তবে এই কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, তাঁর নটজীবনের প্রারম্ভে যেমন, তেমনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আলমগীরের ভূমিকাভিনয়ে তাঁর প্রতিভা কোনদিনই ম্লান দেখা যায় নি, বরং শিশিরকুমারের পরিণত বয়সের আলমগীর যেন সেই রূপদক্ষ শিল্পীর মহৎ সৃষ্টি বলেই বিবেচিত হবে।...শিশিরকুমারের শরীর বৃদ্ধ বয়সেও এতটুকু ভাঙ্গে নি। তাঁর সেই বীরোচিত দীর্ঘ বপু তেমনি উন্নত ছিল, আর তাঁর সেই বিচিত্র কণ্ঠস্বরের volume এবং অপূর্ব মাধুর্য ছিল তেমনি অম্লান। আলমগীরের সেই 'দিলির' ডাকের মধ্যে বৃদ্ধ বয়সেও শিশিরকুমার যে বিদ্যুতের চমক দিতেন তাতে দর্শকের হৃদয় কেঁপে উঠতো—এক অকল্পিত শিহরণ খেলে যেত সমগ্র প্রেক্ষামণ্ডপে।"

আলমগীর চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি।

স্বর্গীয় প্রেমাঙ্কুর আতর্থী শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন: "আলমগীর যেদিন খোলা হয় সেদিনকার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। ইংলণ্ডের রাজপুত্র ভারতবর্ষে আসায় সমস্ত

ভারতবর্ষ নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। সেইদিন তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। চৌরঙ্গী অঞ্চলে ও সাহেব পাড়ায় ফুটল আলোর জৌলুষ আর দিশি পাড়ায় রৈল অন্ধকার। রাস্তায় একটিও গ্যাস জ্বলছে না। কোথা থেকে অ্যাসফেল্টের কাপড় তুলে এনে সমস্ত কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট জুড়ে ট্রামের লাইনের ধারে ও ওপরে সারি সারি করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুটপাতের কোণের ডাস্টবিন রাস্তার মধ্যখানে এসেছে। গাড়ি নেই, ট্রাম নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকার—রাস্তায় লোকজনও বিরল। আমরা সন্ধ্যে থেকে জনকয়েক গজেনদার আড্ডায় বসে আছি। আলো জ্বালালেই দলে দলে ছোকরারা এসে বাতি নিভিয়ে দিতে বলছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে ম্যাডান থিয়েটারের কাছে খুব মারামারি চলেছে। যতদূর মনে পড়ছে—বোধ হয় হেমেন্দ্রকুমার ও মণিলাল সত্যমিথ্যা জানবার জন্যে ম্যাডান থিয়েটারের দিকে চলে গেল। কিন্তু পরে শোনা গেল—বিশেষ কিছু গোলমাল হয় নি, তবে দর্শকও সামান্যই হয়েছিল। এই ভাবে আলমগীরের প্রথম রজনী অভিনীত হল।

"কয়েকদিন পরে আমরা গুটিকয়েক বন্ধু দুপুরবেলার শোতে আলমগীর দেখতে গেলুম। নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা আগে গিয়েও দেখলুম প্রেক্ষাগৃহ একেবারে জনপূর্ণ। কর্তৃপক্ষ কিন্তু তখনও টিকিট বেচতে ছাড়েন নি। আমরা—সত্যেন দত্ত, মণিলাল, হেমেন্দ্রকুমার, সুরেশ বাঁড়ুজ্জে ইত্যাদি কয়েকজন কোনরকমে দাঁড়ে বসার মত একটু একটু জায়গা করে বসলুম। কর্তৃপক্ষ নির্বিকার—তখনও টিকিট বেচে চলেছে—দলে দলে লোক ঢুকছে। যাইহোক ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে যবনিকা উঠল।

"প্রথম দৃশ্যেই শিশির এমন চমক লাগিয়ে দিলে যে দর্শক সাধারণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর দৃশ্যের পর দৃশ্য চলতে লাগল। সমস্ত স্টেজখানা জুড়ে কেবল শিশির আর শিশির। অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রী আসছে যাচ্ছে। কিন্তু লোকে উদ্‌গ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করছে শিশিরের। মনে হতে লাগল যেন এক অতুলনীয় শক্তিশালী যাদুকর তার মায়াজাল বিস্তার করেছে। প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি লোক সে মায়ায় মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে আছে।

"আশ্চর্য কণ্ঠস্বর! অদ্ভুত সে কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা! অপূর্ব স্বরনিয়ন্ত্রণী শক্তি! আলমগীর নাটকের শেষ দৃশ্যে সম্রাট ঔরঙ্গজেব যখন রাণা রাজসিংহের

কৌশলে দোবারীর গিরিবক্ষে সসৈন্যে আটকা পড়েছিলেন সেই সময় কয়েক দিনের অনাহারে তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক অবস্থায় শিশিরের সেই কণ্ঠস্বরের অভিব্যক্তি বোধ হয় পৃথিবীর যে কোন অভিনেতার পক্ষে গৌরবের কথা।

"আমি হেনরি আরভিং, স্যার বীরভোমট্রি বা কাচালভের অভিনয় দেখি নি, কিন্তু আমাদের সময়ে শেক্‌স্‌পীরীয় নাটকের সব থেকে বড় অভিনেতা মাথিসন ল্যাং-এর হ্যামলেট, শাইলক ও ওথেলো দেখেছি। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি শিশিরের এই আলমগীর অভিনয় তাকেও নিঃসন্দেহে ছাড়িয়ে উঠেছিল। শুধু আমি নই, এই মত সেদিন অনেকেই প্রকাশ করেছিলেন।"

বাচনিক অভিনয়ে শিশিরকুমার যে-বিচিত্র ইন্দ্রজাল বিস্তার করতেন সে-সম্পর্কে স্বর্গীয় হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন: "আলমগীর হচ্ছে একটি বিপুল ভূমিকা, কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর এমন কি কোন কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার পক্ষেও তার ভার দুঃসহ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এ হেন ভূমিকাও শিশিরকুমার এমন অবলীলাক্রমে অভিনয় করেন যে, তাঁর শক্তির বিশালতা না দেখে উপায় নেই।...দৃষ্টান্তস্বরূপ কেবল আলমগীরের স্বপ্ন-দর্শন দৃশ্যের উল্লেখ করতে পারি। এ দৃশ্যটিকে কাঁচি চালিয়ে ঢের ছোট করে ফেলা হয়েছে, কিন্তু আগে বোধ হয় এ দৃশ্যটির স্থায়িত্ব ছিল অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কম নয়। কিন্তু এই সুদীর্ঘকাল ধরে রঙ্গমঞ্চ অধিকার করে থাকেন ধরতে গেলে কেবল দুইজন শিল্পী - আলমগীর ও উদিপুরী ভূমিকায়। এখানে শিশিরকুমার অধিকাংশ সময়টাই থাকেন উপবিষ্ট অবস্থায়, অথচ এতখানি সময় দর্শকরা প্রায় শ্বাসরোধ করে মাত্র তাঁর ভাষণের ইন্দ্রজালেই একেবারে অভিভূত হয়ে থাকে এবং তাঁর মুখের কথাগুলিই বারংবার সৃষ্টি করে বিচিত্র নাটকীয় ক্রিয়া। আর কোন বাংলা নাট্যাভিনয়ে শিল্পীর সৃষ্ট এমন দীর্ঘকাল-ব্যাপী কুহকের তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

শিশিরকুমারের অসাধারণ উচ্চারণ-ক্ষমতা সম্পর্কে বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্র লিখেছেন: "পাশাপাশি যদি দুটি বিরুদ্ধ অর্থের কথা থাকে, যেমন ধর, কোমল ও কঠোর, তাহলে সমগ্র লাইনটার বা বক্তব্যের ছন্দ বিনাশ না করে তিনি ঐ কথা দুটোর উপযুক্ত মূল্য দিয়ে যেতে পারেন লহমার মধ্যে নিজের অসাধারণ উচ্চারণ-ক্ষমতায়। (এ ক্ষমতা বাঙলা মঞ্চে আর কারো আছে কিনা সন্দেহ।) এবং তার ফলে ছাপার অক্ষরে যা একান্ত নির্জীব তা হঠাৎ রোদ্দুরের আলোর মতন ঝলমল করে ওঠে তাঁর ভাষণে। তা ছাড়া,

যাকে বলে 'জান্তব চিৎকার' সেই রকম একটা ক্রুদ্ধ উন্মত্ত জন্তুর মত গর্জন করে উঠতে পারেন যা অনন্যসাধারণ। তাঁর নাদির-শার ভূমিকায় বা কখনও কখনও আলমগীরের ভূমিকায় সেই গর্জন আমি শুনেছি। কথাবিহীন কেবলমাত্র একটা চীৎকারে যে অত স্পষ্ট করে একটা চরিত্রের আদিমতা বোঝান যায় তা তো আগে ভাবতেই পারি নি।"

শিশিরকুমারের অতুলনীয় কণ্ঠস্বরের কারুকার্য সম্পর্কে শ্রীশম্ভু মিত্র 'কিছু স্মরণীয় অভিনয়' নামক প্রবন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি ঃ—

"আলমগীর নাটককে ভাদুড়ী মশায় নিজেও ঠাট্টা করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সব নাটক তিনি করে গেছেন, তার মধ্যে আলমগীরও একটি। দর্শকদের মনে এটার এক ধরণের আবেদন ছিল।

"নাটকটা যখন আমি প্রথম পড়ি, এবং ভাদুড়ীমশায় কীভাবে সেটিকে মঞ্চোপযোগী করার জন্যে কেটেছেন ও সাজিয়েছেন সেটা দেখি, তখন যে কী পরিমাণ মুগ্ধ হয়েছিলুম তা বলা যায় না। এবং আমার বিশ্বাস আজও যদি কেউ সেটা দেখেন তো তিনিও মুগ্ধ হবেন। নাটক কী করে কাটতে ও সাজাতে হয় সে সম্পর্কে সেই বোধ হয় আমার প্রথম শিক্ষা।

"সেই নাটকে একটা দৃশ্য ছিল যেখানে আলমগীরের একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে তয়বর খাঁ এসে তাঁকে কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়। আলমগীর নিজের ঐ বিভ্রান্ত অবস্থায় তয়বর খাঁকে চিনতে পারেন না। তয়বর খাঁ নিজের নাম বলে। আলমগীর যেন অশ্রুতপূর্ব অজানা একটা নাম শুনছেন এইভাবে আপন মনে উচ্চারণ করেন, তয়বর?—কিন্তু এই উচ্চারণের ফলেই যেন তাঁর স্মৃতির অত্যন্ত গভীর প্রদেশে কী একটা আলোড়ন সুরু হয়ে যায়। আলমগীর যেন সেই তলদেশ থেকে এই নামটাকে উদ্ধার করতে চান। যেন নিজের মনের মধ্যে ডুবে এই নামটাকে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজেন। আপন মনে বলেন, —তয়বর, তয়বর।—হঠাৎ যেন নামটা পরিচিত বলে বোধ হয়। চোখে মুখে সেইরকম আভা আসে। প্রশ্নসূচকভাবে বলেন, —তয়বর?—যেন বলতে চান যে, — তয়বর, না? হ্যাঁ হ্যাঁ এ নামটা তো আমি জানি। তারপরেই সব কথা যেন দ্রুত মনে পড়তে থাকে, —ও হ্যাঁ, তাইতো, তয়বর—সেনাপতি তয়বর, —হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বিশ্বস্ত অনুচর তয়বর, —বুঝতে পেরেছি, তয়বর, —ঠিক, —তয়বর।

"এই সমস্ত ভাবটা তিনি প্রকাশ করতেন কেবল বারংবার নানা রকমে ঐ 'তয়বর' নামটি উচ্চারণ করে। এবং সেই বলবার ধরণে আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারতুম যে ঐ মানুষটির মনটা কি রকমভাবে আস্তে আস্তে আবার আমাদের এই দৈনন্দিন জগতের স্তরে ফিরে আসছে। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।

"কতবার তো আমি এ নাটক দেখেছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই যেন আমার কাছে নতুন লাগতো। কারণ প্রত্যেকদিনই তো এই ছন্দের খেলাটা নতুন করে তৈরি হত, আর হঠাৎ হঠাৎ যেন এক একটা নতুন অর্থ বহন করে আনত। আর আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতুম।

"কিন্তু কেন মুগ্ধ হতুম? এটা তো এমন কিছু প্রগতিবাদী কথা নয়। বিরাট একটা কিছু দার্শনিক উপলব্ধিরও কথা নয়।

"নাটকটার মধ্যে অনেক অসঙ্গত ও অবাস্তব কথা আছে। অনেক স্থলে এ নাটকটার উদ্দেশ্যও আমি বুঝতুম না। তবু এই অভিনয় অংশটা যদি ঘটনাচক্রে কোনদিন খারাপ হয়ে যেত তাহলে আমার দুঃখের সীমা থাকত না।

"তেমনি আর একটা জায়গা ছিল। যেখানে অসুস্থ আলমগীর দিলীর খাঁর কাছে একটা স্বপ্নের বিবরণ বলে। তার আত্মা যেন তার দেহকে ছেড়ে উর্ধ্বে—বহু উর্ধ্বে—চলে যাচ্ছিল, আর তার সেই পরিত্যক্ত মৃত শরীরটার পাশে যেন কত হিন্দু, কত মুসলমান, কত ইহুদী, কত কেরেস্তান, সব যেন ভিড় করে দাঁড়ায়। তারা সম্রাট, আলমগীর ইত্যাদি নামে তাকে ডাকে,— 'উঁহু' কোন সাড়া নেই। তারপরে কে যেন কোথা থেকে ডেকে ওঠে, দিলীর, —মুসলমান। অমনি আমার আত্মার মুখে বাণী ফোটে, সে বলে ওঠে,— 'ঐ, এই আমি'।—এর পরে আরো আছে। স্বপ্নের মধ্যে তিনি যেন তৃষ্ণার্ত, কত জাতির কত লোক সোনার ঝারিতে করে যেন জল নিয়ে এলো। কিন্তু তিনি সে জল পান করতে পারলেন না। 'এমন কি দিলীর,—তুমি, যাকে আমি শ্রেষ্ঠ মুসলমান বলে শ্রদ্ধা করি,—সেই তুমিও নিয়ে এলে জল, কিন্তু আমি সে জল পান করতে পারলাম না। কেন পারলাম না দিলীর?' (যতদূর মনে পড়ে এই ধরণেরই সংলাপ ছিল)।

"মঞ্চের ওপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কতোবার এই অংশটুকুর অভিনয় দেখেছি এবং প্রতিবারই মনে হোত যেন ভাদুড়ী মশায়ের কণ্ঠস্বর একটা মোহ বিস্তার করে আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে। কি অদ্ভুত relaxed বলে মনে হোত

তাঁকে। কণ্ঠ যেন অসুস্থ, ক্লান্ত লোকের। আর সেই আস্তে আস্তে কথা বলার মধ্যে কতো সূক্ষ্ম স্বরবৈচিত্র্য যেন পলকে পলকে ঝলসে উঠতো। কেবল কণ্ঠের কারুকার্যেই যেন মানুষ বুঝুক না বুঝুক কেমন তদ্গত হয়ে যেত।

"এগুলোর মধ্যে কোথাও কোনো গলা ফাটানো প্রগতিবাদ বা দাগাবুলান ইন্‌টেলেকচুয়ালিজম্-এর প্রদর্শন ছিল না। কিন্তু অভিনয়কলা হিসেবে অতুলনীয় ছিল।...

"...অদ্ভুত অভিনেতা যোগেশচন্দ্র (৺যোগেশ চৌধুরী) কেবল একটা অভিনয় পারতেন না। সেটা হোল heroic অভিনয়। তাঁর শম্বুক তাই মনোগ্রাহী হোত না। কিন্তু সে অভাব পূর্ণ হোত ভাতুড়ী মশায়ের কাছে। Heroic অভিনয়ের কাঠামোর মধ্যে কি করে চরিত্রটাকে জীবন্ত করে তুলতে হয় তা তিনি জানতেন। তাই রামের ভূমিকায় ছন্দের সংলাপের মধ্যে তিনি যেসব দৈনন্দিন কথোপকথনের সুর আনতেন সেটা তদানীন্তন অনেক লোকের ভীষণ খারাপ লাগত। আমাদের এক সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি তো ভাতুড়ী মশায়ের ছন্দকে colloquial speech-এর কাছে আনবার চেষ্টায় ভীষণ ক্ষিপ্ত হতেন। কারণ তখন ছন্দের সংলাপে সুরেরই প্রাধান্য ছিল, মানের নয়। গলা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করা হোত।

"শিশিরকুমারের আলমগীর আর নাদির শাহ, রাম ও রঘুবীর ?—Heroic অভিনয়ের যে ব্যাপ্তি তাঁর ছিল তা আর দেখি নি। অনেক অভিনেতা শিশিরবাবুর গোটাকতক মোটাদাগের ভঙ্গী নকল করেছেন, কিন্তু তাঁর অভিনয়ে বাচনের সূক্ষ্মতা লক্ষ্যই করেন নি। আমারও হয়তো লক্ষ্য হোত না যদি না পথ দেখাবার মতো গুরুজন থাকতেন। আমি কৈশোরে একজনের কাছে অভিনয় সম্পর্কে প্রচুর শিক্ষা পেয়েছি। বলতে গেলে তিনিই আমার প্রথম গুরু। তিনি বলতেন,—ভাতুড়ী মশায়ের মুড দেখো যেন সুইচ বোর্ডে বাঁধা আছে। যখনি যে মনোভাব দরকার, তখনই সেগুলো যেন পরপর পটাপট চলে আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই গলার modulation যেন আপনা থেকে হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে কতোখানি প্র্যাক্‌টিস আর কতোখানি ডিসিপ্লিন দরকার বুঝতে পার ? অ্যাকটিং অমনি হয় না।"

আলমগীর চরিত্রাভিনয়ে শিশিরকুমারের বৈপ্লবিক নাট্যপ্রতিভার যে-বিশেষ লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল সে-সম্পর্কে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন : "ইতিপূর্বে গিরীশযুগের অভিনেতৃগণ যেরূপ আবৃত্তি

ভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, বলা বাহুল্য 'আলমগীর' চরিত্রাভিনয়ের আবৃত্তি উহা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের কিংবা তাঁহারই সমকালবর্তী অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, বিনোদিনী, তিনকড়ি প্রভৃতি অভিনেতৃর অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য লইয়া আমি জন্মগ্রহণ করি নাই। তবে গিরিশচন্দ্রেরই সমসাময়িক আর একজন দিকপাল অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথের নাটকীয় আবৃত্তি রেকর্ডের মাধ্যমে শুনিয়াছি। এবং যাঁহারা পরবর্তীকালে গিরিশযুগের অভিনয় ধারাকে অগ্নিহোত্রীর মত সযত্নে, রক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই যথা, দানিবাবু, কুঞ্জ চক্রবর্তী, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, হাঁদুবাবু, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, প্রকাশমণি প্রভৃতির এমন কি শিশিরযুগেও যিনি পুরাতন নাটকের অভিনয়ে গিরিশযুগের ধারাকেই অনুসরণ করিতেন সেই স্বর্গত নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উহাদের আবৃত্তিতে যে প্রকৃতিটি সকলের মধ্যেই সাধারণ ছিল, উহাকেই গিরিশযুগীয় অভিনয় স্বরভংগির লক্ষণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সেই লক্ষণ হইতে বুঝা যায় –তৎকালে আবৃত্তি উদাত্ত গম্ভীর হইত বটে, কিন্তু একটা মাত্রাহীন সুরের মিশ্রণে উহা অনেকখানি অস্বাভাবিকও হইত। কেমন একরকম যাত্রাসুলভ টানা টানা সুর, অস্থানে অনাবশ্যক গমক এবং সাধারণ কথাতেও আবেগপ্রধান স্বরকম্পন প্রভৃতির সমন্বয়ে সাধনার নানারূপ কসরৎ ছিল বটে, কিন্তু সেই সাধনা কখনও বাস্তবের সঙ্গে যোগসাধনে প্রয়াসী হয় নাই। যাঁহারা স্মৃতিশক্তির অভাববশতঃ সেই স্বরভংগিকে স্মরণ করিতে পারিতেছেন না তাঁহাদিগকে 'ভ্রমর' নাটকের নিশাকর-রোহিণী-গোবিন্দলালের অতি বিখ্যাত দৃশ্যের আবৃত্তি সমন্বিত রেকর্ডটি একবার শুনিতে অনুরোধ করি। দেখিবেন— 'পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রেখেছিলুম' ইত্যাদি আবেগপ্রধান অংশে তো বটেই, এমন কি—'কই, কে তোর বাবু? কাকে জিজ্ঞাসা করবো?' প্রভৃতি সাধারণ সংলাপের অংশেও গোবিন্দলালরূপী অমরেন্দ্রনাথ মাত্রাজ্ঞানহীন চিৎকারে ও গমকে আবৃত্তিকে, তথা নাটকীয় চরিত্রকেই অ-পার্থিব এবং অমানবিক করিয়া তুলিয়াছেন।

"এস্থলে 'স্বাভাবিক' এবং 'বাস্তব' কথা দুইটির সম্পর্কে তর্ক উঠিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, সাধারণ জীবনে আমরা যে সুরে যে ভংগিতে কথা বলি, অভিনয়কালে উহার অবিকল অনুকরণ করিতে গেলে উহা দর্শকদের

শ্রুতিগ্রাহ্য হইতে পারে না। এই কারণেই অভিনয়ের আবৃত্তিতে কিছু পরিমাণ কৃত্রিমতা মিশাইতেই হয়। এক্ষণে সেই কৃত্রিমতার সীমারেখাই বিবেচ্য। সৃষ্টি কখনও বাস্তবের অনুকরণ হয় না বটে, কিন্তু অপরপক্ষে উহা বাস্তব-সত্যের বিরোধীও হয় না। আর্ট অনুকরণ নয়—অনুসরণ। এই অনুসরণই ভোক্তার চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে। সৃষ্টি তখন বাস্তব না হইয়াও বাস্তব, এমন কি বাস্তবের অধিক বলিয়াই মনে হয়। নাটকীয় আবৃত্তিতে এইরূপ বিভ্রম সৃষ্টির জন্য নট-নটীর সাধনার প্রয়োজন হয়। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে স্বর-নিক্ষেপের প্রণালী অভিনেতৃর নিকট এমনই আয়ত্ত হইয়া থাকে যে, তখন আর সংলাপ আবৃত্তির কালে তাঁহার পক্ষে অযথা চীৎকার করিবার প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া বাস্তব স্বরভংগির সঙ্গে তিনি এমন ভাবে অবাস্তব সুর মিশ্রিত করিতে পারেন যাহা পরিমিত মাত্রার জন্যই শ্রোতার নিকট অতি স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

"'আলমগীর'-এ সিদ্ধকণ্ঠ স্বররসিক শিশিরকুমার এইরূপ অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতাকেই রসিকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। আবৃত্তি যে কতখানি সুরেলা হইতে পারে, আবার উহাই যে কতদূর সুরবর্জিত হইতে পারে—'আলমগীর' চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে তাহাই আমরা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছি। ঐ নাটকে দিলির খাঁর সম্মুখে স্বপ্ন-বর্ণনা দৃশ্যে শিশিরকুমারের কণ্ঠে যে ছন্দ এবং সুর-ঝংকার বাজিয়া ওঠে, গিরিশযুগে সেইরূপ সুর যেমন অপরিজ্ঞাত ছিল, তেমনই 'উদিপুরী-আলমগীর'-এর কথোপকথনের দৃশ্যগুলিতে একই অভিনেতার কণ্ঠ মন্ত্রবলে যেরূপ সাধারণ কথাবার্তার ভংগিতে পরিণত হয়,—উহাও পূর্ববর্তী যুগের অভিনেতৃদের ধারণার অগোচর ছিল। বস্তুত শিশিরকুমারের ঐ স্বরভংগি, মহাকাব্যের মহাকবিগণের কল্পনা-দৃষ্টির মত স্বর্গ হইতে মর্তে, মর্ত হইতে স্বর্গে অবাধে বিচরণ করিয়াছে এবং ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে উভয়কে এক করিয়া দিয়াছে।

"ঐ দুই স্বরভংগিরই দুই বিভিন্ন প্রকাশ দেখি পরবর্তীকালের আর দুইটি নাটকাভিনয়ে—'সীতা'য় আর 'নর-নারায়ণ'-এ। 'রাম' ভূমিকার আবৃত্তি এবং 'কর্ণ' ভূমিকার আবৃত্তি শিশির স্বরভংগির দুই কোটি। 'রামে' সুরেলা ভংগির চরম, 'কর্ণে' কাব্য ছন্দেও সুরবর্জিত সাধারণ গদ্যালাপের চূড়ান্ত। সুর সংযোগ না করিয়াও যে কবিতা আবৃত্তি চলিতে পারে, 'কর্ণের' আবৃত্তি যিনি কর্ণে না শুনিয়াছেন তাঁহাকে উহা বোঝান যাইবে না। আবার অতি নিরস

কাব্যহীন গদ্যের মধ্যেও যে কতখানি সরস সুর মিশ্রণ চলিতে পারে, 'দিগ্বিজয়ী'র 'নাদিরশা'র অভিনয়ে তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

"শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁহার মত কাব্যরসবোধ গিরিশযুগীয় অভিনেতৃদের মধ্যে ছিল না, এবং শিশির যুগের অন্যান্য বড় অভিনেতাদের মধ্যেও নাই। এই কারণেই অন্য কাহারও পক্ষে কাব্যপ্রধান রবীন্দ্র নাটকের চরিত্রাভিনয় সম্ভবপর হয় নাই। এ বিষয়ে তাঁহার সহজাত অপূর্ব কণ্ঠস্বর যেরূপ সহায় হইয়াছে, তেমনই একই সঙ্গে তাঁহার রসজ্ঞ চিত্তের শব্দ-ধ্বনি-ভাব-বিশ্লেষণী এক এবং অদ্বিতীয় শক্তি ও আবৃত্তির প্রধান আশ্রয়স্থল হইয়াছে। 'বিসর্জন' 'তপতী'র অভিনয় আর কোন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সম্ভবপর হয় নাই। আবার সূক্ষ্মতম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের শক্তিও শিশিরযুগে আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। এবং সেই কারণেই শরৎ নাটকের জটিল চরিত্রগুলি অপর যে কেহ অভিনয় করিতে গিয়াছেন তিনিই অকৃতকার্য হইয়াছেন। শিশিরকুমারের নটজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'জীবানন্দ' চরিত্রাভিনয় অপর যে কোন অভিনেতার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। নীলাম্বর, রাসবিহারী চরিত্রাভিনয় সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। অহীন্দ্র চৌধুরীর মত একজন শক্তিমান নটও 'রমা'র 'রমেশ' চরিত্র অভিনয় করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। অথচ শিশিরকুমারের রসজ্ঞ স্পর্শে সেই 'রমেশ'ই দর্শকচিত্তকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল।

"উপরি উক্ত স্বরভংগির বিপ্লব শিশির নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে একটা বড় কথা বটে, কিন্তু শেষ কথা নয়। তাঁহার শক্তির চরম প্রকাশ ঘটিয়াছে অভিনীত চরিত্রের বিশ্লেষণে। রূপসজ্জা, আবৃত্তি এবং অঙ্গভংগিকে অতিক্রম করিয়াও অভিনেতৃর অভিনয়ের মধ্যে অভিনেয় চরিত্র সম্পর্কে এমন একটা ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতে পারে যাহাতে ঐ অভিনেতা চরিত্রটিকে কীভাবে বিচার করিয়াছেন তাহা বেশ স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত হয়; আর অভিনেতৃর এইরূপ অভিনয়ই অভিনয়কলার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

"এখানে 'চরিত্র বিশ্লেষণ' কথাটির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ আবশ্যক। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, নাট্যকারই তো চরিত্রকে সংলাপ এবং কার্যের ভিতর দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া থাকেন। উহার উপর অভিনেতৃ আবার কী বিশ্লেষণ করিবেন? তাঁহার কর্তব্য তো অভিনেয় চরিত্রের সংলাপ যথাযথরূপে আবৃত্তি করা এবং অনুরূপ অঙ্গভংগির দ্বারা সেই আবৃত্তিকে অধিকতর পরিস্ফুট প্রত্যক্ষ

করিয়া তোলা। কথাটা সাধারণ অভিনেতার পক্ষে সত্য বটে। যে দৃশ্যে নাটকীয় চরিত্রের মুখে যেরূপ সংলাপ থাকে, অভিনয়কালে তাঁহারা সেই দৃশ্যে সেইরূপ আবৃত্তি করিয়া থাকেন। দৃশ্যভেদে উহা কখনও করুণ, কখনও বীররসাশ্রিত, কখনও আনন্দরসনিষিক্ত—এইরূপ বিভিন্ন রসাশ্রিত হইয়া থাকে। অঙ্গভংগির বেলাতেও কখনও তিনি বক্ষে করাঘাত করেন, কখনও হস্তমুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করেন, কখনও হাসির বেগে ভাঙিয়া পড়েন, আবার নিরাশায় দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করেন। তাঁহারা চরিত্রটি খণ্ড খণ্ড রূপে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু উহার সামগ্রিক রূপের ধারণা করিতে পারেন না, না হয় করেন না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতা সমালোচক যেমন কবির কোন কবিতাকে, তিনি কীভাবে অনুভব করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে পারেন, শ্রেষ্ঠ অভিনেতাও তেমনই নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রকে একটি বিশেষ ভংগি সহকারে অনুভব করিয়া সেই অনুভূতিকেই অভিনয়ের মাধ্যমে পদে পদে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই অর্থে সমালোচকও যেমন দ্বিতীয় স্রষ্টা, অভিনেতৃও তেমনই একজন স্রষ্টা। তিনি নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রকে নিজের অনুভূতি, বিশ্লেষণ এবং শক্তির বলে নূতন করিয়া সৃষ্টি করেন। আগেকার কথা ঠিক বলিতে পারি না, তবে গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একমাত্র শিশিরকুমার ব্যতীত চরিত্র-বিশ্লেষণী অভিনয় আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। এক্ষেত্রে শিশিরকুমার একক ; এবং এইহেতু গত এক চতুর্থ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এমন কোন অভিনেতৃর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না যাঁহাকে শিশিরকুমারের সমশ্রেণী বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারি। এই হিসাবে শিশিরকুমার স্রষ্টা, এবং সাধারণ খ্যাতিমান অভিনেতারাও স্রষ্টা নহেন—মঞ্চজগতের সৃষ্টি।"

স্বর্গত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেনঃ "মদন থিয়েটার কোম্পানীর বেঙ্গলী থিয়েটারে যখন তিনি অবতীর্ণ হলেন, তখন সারা বাংলা দেশে সাড়া পড়ে গেল। কত লোক প্রেরণা পেলে, কতলোক বললে, গুণী একটা লোক উচ্ছন্নে গেল। কিন্তু অভিনয় দেখবার জন্য প্রেক্ষাগার ভর্তি করে দিতে লাগল। সে উনিশ শ' একুশ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দেশবন্ধু উদ্বোধন করবেন, কথা ছিল। কিন্তু ইংরেজ সরকার সেই শুভদিনটির আগেই তাঁকে জেলে পুরে ফেলেছিলেন। উদ্বোধন তিনি করতে পারলেন না, কিন্তু যে আশীর্বাদ করলেন, তাই শিশিরকুমারকে জয়শ্রী দান করল। আলমগীর আর শিশিরকুমার যেন অভিন্ন হয়ে গেলেন।"

পনেরো

প্রাক্-শিশির যুগের সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সমাজের যোগাযোগ ছিল না। রঙ্গালয়ের শিল্পিক ও নৈতিক আবহাওয়া এমনই কুরুচিপূর্ণ ছিল যে রুচিবান্ ও শিক্ষিত সমাজ এর প্রতি অশ্রদ্ধাই পোষণ করতেন। নটেরও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। স্বয়ং শিশিরকুমার উত্তরকালে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"থিয়েটারের নট একটা সম্মানের পদবী নয়। এখনও আমাদের দেশে নট ও নাট্যের আদর হয় নি। যাত্রার বেলায় যেমন, থিয়েটারের বেলায়ও তেমনি স্বত্বাধিকারীর সম্মান আছে পয়সার সম্মানে—কিন্তু সাধারণ নাট্যব্যবসায়ীর খাতির নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে নটের ব্যবসা অবলম্বন করতে কারও মন চায় না। নট নটী একটা আলাদা জাত, কিন্তু উঁচু জাত নয়।" শিশিরকুমারের আগে গিরিশচন্দ্রও আক্ষেপ করে লিখেছিলেন ঃ

"লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা জন।"

কিন্তু তবুও গিরিশচন্দ্র অকুতোভয়ে বলেছিলেন ঃ

"তিরস্কার পুরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার
তথাপি ও পথে পদ ক'রেছি অর্পণ।
রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।"

অধ্যাপক শিশিরকুমারও রঙ্গালয়কে নূতন রূপ দেবার আশার নেশায় 'তিরস্কার'কে 'পুরস্কার' আর 'কলঙ্ক'কে 'কণ্ঠের হার' মনে করে গিরিশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে পদার্পণ করে রঙ্গালয়ের শিল্পিক ও নৈতিক অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটালেন; এই প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র মন্তব্যটি উদ্ধৃতিযোগ্য। সেটি এই—

"বাংলার নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন মাত্রই জন্মিয়াছিলেন এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমারেরও আর দ্বিতীয় হয় নাই।...শিশিরকুমার একাই একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে নাট্যাভিনয় বৃত্তিটিকে সামাজিক মর্যাদা দান। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী নট অমৃতলাল বসু মহাশয়ও সকৃতজ্ঞচিত্তে শিশিরকুমারকে

ইহার জন্য সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। বাংলা দেশের (প্রধানতঃ রাজধানীর) সাধারণ রঙ্গালয়ের কার্যকলাপের সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তাঁহারাই উপলব্ধি করিবেন, শিশিরকুমারের আগমনের পূর্বে রঙ্গালয়ের শিল্পিক ও নৈতিক অবস্থা কি ছিল এবং পরেই বা কী হইয়াছে। হুঁকাটি যদিও অব্যাহত আছে, খোল-নলচে দুইই আপাদমস্তক বদলাইয়া গিয়াছে। মঞ্চের উপর অভিনয়ের রীতি ও প্রকৃতি যেমন পরিবর্তিত হইয়াছে, প্রেক্ষাগৃহের দর্শকেরাও আর সে দর্শক নাই। সেই বেলফুল জুঁইফুলের গোড়েমালা ছোঁড়াছুড়ি, সেই কেয়াবাৎ, একছেলেন্ট, বুকে পাড়া দিয়ে গেল, মেরে ফ্যাল মাইরি, ছেলেটাকে মাই দাও গো—প্রভৃতি স্তুতিবাদ হল্লার বেলেল্লাগিরি প্রায় অন্তর্ধান হইয়াছে। একমাত্র শিশিরকুমারের কল্যাণে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের শ্রেণীবদল হইয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়ার-মার্লো-জন্‌সন্-কনগ্রিভ-গোল্ডস্মিথ অভিজ্ঞ অধ্যাপক-অভিনেতার আকর্ষণ এমনই প্রবল হইয়াছিল যে, প্রেক্ষাগৃহের পাত্র ও পরিবেশ রাতারাতি পরিবর্তিত হইল। শিশিরকুমার অঘটন ঘটাইলেন।"...

শিশিরকুমারের দুঃসাহসে অনুপ্রাণিত হয়েই এগিয়ে এলেন আরও কয়েকজন তরুণ ও শিক্ষিত নাট্যশিল্পী। ওকালতি ছেড়ে এগিয়ে এলেন ইনষ্টিটিউটের নরেশচন্দ্র মিত্র। সিমলা সেক্রেটারিয়েটের চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। নির্মলেন্দু লাহিড়ী স্বীকার করে গেছেন—"শিশিরবাবু আগে না এলে পাবলিক থিয়েটারে যোগ দেবার সাহস আমাদের হত না।"

ষোল

শিশিরকুমারের আবির্ভাবে অন্য থিয়েটারের মালিকরা বিশেষতঃ মিনার্ভা থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার উপেন্দ্রকুমার মিত্র বুঝলেন যে থিয়েটারে নতুন প্রাণের জোয়ার আসছে, পুরোন চালে আর থিয়েটার চালান সম্ভব হবে না। শিশিরকুমার তাঁদের বাজার মাটি করে দিয়েছেন। সাবেকী রাস্তা ছেড়ে উপেন্দ্রকুমারও শিশিরকুমারের মত শিক্ষিত নতুন অভিনেতা নিয়ে দল গড়তে চাইলেন। উদ্দেশ্য শিশিরকুমারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া। উপেন্দ্রকুমার নরেশচন্দ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে মিনার্ভায় নিয়ে

এলেন। এঁদের নিয়ে মিনার্ভায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক খুললেন। চাণক্য ও এ্যান্টিগোন্‌সের ভূমিকায় যথাক্রমে নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দ অবতীর্ণ হলেন। এ্যান্টিগোন্‌সের ভূমিকায় অভিনয় করে রাধিকানন্দ প্রথম অভিনয় রজনীতেই বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। 'নাট্যগগনে যে একটি নতুন তারকার সন্ধান পাওয়া গেল, সে সম্বন্ধে আর কারুর কোন সন্দেহ রইল না।'

এদিকে রব উঠেছে শিশিরকুমার পণ্ডিত হতে পারেন, ভাল অভিনয়ও করতে পারেন কিন্তু তাঁর গলায় তেমন জোর নেই। তখন শিশিরকুমার বললেন, "গলা দেখাতে হলে রঘুবীর অভিনয় করতে হয়। ইনস্টিটিউটে করেছিলুম --তাতে গলা যা বার করব 'রঘুয়া-রঘুয়া' বলে ··মানুষ চমকে উঠবে।" ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নাটক ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন। তখন ও বই জমে নি।

ম্যাডানে 'রঘুবীর' নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য প্রস্তুতি চলতে লাগল। এই সময়ে ওল্ডক্লাবের একটি রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন বিখ্যাত গায়ক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'হাসির অন্তরালে' পুস্তকে। নলিনীকান্ত লিখেছেন ঃ "একটি রাত্রির কথা। শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রঘুবীর' নাটকখানি কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে মঞ্চস্থ করবার উদ্যোগ-আয়োজন করছেন। রিহার্সাল চলছে। সে-সময়ে শিশিরকুমারের ধ্যান-জ্ঞান একমাত্র 'রঘুবীর'। এই 'রঘুবীর' নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বেশি দিন চলে নি, কিন্তু শিশিরকুমার এই অচল নাটকখানিকেই সচল করবার জন্য নির্বাচিত করেছেন। এই নাটকের মধ্যে নাটকীয় রসবৈচিত্র্যের যে কাব্যমাধুর্য অভিসিঞ্চিত হয়ে আছে—তার বিশ্লেষণ করতেন ক্লাবের বন্ধুদের কাছে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই অভিনয়-প্রসঙ্গ চলত। সদস্যেরা ক্রমে ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু শিশিরকুমারের চোখে ঘুম নেই। বোধ হয় রাত্রি দুটো কি তিনটে। গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছি। শিশিরকুমার ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে নাম ধরে ডাকলেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। বললাম—ব্যাপার কি? একটা বিশেষ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান শিশিরকুমার বললেন—ঐ কোণটিতে একটু দাঁড়ান তো। আপনাকে জাফর হতে হবে। —জাফর? —হ্যাঁ, রঘুবীরের সঙ্গে জাফরের সাক্ষাতের সেই সীনটা···দাঁড়ান না ঐখানে, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

একটা প্যাঁচ মাথায় এসেছে। অগত্যা দাঁড়াতেই হল। আর তিনি একই কথা বারবার বিভিন্ন ধারায় উচ্চারণ করে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ভাবের ব্যঞ্জনায় রঘুবীরের ভূমিকাটি রূপায়িত করতে লাগলেন।"

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ম্যাডান থিয়েটারে 'রঘুবীর' মঞ্চস্থ হল। শিশিরকুমার 'রঘুবীর'-এর ভূমিকায় নামলেন। 'এ-অভিনয় দেখে গ্যালারিও মেতে উঠল—হ্যাঁ, শিশির ভাদুড়ীর গলা আছে।' এই অভিনয়-প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন : "রাত্রে রঘুবীর খোলা হবে—সেদিন মহাত্মা গান্ধি হলেন এ্যারেস্ট। এ খবর কলকাতায় পৌঁছুবামাত্র সন্ধ্যার প্রাক্কালে দোকান পাট হল বন্ধ। যারা 'রঘুবীর'-এর পোশাক দেবে, তারা দিতে পারল না। অভিনয় বন্ধ দেওয়া হল না—উপায়? শিশিরকুমার, মণিলাল (গঙ্গোপাধ্যায়) এবং আমি—তিনজনে পরামর্শ করে স্থির হল খদ্দর পরে রঘুবীর নামবেন। খদ্দর কোথায় পাওয়া যায়? দোকান-পাট বন্ধ। হাতিবাগানের মোড়ে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারের প্রায় সামনে আমার জানা এক ভদ্রলোকের কাপড়ের দোকান ছিল। ভদ্রলোক থাকতেন শ্যামপুকুর লেনে। তাঁকে ধরে নিয়ে এলুম—প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বললুম। তিনি করলেন সাহায্য। দোকান খুলে চুপি চুপি খদ্দর এনে আমার হাতে দিলেন তাঁর গৃহে। সেই খদ্দর নিয়ে আমি এলুম 'কর্ণওয়ালিশে' এবং শিশিরকুমার সেই খদ্দর পরে নামলেন মঞ্চে রঘুবীরের ভূমিকায়।"

'রঘুবীর' অভিনয়ে যে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল এবং শিশিরকুমার যে বিপুল অভিনন্দন পেয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন : "ক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবীর নাটক নিয়ে শিশিরকুমার যখন পাদপ্রদীপের সম্মুখে দাঁড়ালেন—তখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, দৃপ্ত বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমা সমস্ত দর্শকদের চিত্রার্পিত করে প্রেক্ষাগৃহে রেখে দিলে। সারা নাট্যজগতে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হল—দলে দলে দর্শক আসতে লাগল শুধু শিশিরকুমারের রঘুবীর দেখতে। কণ্ঠস্বরের চাতুর্য, অপূর্ব আবৃত্তি-ভঙ্গিমা, দেহ-সৌষ্ঠব, ব্যক্তিত্ব সব কিছু মিলিয়ে একজন বিরাট প্রতিভাময় পুরুষকে দেখে সকলেই আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চ এবার সত্যই মহিমময় এক নাট্যপ্রতিভার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হল—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এক নতুন জীবনের ছোঁয়াচ লাগল।"

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী দিলীপকুমার রায় শিশিরকুমারের 'রঘুবীর' দেখে

তাঁর অভিনয়শিল্পের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

"রঘুবীর দেখতে গিয়ে শিশিরকুমারের অভিনয়দর্শনে দুচারটে কথা মনে হল—যা না লিখে পারলাম না। শিশিরকুমার যে একজন কত উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা তা যেন সেদিন আমি তাঁর রঘুবীরের অভিনয় দেখে আরও বেশী করে উপলব্ধি করেছিলাম।

"...শুধু শিল্পীর নয়, প্রতি মানুষেরই চলা-ফেরা, ভাব-চিন্তা, লিখন-প্রণালী, ধরণ-ধারণ, কথার ভঙ্গী, গলার স্বর, উচ্চারণের ঝোঁক—সবেরই একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের নামই Style ; এ Styleটা গড়ে উঠতে সময় লাগে। তবে সময়ের অতিপাতের সঙ্গে সঙ্গে যখন শেষে গড়ে ওঠে তখন সেটা স্থায়ীই হয়ে পড়ে। এটা খুবই জানা কথা। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই আচরণের যে একটা প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য থাকে, সেটা একমাত্র সেই মানুষেরই বৈশিষ্ট্য, সেটা একটু ভেবে দেখলে বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না। তবে গোল বাধে তখন, যখন অভিনয় বা সঙ্গীত কলার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি বেশী করে ফুটে ওঠে। বলা বাহুল্য কাব্য বা সাহিত্যের মধ্যেও বৈশিষ্ট্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে না উঠেই পারে না—তবে সঙ্গীত, অভিনয় বা বক্তৃতা রূপে আর্টের মধ্য দিয়ে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য, Styleটা আমাদের যেন একটু বেশী করেই চোখে পড়ে। কেন না এসব শিল্পের আবেদনের সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্বন্ধ বেশী Immediate ; তাই এই সব শিল্পের Style-এর যে আবেদন সেটা সাহিত্য, চিত্রকলার আবেদনের চেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ।

"এই কথাটি আমরা বিশেষ করে অভিনয়-শিল্পের Style-এর সমালোচনা করবার সময় প্রায়ই কম বেশী ভুলে যাই। অর্থাৎ কোনও কবি বা সাহিত্যিকের যে একটা বিশিষ্ট Style থাকতে বাধ্য, সেটা আমাদের ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না বলেই তা থেকে প্রমাণ হয় না যে এঁদের নিজের নিজের একটা বিশিষ্ট Style নেই। প্রত্যেক মানুষের, ওষ্ঠকম্পন, চক্ষুকুঞ্চন প্রভৃতি সবেরই যখন একটা Style না থেকেই পারে না, তখন লেখার বা অভিনয়ের ভঙ্গীর ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট Style গড়ে না ওঠাই তো অস্বাভাবিক। তাই যদি কোনও অভিনেতাকে বলা যায় যে তাঁর অভিনয়ের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, তাহলে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, যে লোকটা মিথ্যা কথা না বললেও অত্যন্ত জানা কথা এমনভাবে বলছে যেন সেটা দৈববাণী।

"সুতরাং যেটা আক্ষেপের বিষয় সেটা অভিনেতার বা বক্তার প্রকাশভঙ্গীর একটা Peculiar Style থাকা নয়—যেহেতু এটা ত না হয়েই পারে না—আক্ষেপের বিষয় হয় তখনই, যখন সব বিষয়েই তাঁর প্রকাশ ভঙ্গীটা বক্তব্য-বিষয়কে একই ভাবে পরিস্ফুট করে তোলার চেষ্টা করে। এখানেই সামান্য বা অসামান্য অভিনেতার মধ্যে তফাৎ। কে না জানে যে একজন সামান্য অভিনেতাও একটা ভূমিকা প্রায় সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে অভিনয় করতে পারেন—কিন্তু তারপর সবই একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়। এই একঘেয়ে হবার মনস্তত্ত্ব হচ্ছে এই যে, সামান্য অভিনেতার বলবার থাকে বড়ই কম। এ-কথা সব শিল্প সম্বন্ধেই খাটে। ম্যাথিউ আর্ণল্ড বলেছেন Gray যদিও দু'চারটি কবিতা ভাল লিখেছেন তাহলেও তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলা চলে না, এই জন্য যে, তাঁর বলবার বেশী ছিল না। কিন্তু Shelley এত বড়, কেন না God's Plenty তাঁর মধ্যে মহান গরিমায় বিরাজমান।

"শিশিরকুমারের সম্বন্ধেও সেদিন রঘুবীর অভিনয় দেখতে দেখতে আমার এই কথাটাই বিশেষ করে মনে হয়েছিল। অর্থাৎ God's Plenty তার মধ্যে বিরাজমান। ...কারণ শিশিরকুমার রঘুবীরের ভূমিকাভিনয়ে যে জিনিষটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেটা তাঁর রাম, আলমগীর, ইন্দ্র বা চাণক্য ভূমিকার অভিনয়ের প্রকাশভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি রঘুবীরের ভূমিকায় প্রথমে উদ্বেল দ্বন্দ্বকে শান্ত করবার চেষ্টার সময় যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন সেটাও যেমন কলাকারু সঙ্গত (artistic), শেষে প্রতিহিংসার বাধাবন্ধন ছেদনের অসংযমের প্রকাশের ভঙ্গীটিও তেমনি অশান্ত। যে শিল্পী, আলমগীর, রাম, চাণক্য, ও রঘুবীর এই চাররকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির ভূমিকা প্রায় সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে অভিনয় কর্তে পারেন, তাঁর Style-এর বিরুদ্ধে আর যাই বলা যাক না কেন একঘেয়েত্বের অভিযোগ দেওয়া চলে না।

"আমার মনে হয় শিশিরকুমার যে একজন কত বড় প্রতিভাশালী অভিনেতা তা আমাদের অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক গুণগ্রাহীই উপলব্ধি করেছেন, নইলে নানান কাগজে শিশিরকুমারের অভিনয়ের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হওয়াই অসম্ভব হত না কি? কারণ সেগুলি ত দোষদর্শী ও গুণগ্রাহী সমালোচনা নয়, নিছক গালিগালাজ মাত্র। এরূপ সমালোচকগণ একটা কথা প্রায়ই ভুলে যান যে প্রতিভার অসম্মান করার অর্থ: আত্মসম্মানের অস্বীকার করা। কারণ প্রতিভার সম্মান করেই মানুষ নিজের মধ্যে মহত্তম

উপাদানকে স্বীকার করে থাকে। 'Tell me what you advice and I will tell you all about yourself' কথাটির মধ্যে গভীর সত্য আছে। কারণ মানুষের অনুরাগ ও রুচি তার নিহিত প্রকৃতিকে বড় কম প্রকাশ করে না; তবে প্রকৃত মোহনীয় কিছুর বিকাশকে শ্রদ্ধা করাটা শিক্ষা ও দৃষ্টির প্রসারের উপর নির্ভর করে বলে সঙ্কীর্ণমনা স্বল্প পরিসর দৃষ্টি মানুষের পনের আনা চিন্তা সচরাচর আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থদ্বেষের গণ্ডীর উপরে উঠতে পারে না।

"তবে মহতের ও সুন্দরের প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার বিফলতা না হয়—একটা জাগতিক নিয়ম বলে মেনে নিয়ে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে যে, সব গভীর গুণের বিকাশই বিরল। কিন্তু তাই বলে সত্যিকার বড়কে নির্জলা মিথ্যার সাহায্যে ছোট প্রতিপন্ন করবার মতন হীন চেষ্টাকে কোন্ Philosophy দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় সেটাকে ঠাহর করা বোধ হয় একটু কঠিন। বাস্তবিক অনেক সময় মনে হয় যে, সত্যিকার আক্ষেপের বিষয় এ সংসারে যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে—মানুষের এই সব ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, যাকে আঁকড়ে ধরে ক্ষুদ্রচেতারা মহাউৎসাহে বিরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শরৎচন্দ্রের অভিনব সাহিত্যের গরিমা বা শিশিরকুমারের মৌলিক অভিনয় প্রতিভাকে অস্বীকার করা মানুষের মনোজগতের এই শ্রেণীর অসারতার দুটি দৃষ্টান্ত মাত্র। Carlyle তাঁর Hero worship বইখানিতে লিখেছেন যে 'Time makes the Man,' কথাটির মতন ভুল কথা জগতে অল্পই আছে, কারণ কত সময়ই না মানুষ শ্রেষ্ঠ জননায়ক, চিন্তাবীর, সমাজ সংস্কারক, কবি, শিল্পী ও যুগপ্রবর্তকের জন্য বিধাতার কাছে নিষ্ফল আবেদন করেছে এবং কত সময়ই না প্রার্থিত প্রতিভার অভাবে বড় বড় আন্দোলন ভূমিসাৎ করছে। তাই যখন অনেক দিন ধরে চাওয়ার ফলে শেষে বিধাতা একজন বড় শিল্পীর সৃষ্টি করেন তখন তাকে অপমান করবার মতন Tragedy আর কি আছে?"

'রঘুবীর'-রূপী পঁয়ষট্টি বৎসরের 'যুবক' শিশিরকুমারের আর একটি অদ্ভুত শক্তির কথা শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "...সেদিন যখন প্রচার-পত্রে দেখলুম শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'রঘুবীরের' নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তখন বিস্মিত না হয়ে পারি নি। ম্যাডানের কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে ত্রিশ-একত্রিশ বৎসর আগে রঘুবীররূপে তাঁকে দেখি,

তিনি তখন বলিষ্ঠ যুবক। এতকাল পরে ঐ ভূমিকায় আবার তিনি! কৌতূহলে প'ড়ে অভিনয় দেখতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছিলুম অধিকতর।

"পুরাতন নাটক হ'লেও রঘুবীরের মধ্যে সত্যিকার নাটকত্বের উপাদান আছে যথেষ্ট। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপরে সর্বপ্রথমে তাকে পাংক্তেয় করেছেন শিশিরকুমারই। রঘুবীর হচ্ছে একটি অদ্ভুত চরিত্র, আমাদের নাট্য-সাহিত্যে এ-রকম চরিত্র আর আছে ব'লে স্মরণ হচ্ছে না। জন্ম তার ডাকাতের ঘরে, দেহের মধ্যে আছে তার দুর্দান্ত ভীল রক্ত। কিন্তু সে লালিত পালিত হয়েছে ঋষিকল্প সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের কাছে। নিজের দেহে অসুরের মত শক্তি থাকলেও সে তা ব্যবহার করতে চাইত না, প্রাণপণে অহিংসা-ব্রতের মর্যাদা রক্ষা করে চলত। তারপর একদিন পিশাচের ভয়াবহ অত্যাচারে হ'ল কুম্ভকর্ণের মহাজাগরণ, খসে পড়ল সংযম ও সাত্ত্বিকতার খোলস, রঘুবীর ফিরে পেল তার বনবাসী, নির্মম ও দুর্দমনীয় ভীল প্রকৃতি।

"রঘুবীর চরিত্রের এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাব শিশিরকুমারের অভিনয়ে কি চমৎকারই ফুটে ওঠে! বহুকাল পূর্বেই এই ভূমিকার জন্যে তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে জয়মাল্য অর্জন করেছেন, কাজেই তা নিয়ে আর নূতন প্রশস্তি রচনা করবার দরকার নেই। কিন্তু আমি বলতে চাই অন্য কথা। রঘুবীরের ভূমিকা হচ্ছে যুবকের ভূমিকা এবং যুবক শিশিরকুমারকেই আগে দেখেছি ঐ ভূমিকায়। তারপর কেটে গিয়েছে সুদীর্ঘ ত্রিশ-একত্রিশ বৎসর এবং প্রাচীন শিশিরকুমার আবার দেখা দিলেন যুবক রঘুবীররূপে। কিন্তু আশ্চর্য এই, এতগুলো বৎসরের ভারেও তিনি একটুও নুয়ে পড়েন নি। কোন তরুণ নটও তাঁর রঘুবীরের তারুণ্যকে কিছুমাত্র ম্লান করতে পারবে না। তারপর নিজের দুর্দান্ত ভীল প্রকৃতি ফিরে পেয়ে রঘুবীরের সেই উৎকট উল্লাস ও প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য, পরিণত বয়সেও সুন্দর অঙ্গভঙ্গের দ্বারা শিশিরকুমার তার যে ছবি আঁকলেন, ভাষায় বর্ণনা করে তা বুঝানো যাবে না, তা চোখে দেখে প্রাণে উপলব্ধি করবার জিনিস। কলাবিদেরা যে নিজেদের ক্ষেত্রে এমনভাবে চিরযৌবনকে ধরে রাখতে পারেন, শিশিরকুমারের সেদিনকার অভিনয় দেখবার আগে সে বিশ্বাস আমার ছিল না।"

'রঘুবীর' চরিত্রের রূপায়ণ শিশিরকুমারের সৃষ্টি-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই ভূমিকাভিনয়ে শিশিরকুমারের অলৌকিক (superb) শিল্প-চাতুর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীমণি বাগচি লিখেছেন: "তিনি জন্ম-অভিনেতা—

অভিনয়কলা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ—সেই সঙ্গে শিক্ষা ও সাধনার সংযোগ ঘটায় তাঁর প্রতিভা রসের ক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে নিত্য নূতন সৃষ্টির লীলা দেখাতে পেরেছে। রঘুবীরে তিনি এই কথাটাই প্রমাণ করলেন যে, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-ব্যাপারটা যতখানি চিত্তবিনোদনের তার চেয়ে ঢের বেশি তা দর্শকদের মনকে রসের ও ভাবের শিল্পময় জগতে পৌঁছে দেবার জন্য। রঘুবীররূপী শিশির-কুমার প্রতি দৃশ্যে, প্রতি কথায়, প্রতি হাবভাবে, প্রতি বচনভঙ্গীতে মঞ্চে যে অপূর্ব মাধুর্যধারা সঞ্চারিত করতেন, তা লিখে বোঝাবার নয়। নর্মদার উদ্দেশে—'উত্তাল তরঙ্গময়ী ভাষণা নর্মদা' বলে রঘুবীররূপী শিশিরকুমার যে দীর্ঘ উক্তি করতেন, তাঁর সেই উদাত্ত স্বরলহরী দর্শকচিত্তকে সহজেই আপ্লুত করতো। অনন্তরাও-এর প্রতি, জাফরের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের দীর্ঘ উক্তিগুলি শুনে দর্শকগণ চকিত হয়ে উঠতেন। তাঁর যৌবনবয়সের রঘুবীর বৃদ্ধ বয়সেও ম্লান হয় নি। তাঁর অতুলনীয় আবৃত্তিশক্তি এই চরিত্রটির রূপায়ণে অনেকখানি সহায়তা করতো। ব্রাহ্মণ ও ভীলপ্রকৃতির অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনায় শ্যামলীর প্রতি উক্তিতে তিনি যে রসসৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা প্রত্যক্ষ-দর্শীদের মতে অনুপমেয়। আবার পরীবাণুর উদ্ধারকল্পে আগত শৃঙ্খলিত রঘুবীর যখন

শক্তি দাও দেব মহেশ্বর
শক্তি দাও শরীরে আমার—

প্রভৃতি বলতে বলতে লোহার শিকল ছিঁড়ে ফেলতেন, তখন প্রেক্ষাগৃহে প্রতিটি দর্শকের মনে যে রোমাঞ্চ জাগত, তা বাংলা থিয়েটারে বিরল। সেই পরীবাণু আত্মহত্যা করতে চাইলে, রঘুবীর-রূপী শিশিরকুমার যখন বলতেন—'সে কি? আমি তোমারে ছাড়িব?'—তখন তাঁর কণ্ঠস্বরের লীলায়িত ভঙ্গীতে যুগপৎ প্রকাশ পেত কারুণ্য, বাৎসল্য, দৃঢ়তা, ধর্মপ্রাণতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি বিবিধ ভাব। আবার পরক্ষণেই মানুষের ক্ষুদ্রশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, শ্যামলীকে রঘুবীর যখন হতাশব্যঞ্জক সুরে বলতেন ঃ

উর্ধ্বে আছে অনন্ত নীলিমাকাশ, পদতলে
অনন্ত ধরণী ; যেও বোন, সে সুন্দর গৃহমাঝে।
গৃহস্বামী যেথা ভগবান, অবলার মহাবলদাতা।

তখন দর্শকচিত্তে মমতার যে স্রোত উদ্বেলিত হয়ে উঠত, তা এক কথায় অনির্বচনীয়। পঞ্চম অঙ্কে যে দৃশ্যে রঘুবীরের ভীল-প্রকৃতি অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়লাভ

করে আত্মপ্রকাশ করত, সেই দৃশ্যে শিশিরকুমার যে অভিনয় করতেন, তা পৃথিবীর অভিনয়-ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। রঘুবীরকে চিনতে পেরে অনন্তরাও যখন বললেন—'এ কী মূর্তি ? রঘুবীর ! রঘুবীর !—নাটকের সেই চরম মুহূর্তে রঘুবীরের কণ্ঠে তখন শোনা যেত :

রঘুয়া ! রঘুয়া !
রঘুবীর নহি আর পিতা
মরে গেছে রঘুবীর।

তখন স্তব্ধ বক্ষে রুদ্ধশ্বাসে—নির্বাক নিস্পন্দ নিথর হয়ে দর্শকগণ উপলব্ধি করতেন নাটকের সমগ্র নাট্যরসকে শিশিরকুমার কোন্ height-এ পৌঁছে দিলেন। এ অভিনয়ের তুলনা নেই।

"এই শক্তিবলেই শিশির-প্রতিভা সেদিন অসাধ্যসাধন করেছিল—গিরিশ যুগের ধারাকে রাতারাতি ওলটপালট করে দিয়েছিল। সমগ্র শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি তাই সেদিন একটি মানুষের অভিনয়ের গুণে রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আর রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রাখালদাস প্রভৃতি মনীষীরা শিশিরকুমারের গুণগ্রাহী হয়েছিলেন। একেই বলে revolution—যুগান্তর।"

পঞ্চম অঙ্কে বিখ্যাত প্রান্তর-দৃশ্যে শিশিরকুমারের অবিস্মরণীয় অভিনয় সম্পর্কে প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্রের মন্তব্যটিও উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

"...রঘুবীরের রঘুয়াতে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্যে তাঁর যে অভিনয়, তার তুলনা করতে গেলে পৃথিবীর মহৎ শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে। যে ভঙ্গীটা সাধারণ দৃষ্টিতে হাস্যকর সেইটা কী করে বিরাট climax রচনা করতে পারে তা জানতে গেলে ঐ দৃশ্যের অভিনয় দেখা দরকার। আমি যখন দেখেছি, তখন তাঁর বয়স ছিল বাহান্ন বছর। ঐ বয়সী একজন ভদ্রলোক যদি দুই পায়ে মল পরে স্টেজের ওপর দুহাত উঁচু লাফাতে থাকেন তা হলে হাসি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্ত হাসি শুকিয়ে যাবে সেই অবিস্মরণীয় অভিনয় দেখলে। আমার মনে হয়েছিল যেন ঈগলের মতো ছোঁ মেরে তিনি আমার মনটাকে কোথায় কোন্ ঊর্ধ্বে যে নিয়ে গেছেন, যেখানে মহান মৃত্যুর সঙ্গে আমি মুখোমুখি, একা। সে উপলব্ধি আমি জীবনে ভুলবো না।"

'প্রান্তর'-দৃশ্যে শিশিরকুমারের অপরূপ অভিনয় দেখে সৌরীন্দ্রমোহন

মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "রঘুবীর ভীল দস্যু—অন্যায় অত্যাচার দেখে যেদিন তার মন হলো সচেতন—সেদিন সে উঠলো যেন নবজন্মে জেগে। অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে সে শাণিত ছোরা হাতে মার-মূর্তিতে জাগলো—নাটকে অত্যাচার সম্বন্ধে আভাসে বিদেশী-শাসকের অত্যাচার-পীড়নের ইঙ্গিত ছিল—ছোরা লুফতে লুফতে যে ভাবে শিশিরকুমার এ দৃশ্যে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেন, সে দৃশ্যে দর্শকরা উপলব্ধি করতেন এ শুধু রঘুয়ার জাগরণ নয়—আমাদেরো এমনি ভাবে জাগতে হবে। রঘুবীরের এ অভিনয় বাংলার মঞ্চে অবিস্মরণীয় কীর্তি।"

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ম্যাডান থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনীত হলো। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমার অভিনয় করলেন। কিন্তু ম্যাডানে অভিনয় করতে শিশিরকুমারের মন আর আনন্দে ভরে ওঠে না। ম্যাডানরা অভিনয় এবং প্রযোজনার ব্যাপারে শিশিরকুমারের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। এই কারণে ম্যাডানদের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হতে লাগল। শিশিরকুমারের মনে দারুণ অস্বস্তি। তিনি আক্ষেপ করে বলতেন—"অবাঙালী মালিক! 'আলমগীর' নাটকে রূপনগরের ভূঁইয়া রাজার বাড়ির দৃশ্য—গরীব রাজা…চাষবাস করেন…তাঁর প্রাসাদ হবে ভাঙাচোরা পাথরের বাড়ি…তেমনি দৃশ্য তৈরি করিয়েছিলুম—কোম্পানির মালিক বললেন—না। তা হবে না! পেণ্টার হুশেনবেগকে হুকুম দিলেন—'সব সোনে লাগাও'! ব্যস…জমকালো প্রাসাদ তৈরি হলো। একি সহ্য হয়। পরের চাকরিতে থেকে ‥বিশেষ অবাঙালীর চাকরিতে…নাটক বা নাট্যাভিনয়ের কোন উন্নতি করতে পারব না…নিজের free will না হলে কলাচর্চা হয় না। আমার উদ্দেশ্য টাকা রোজগার করা নয়…আমি চাই নতুন করে বাঙলা থিয়েটারকে গড়ে তুলতে। কাজেই নিজের থিয়েটার চাই।"

শিশিরকুমার ম্যাডান থিয়েটারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে।

অন্যান্য রঙ্গালয়ের মালিকেরা শিশিরকুমারকে গ্রহণ করবার জন্যে তাঁর দোরে ধর্না দিতেন, প্রচুর অর্থের লোভ দেখাতেন কিন্তু তিনি তাতে এতটুকু টলেন নি।

সতেরো

কিন্তু একটা কিছু না করলেও চলে না। শিশিরকুমার চলচ্চিত্রে যোগ দিলেন। তখন চলচ্চিত্র-শিল্প নির্বাক। দমদম রোডের উপর প্রশস্ত বাগান-বাড়িতে প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার বি. সি. ঘোষের ছোট ভাই বিনয় ঘোষ (কাকু) তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী সদ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিশিরকুমার এই কোম্পানীর নেতৃত্বভার নিয়ে ফিল্ম তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

ফিল্মে শিশিরকুমারের অবতরণ এই প্রথম নয়—এর পূর্বে ম্যাডান কোম্পানীর 'মোহিনী না একাদশী তত্ত্ব' নির্বাক ছায়াছবিতে নায়ক রাজা রুক্মাঙ্গদেবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। রাণীর ভূমিকায় নেমেছিলেন একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা মিস পেসেন্স কুপার এবং মোহিনীর ভূমিকায় এক ইতালীয়ান মহিলা মিস আলবার্টিনা। শিশিরকুমারের নির্বাক ছায়াছবিতে দ্বিতীয়বার অবতরণ ম্যাডান কোম্পানীর 'কমলে কামিনী'তে। এই চিত্র ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী 'এম্প্রেস' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে। শিশিরকুমার ধনপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন।

তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীতে নির্বাচিত হল শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্প। চিত্রনাট্য রচনা করলেন সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম-এ, বি-এল। শিশিরকুমার এ চিত্র পরিচালনা করলেন এবং নায়ক সত্যেন্দ্রর ভূমিকায় অভিনয় করলেন। 'আঁধারে আলো' চিত্রের ক্রেডিট-টাইটেলে 'তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী'র নাম পরিবর্তন করে Bengal National Film Co. নাম রাখা হয়েছিল।

The Bengal National Film Co.
presents the famous author
Sarat Chandra Chattejee's
well-known story
A N D H A R E   A L O
Or
The Power of Love
with the reputed artist
Sisir Kumar Bhaduri M.A.
in the leading role
Scenario by
Surendra Mohan Chowdhury M.A., B.L.
Love is Heaven
and Heaven is Love.

এই চিত্র মনোমোহন থিয়েটার-গৃহে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রদর্শিত হয় এবং এক সপ্তাহ কাল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটেও দেখানো হয়। এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় উত্তরকালে লিখেছেন : "...আজ বিভিন্ন চিত্র-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা শরৎচন্দ্রের গল্পের ভাণ্ডার আক্রমণ করে প্রায় খালি করে এনেছেন বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের সুযোগ করে দেন তিনিই (শিশিরকুমার)। এবং বাংলা চিত্রজগতে যাঁরা সর্বপ্রথমে গম্ভীর ও উচ্চতর শ্রেণীর নাট্যরসাশ্রিত অভিনয়-ভঙ্গীর সূত্রপাত করেন তাঁদের মধ্যে শিশিরকুমার ও নরেশচন্দ্র মিত্রের নামই সর্বাগ্রে মনে আসে। একালের অধিকাংশ চিত্রদর্শকই এই সত্যের সঙ্গে পরিচিত নন।"

'আঁধারে আলো' ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবার পরে শিশিরকুমার মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কিছুদিন গৃহে শয্যাগত রইলেন।

ছায়াছবি শিশিরকুমারের ভাল লাগল না। তিনি বললেন—"ছবির অভিনয়কে অভিনয় বলা চলে না...অভিনয়ের ফাঁকি—অভিনয়কে ব্যঙ্গ করা।" তিনি চিত্রজগৎ ত্যাগ করলেন। নাট্যজগত তখন তাঁকে টানছে। নিজস্ব নাট্য-মন্দির প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে শিশিরকুমার আচ্ছন্ন। বাংলার নাট্যমঞ্চকে নবরূপে গড়ে তুলবার জন্য তিনি আকুল, অধীর, চঞ্চল।

আঠারো

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ।

আগস্ট মাসে শিশিরকুমার ম্যাডানের কর্ণওয়ালিস থিয়েটার ছেড়ে চলে গেছেন। ম্যাডানে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটক খুললেন। এ নাটকের নাম ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনীত হল। নরেশ মিত্র সাজলেন চাণক্য আর রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এ্যাণ্টিগোনস্।

ঠিক ঐ দিনেই মনোমোহন থিয়েটারে নিশিকান্ত বসু রায়ের 'বঙ্গে-বর্গী' নাটক খোলা হল। বৃদ্ধ দানীবাবু ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

১৮ই জুন মিনার্ভায় ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা'

খোলা হল। প্যালারামের ভূমিকায় রাধিকানন্দ অপূর্ব অভিনয় করলেন। মিঃ জেকব সেজেছিলেন নরেশ মিত্র।

৩০শে সেপ্টেম্বর স্টারে খোলা হল অপরেশবাবুর 'সুদামা'।

১৮ই অক্টোবর মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ি পুড়ে গেল। উপেন্দ্রকুমার মিত্র দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রকুমারের ভাগিনেয় বিখ্যাত চিত্র ও নাট্য-পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন ঃ

"তিনি তিন বৎসর যাবৎ নূতন মঞ্চগৃহ নির্মাণের আশায় থাকিয়া মিনার্ভা সম্প্রদায়টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার অমানুষিক চেষ্টায় বিব্রত হইতেছিলেন। আমি মামাবাবুর মত এমন ধৈর্যশীল থিয়েটার প্রোপ্রাইটার দেখি নাই।"

২রা ডিসেম্বর ম্যাডান থিয়েটারে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তার মুক্তি' আর ২২শে ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রত্নেশ্বরের মন্দির' অভিনীত হল। শেষোক্ত নাটকটিতে নির্মলেন্দু লাহিড়ী 'রত্নেশ্বর' এবং শ্রীমতী প্রভা 'সরমা' সাজলেন। এরপর ম্যাডান কোম্পানী কর্নওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে বাংলা থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ করে দেন। তাঁরা বাংলা অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পিছনে হ্যারিসন রোডের উপর এ্যালফ্রেড থিয়েটারে (এখনকার গ্রেস সিনেমা)। গুণ্ডামি ও জুলুমবাজির জন্য তখন ও পাড়া কুবিখ্যাত ছিল—সেইজন্যে ও পাড়ায় বাঙালী দর্শকরা অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে থিয়েটার দেখতে যেতে চাইতেন না।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ।

১০ই মার্চ এ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে ম্যাডানের বেঙ্গলী থিয়েট্রিকাল কোম্পানী আত্মপ্রকাশ করল, ক্ষীরোদপ্রসাদের লেখা নতুন নাটক 'বিদূরথ' নিয়ে। 'বিদূরথ'-এর ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী এবং 'অম্বালিকা'র ভূমিকায় কুসুমকুমারী অবতীর্ণ হলেন। এরপর ম্যাডানরা বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী বন্ধ করে দিলেন। খালি হল এ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চ।

এদিকে স্টারের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ছে। অপরেশচন্দ্র বহু চেষ্টা করেও স্টার আর চালাতে পারছেন না—ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তখন কজন কৃতবিদ্য ধনী 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানী স্থাপন করে স্টারের পরিচালনা ভার গ্রহণ করলেন। অপরেশচন্দ্র রইলেন নাট্যকার, নাট্যাচার্য এবং ম্যানেজার হিসেবে। বাংলা থিয়েটার জগতের 'বিসমার্ক' নামে যিনি পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছিলেন সেই প্রবোধচন্দ্র গুহ

এই কোম্পানীর সেক্রেটারী হলেন। প্রবোধচন্দ্র পোস্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফস্ বিভাগে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। তিনি সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাংলা থিয়েটার জগতে প্রবেশ করলেন। কোম্পানীর ডাইরেকটর বোর্ডে রইলেন সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, এ্যাটর্নি সতীশচন্দ্র সেন, আহেরীটোলার কুমারকৃষ্ণ মিত্র এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছু দিন পরে ভূপেনবাবু চলে যাওয়ায় গদাই মল্লিক তাঁর জায়গায় এলেন। অপরেশবাবু ষ্টার থিয়েটারের স্বত্ব আর আসবাবপত্র এই কোম্পানীর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকায় (পঁচিশ হাজার নগদ এবং পঁচিশ হাজার শেয়ারে) বিক্রী করে দিলেন।

ষ্টার থিয়েটারের বাড়ির বাহ্যিক সংস্কার করা হল। মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহও সুসংস্কৃত করা হল। হলের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে গাঁথা হল একটা নতুন দরজা। গ্যালারির বেঞ্চি উঠিয়ে দিয়ে ফোল্ডিং চেয়ারের বন্দোবস্ত করা হল। প্রেক্ষাগৃহে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার প্রচুর ব্যবস্থা করা হল।

ঠিক হল অপরেশচন্দ্রের নতুন নাটক 'কর্ণার্জুন' দিয়েই আর্ট থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হবে।

এই নতুন নাটকের জন্য আর্ট থিয়েটার নতুন নতুন শিল্পীদের আহ্বান করলেন।

মিনার্ভা ছেড়ে চলে এলেন নরেশচন্দ্র। একে একে যোগদান করলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায় ও তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। রাধিকানন্দ ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী পরে যোগ দিলেন। শিশিরকুমারকেও আহ্বান জানান হয়েছিল কিন্তু মতদ্বৈধতার জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি আসেন নি। বিধাতার অভিপ্রায়ও তা ছিল না।

৩০শে জুন

'কর্নার্জুন' নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনী।

ভূমিকালিপি ঃ—কর্ণ—তিনকড়ি চক্রবর্তী, অর্জুন—অহীন্দ্র চৌধুরী, শকুনি—নরেশচন্দ্র মিত্র, পরশুরাম—অপরেশচন্দ্র, কৃষ্ণ—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভীম—ননীগোপাল মল্লিক, দুঃশাসন—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীষ্ম—সন্তোষ দাস, দ্রোণ—কালীপ্রসন্ন পাইন, দুর্যোধন—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, যুধিষ্ঠির—হেমেন্দ্র রায়চৌধুরী, বিকর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তী—মনোরমা, পদ্মাবতী—কৃষ্ণভামিনী, দ্রৌপদী—নিভাননী, নিয়তি—নীহারবালা।

উদ্বোধন-রজনীতে শিশিরকুমার বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

'কর্ণার্জুন' বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করল। একাদিক্রমে তিনশত রজনী ধরে এই নাটকের অভিনয় হয়েছিল। বাঙলা রঙ্গমঞ্চে পুনরায় খানিকটা প্রাণের সঞ্চার হল। 'কর্ণার্জুন' নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল নরেশচন্দ্র মিত্রের 'শকুনি' চরিত্রে অনন্যসাধারণ অভিনয়।

১৮ই আগষ্ট মনোমোহন থিয়েটারে সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলেকজাণ্ডার' অভিনীত হল। দানীবাবু আলেকজাণ্ডারের ভূমিকায় নামলেন। 'আলেকজাণ্ডার' দর্শকের মনোমত হল না। দানীবাবুর যশ ক্ষুণ্ণ হল। অর্থাগমও বিশেষ হল না। সংবাদপত্রে দানীবাবুকে উপহাস করে সমালোচনা করা হল।

'কর্ণার্জুন'-এর পর আর্ট থিয়েটার নতুন নতুন নাটক পর পর নামিয়ে যেতে লাগলেন। আর্ট থিয়েটার উঠে পড়ে লেগেছেন দর্শকদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে। এর কারণ সম্বন্ধে প্রখ্যাত অভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন ঃ "কিন্তু কেন এত সাজসজ্জা? এ কি শুধু নাটক জনপ্রিয় করে তোলার জন্য? আমার মনে হয় তা নয়। এ এক সংগ্রামের প্রস্তুতি। বাঙলা দেশে এবং ভারতবর্ষে একদিন যে নাট্য-আন্দোলনের সংগ্রাম শুরু হবে, তারই প্রস্তুতি চলছিল একজনের অশুরে অন্তরে। তিনি একক। তাঁর না আছে ষ্টার থিয়েটারের মত জঁাকজমকপূর্ণ অভিনয়মঞ্চ, না আছে বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন তারকামণ্ডলী। তবু তিনি নতুন অভিনয়ধারা বয়ে আনছেন বাংলার মাটিতে। সে-গুঞ্জন ষ্টার-কর্তৃপক্ষের কানে গিয়েছিল, আর তারই বিপক্ষে দাঁড়াবার জন্যই এইসব নাটকের সমাবেশ। সেই একক নাটক সৃষ্টিকারী প্রতিভাবান্ পুরুষ শিশিরকুমার ভাদুড়ী।"

২৫শে আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ 'ফার্ষ্ট এম্পায়ার'-এ 'বিসর্জন' অভিনয় করলেন। বাষট্টি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিলেন।

অন্যান্য ভূমিকালিপি ঃ—রঘুপতি—দীনেন্দ্রনাথ, গোবিন্দমাণিক্য—রথীন্দ্রনাথ, নক্ষত্ররায়— তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, নয়ন রায়—ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়, চাঁদ পাল—অশোক চট্টোপাধ্যায়, রাণী গুণবতী—সংজ্ঞা দেবী. অপর্ণা রাণু অধিকারী (লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়)।

এই নাট্যানুষ্ঠানে রসরাজ অমৃতলাল বসু ও শিশিরকুমার দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

এই অভিনয় সম্বন্ধে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার (২৬শে আগষ্ট, ১৯২৩) মন্তব্য :—

"The house was packed to its utmost capacity and the audience which included the peak of the society saw the play through with great interest. Rabindranath's appearance in the role of Joysingh was the special feature of the attraction of the evening. The amount of pathos, human element and originality which the poet imparted into the acting was really a treat and could have hardly been surpassed in its excellence..."

রসরাজ অমৃতলাল বসু ইংরেজীতে একটি সমালোচনা লিখেছিলেন, এই অভিনয় সম্পর্কে। সমালোচনাটি 'Visarjan—an appreciation' শিরোনামে তদানীন্তন 'Indian Daily News' পত্রিকায় (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২৩) প্রকাশিত হয়। সেই সমালোচনাটির কিয়দংশ :—

"...So when one heard that cast included amateurs, mostly members of that house, one anticipated a real treat. But as the play progressed I felt that, I, an old stage horse, was receiving object lessons in the art of acting.

"The style of acting changes every twenty years, if not sooner, and Kemble's Hamlet on the Irving stage would be out of date to-day. So, Irving and Matheson Long likewise would be two perfect yet different Hamlets. So here also the Tagore 'troupe' were up-to-date.

"Few actors know how to make their entrances and exits. Babu Dinendra Nath Tagore, as the high priest of the Holy Mother's Temple, entered and, before he uttered a single word, we knew that the genius of an actor was in him. He looked the haughty Brahmin, proud of his 'paita', conscious of his authority, intriguing, designing, yet never losing his native dignity, no convention, no mannerism, no stiffness.

"Next comes the little lady in the character of Aparna, the beggar girl As everthing on the stage must be counterfeit, a real Ranee was chosen to represent a beggar, the duckling glides in and out of the stage as if the boards were play-pond ; native in speech, artless in manners, how sweetly she laid her virgin cheek on the stepstone to caress her pet, her stolen and slain kid, the aching heart murmuring soft words soaked in tears.

"After the officers have preceded comes the General. The Rabindranath. Born Great, he has achieved greatness, and greatness courts him too. The great poet is a great actor, almost a master of the techniqne of stage craft. But, young aspirators to histrionic fame, beware of the great master ! As in poetry one must drink at the fountain of Rabindranath's mind and not simply borrow his words, so on the stage, one should imbibe the spirit of his acting and not imitate him in action, attitude, gesture or pose. They are all his own, and the copyright is not to be infringed.

"In endowing Rabi Babu with a great mind, Providence seems to have prepared a special mould to cast the golden casket in which that mind was to find its home. There is, in the masculine frame of Rabindranath, such a judicious admixture of the feminine, that the product almost approaches the Devine. He sighs, murmurs, wails, kneels, clasps his hands, draws out his long vowels ; and we feel that the woman peeps out without making effeminate the poetry of his presentation..."

উনিশ

'কর্ণার্জুন' যখন সগৌরবে চলছে শিশিরকুমার তখনো পথে। কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পূজোর পর ভাগ্যের দক্ষিণমুখ তিনি দেখতে পেলেন।

সেবার বড়দিনে সরকারী ব্যবস্থায় ইডেন গার্ডেনে বিরাট এক একজিবিশন হয়। একজিবিশন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কিরণচন্দ্র দে, আই-সি-এস। একজিবিশনে খেলাধূলা, নানারকম আমোদ-প্রমোদ এবং নাট্যাভিনয়েরও ব্যবস্থা হলো। দে সাহেব শিশিরকুমারকে সসম্মানে আহ্বান ক'রে তাঁর উপর নাট্যাভিনয়ের ভার অর্পণ করলেন। সে-ভার গ্রহণ ক'রে শিশিরকুমার স্থির করলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করবেন। দে সাহেব এ অভিনয়ের জন্য শিশিরকুমারের সঙ্গে চুক্তি করলেন এবং চুক্তির সময়ে আগাম কিছু টাকাও দিলেন।

শিশিরকুমার নিজের সম্প্রদায় গড়ে তুললেন। ওল্ড ক্লাবের কয়েকজন সদস্য তাঁর সম্প্রদায়ে যোগদান করলেন। এঁরা হলেন—শিশিরকুমারের দুই সহোদর বিশ্বনাথ ও তারাকুমার, ললিতমোহন লাহিড়ী ও রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। যোগদান করলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায় ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই নূতন। গোড়ার দিকে নির্মলেন্দু লাহিড়ীও সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে শম্বুকের ভূমিকায় নির্বাচিত করা হয়েছিল। দু'একদিন মহলাও দিয়েছিলেন কিন্তু পারিবারিক অসুবিধার জন্য তিনি আর আসেন নি। সাধারণ রঙ্গালয় থেকে অভিনেত্রী নেওয়া হল। এঁরা হলেন স্বর্গতা প্রভা দেবী, স্বর্গতা মালিনী, স্বর্গতা নীরদাসুন্দরী ও শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)। 'শ্যামবাজারে পাঁচমাথার মস্তবাড়ীর তিনতলার বড় হলঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে খোলা হল রিহার্শালরুম···এবং অচিরে সীতা নাটকখানিকে কেটে-ছেঁটে 'এডিট' করে তাকে করা হল crisp, compact এবং সম্পূর্ণ অভিনয়ের যোগ্য।'

ইডেন গার্ডেনে ক্ষণস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গঠিত হল।

বিজ্ঞাপনে বলা হল : "ক্ষণস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের জন্য গঠিত হইলেও এই অভিনয় ক্ষণভঙ্গুর হইবে না—ইহার স্মৃতি যাহাতে বহুদিন পর্যন্ত দর্শকদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে তাহার সমস্ত আয়োজন আছে—কোথাও কার্পণ্য নাই।"

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, "প্রদর্শনী ফেলে লোকে ছুটতে শুরু করল শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখতে।"

এই নাটকের প্রযোজনা ও অভিনয়ের অসামান্য সাফল্যের বিবরণ দিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "এই 'সীতা' নাটকের অভিনয়ে তিনি নামলেন রামের ভূমিকায়...তাঁর সহোদর তারাকুমার লক্ষ্মণ...বিশ্বনাথ ভরত...জীবন গাঙ্গুলি লব...আর রবি রায় কুশের ভূমিকায়। অভিনয় হলো ইডেন গার্ডেনে বাঁধা রঙ্গমঞ্চে...১৯২৩ সালে বড়দিনে ছুটির হপ্তায়। সে-অভিনয় দেখে সকলে বিমুগ্ধ হলেন...শিশিরকুমারের প্রতিভার পায়ে সকলে জানালেন নতি। সকলে বুঝলেন, বাঙলার নাট্যগগনে যে-সূর্য্যের উদয় সকলে প্রার্থনা করছিলেন সে-সূর্য্য এই শিশিরকুমার। 'আলমগীরে' সাধারণে শিশিরকুমারের যে-পরিচয় পেয়েছিলেন, সে-পরিচয় আরো গভীর হল...আরো আশা-আনন্দে পরিপূর্ণ হল...শুধু রামের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে নয়, তাঁর অসাধারণ প্রয়োগনৈপুণ্য দেখে। বাঙলা রঙ্গালয়ের আবহাওয়া বদলে গেল 'সীতা'র অভিনয়ে।

"'সীতা'র প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সকলে লক্ষ্য করেছিলেন, অ্যামেচারী-বাঁধা ছোট স্টেজে রাজসভা, বনানী প্রভৃতির দৃশ্যপটে যেমন স্বাভাবিক সঙ্গতি... তেমনি বিশিষ্ট রকমের চমৎকারিতা। রামের দেহের বর্ণে সকলে লক্ষ্য করেছিলেন, নবদূর্বার শ্যামল বর্ণের আভাস...লক্ষ্মণের বর্ণে তেমনি গৌর আভা—রঙের এ-তুলি টেনেছিলেন নিপুণ শিল্পী চারুচন্দ্র রায় শিশিরকুমারের পরামর্শে। তারপর অভিনয়ে সকলে লক্ষ্য করেছিলেন, সকলের বাকভঙ্গীর প্রকাশে আশ্চর্য harmouy...গগনবিদারী উচ্চরোলের সম্পূর্ণ অভাব...পদ-চালনার গতিভঙ্গীতে যেমন সংযম, তেমনি ছন্দলীলা...পাদপ্রদীপ নিবিয়ে টপ-লাইটের লীলা; গানে গায়ক-গায়িকার কণ্ঠস্বরকে চেপে দিয়ে যন্ত্রাদির তীব্রতা লোপ। সংলাপ যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি ছন্দে বাঁধা...সংলাপগুলির অর্থ বুঝে সুস্পষ্ট প্রকাশ...'সুরেলা'র বাষ্পও ছিল না কারো বাচন-ভঙ্গীতে। একজন যখন কথা বলছেন, অপরে তখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন না। বক্তার কথার reaction বিকশিত হচ্ছে যাঁরা কথা বলছেন না তাঁদের ভঙ্গীতে... তাঁদের নড়ায়-চড়ায়। পূর্বে এমন প্রয়োগ-নৈপুণ্য বাঙলার রঙ্গমঞ্চে দেখা যেত না...শিশিরকুমার সকল দিক দিয়ে অভিনয়কে সার্থক এবং স্বাভাবিক করে তোলবার জন্য প্রযোজনার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত হুঁশিয়ার।

"প্রদর্শনীতে 'সীতা'র অভিনয় দেখে সকলে বুঝলেন, Here's the hero, at last !"

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন: "এলো ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের এগজিবিসন, ইডেন গার্ডেনস্-এ। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' তিনি মঞ্চস্থ করলেন। সীতা যতখানি নাটক, ততখানি কাব্য। কিন্তু কাব্যই তো শিশিরকুমারের কাম্য। একেবারে ঝড় বহিয়ে দিলেন এই অভিনয় দিয়ে। কোথায় অযোধ্যা, আর কোথায় কলকাতা, কোথায় ত্রেতা, আর কোথায় কলি। সীতা-রামের বিরহ-বেদনার অনুপম-ব্যঞ্জনা সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলে।"

এই 'সীতা' নাটকের অভিনয়-প্রসঙ্গেই সৌরীন্দ্রমোহন অপর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন: "সব শ্রেণীর দর্শক সে-অভিনয় দেখে চমৎকৃত হলেন। শিশির-কুমার স্বাধীনভাবে কি জিনিস দিতে পারেন, বাঙালী দর্শক তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। শিশিরকুমার বাঙলা রঙ্গমঞ্চে নূতন আবহাওয়া সঞ্চারিত করে তাকে নব প্রাণে জাগিয়ে তুলতে পারবেন, এ বিশ্বাস সকলের মনে সুদৃঢ় হল। 'সীতা'র এ অভিনয়ে শিশিরকুমার নেমেছিলেন রাম-এর ভূমিকায়; সীতার ভূমিকায় প্রভা; মহর্ষি বাল্মীকির ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য; লব ও কুশের ভূমিকায় রবি রায় ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায়—বশিষ্ঠ সেজেছিলেন যতদূর সম্ভব মনে পড়ছে, ললিত লাহিড়ী। এঁদের অভিনয় হয়েছিল অনন্যসাধারণ। মঞ্চ ও রূপসজ্জার ভার ছিল শিল্পী চারুচন্দ্র রায়ের হাতে। চারুচন্দ্রের শক্তির পরিচয় বাঙলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রকাশ পায়—বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর 'মুক্তার মুক্তি' গীতি নাটকের অভিনয়ে। 'সীতা'র রূপসজ্জাদি আরো অভিনব হয়েছিল। সীতার অভিনয়ে প্রভা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন,—তেমনি কৃতিত্ব আমাদের যুগে আমরা কখনো দেখি নি। চরিত্র-ব্যঞ্জনায় যে অদ্ভুত softness তিনি দেখিয়েছিলেন, তাঁর সে কণ্ঠ, সে শান্ত সহজ স্বচ্ছ ভাব আজো মনের পটে আঁকা আছে। 'সীতা'র এ-অভিনয় বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এমন সাড়া তুলেছিল যে অন্য পরিচালকের দল ভয় পেয়ে-ছিলেন—শিশিরকুমার নিজের মঞ্চ খাড়া করে দাঁড়ালে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা হয়তো ভেঙ্গে পড়বেন।"

কুড়ি

একজিবিসনে অভিনীত 'সীতা' নাটকের অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শিশিরকুমার সঙ্কল্প করলেন দ্বিজেন্দ্রলালের এই 'সীতা' নাটক নিয়েই নিজের মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করবেন। ম্যাডান কোম্পানীর এ্যালফ্রেড থিয়েটার তখন খালি পড়ে আছে। ঐ এ্যালফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নিয়েই সেখানে মঞ্চ খুলবেন। জে. এফ. ম্যাডানের জামাতা রুস্তমজী সাহেব শিশিরকুমারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সম্মান করতেন। যে-জমির ওপর এ্যালফ্রেড থিয়েটারের বাড়ি, সে-জমির মালিক সিমলে কাঁসারীপাড়ার অটল সেন। তিনি ভাল অভিনেতাও ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে কলকাতায় 'ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে প্রায়ই সঙ্গীতের আসর বসত। মাঝে মাঝে নাট্যানুষ্ঠানও হত। রবীন্দ্রনাথ এই সঙ্গীতসমাজের জন্যেই 'গোড়ায় গলদ' নাটকটি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজের সভ্যেরা নাটকটি অভিনয় করেছিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীশচন্দ্র বসু (এঁরই লিখিত 'পুণ্ডরীক' নাটক শিশিরকুমার 'নাট্যমন্দির'-এ অভিনয় করেছিলেন) 'চন্দোর দা' আর অটল সেন 'শিবচরণ' সেজেছিলেন। 'শোনা যায়, অভিনয়কে স্বাভাবিক করবার জন্যে অটলবাবু রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত শিক্ষারও ওপর গেলেন, সামনের দুটো দাঁত তুলে ফেলে বাঁধানো দাঁত' পরেছিলেন। সঙ্গীত-সমাজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। পরে অটলবাবু হয়েছিলেন সম্পাদক। অটলবাবু শিশিরকুমারকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

শিশিরকুমার তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। অটল সেন রুস্তমজীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং রুস্তমজী সাহেব শিশিরকুমারকে এ্যালফ্রেড থিয়েটার বাড়ির লীজ দিয়ে দিলেন।

ঘোষিত হল—১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় শিশিরকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নিয়ে এ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করবেন।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মহারথী শিশিরকুমার আসরে নামছেন। আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত ও চঞ্চল হয়ে পড়লেন। 'থিয়েটারি বাজারে আর কেউ যে এসে নূতন পসরা সাজিয়ে বসে এটা তাঁরা পছন্দ করলেন না, তাই ছলে-বলে-কৌশলে একজন নিরপরাধ দরিদ্র কিন্তু প্রতিভাবান শিল্পীকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন।'

নাটক অভিনয় করতে গেলে নাটকের মালিকের অনুমতি চাই। দ্বিজেন্দ্রলাল পরলোকে—তাঁর একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার এখন গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী—তাঁর অনুমতির প্রয়োজন। দিলীপকুমার তখন য়ুরোপে। একজিবিসনে 'সীতা' নাটক করবার সময়ে শিশিরকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের এক বিশিষ্ট বন্ধুর কাছ থেকে মাত্র তিন রাত্রির জন্য 'সীতা' নাটকের অভিনয়-স্বত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন। দিলীপকুমার ফিরে এলেই তাঁর কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে এটা শিশিরকুমার স্থির জানতেন। দিলীপকুমারের সঙ্গে শিশিরকুমারের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং শিশিরকুমারকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন দিলীপকুমার।

দিলীপকুমার ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে প্যারিস থেকে ফিরলেন। তাঁর পেঁীছোনোর দিনক্ষণ আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই জেনে রেখেছেন। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নামা মাত্র প্ল্যাটফর্মে দিলীপকুমার দেখলেন আর্ট থিয়েটারের কজন কর্তাব্যক্তিদের। তাঁরা জানালেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক নিয়ে নামবার জন্য আর্ট থিয়েটার প্রস্তুত—শুধু চুক্তির অপেক্ষা। তাঁরা দিলীপকুমারের সঙ্গে তাঁর নন্দকুমার চৌধুরী লেনের বাড়িতে এলেন এবং ফিরলেন 'সীতা'-র অভিনয়-স্বত্ব কিনে নিয়ে।

শিশিরকুমারের 'সীতা'-হরণ হয়ে গেল। এবং হরণ করলেন 'ত্রেতার রাবণের মতই চুপি চুপি' আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ।

এরপর যখন শিশিরকুমার 'সীতা'-র অভিনয়-স্বত্ব নেবার জন্য দিলীপকুমারের বাড়ি এলেন তখন তিনি শুনলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে এসেছিলেন আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ। তাঁরা 'সীতা'-র মঞ্চস্বত্ব কিনে নিয়ে চলে গেছেন অভিনয় করার জন্য। আর্ট থিয়েটার 'সীতা' অভিনয় করবে, 'রাম'-এর ভূমিকায় নামবেন নির্মলেন্দু। নির্মলেন্দু লাহিড়ী দিলীপকুমারের আত্মীয়। শিশিরকুমার স্তম্ভিত, হতবাক। তাঁর চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠল! তাঁর একার বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র চলছে।

এই সম্পর্কে দিলীপকুমার 'নাচঘর' (২২শে শ্রাবণ, ১৩৩২) পত্রিকায় লিখেছিলেন: "শিশিরবাবু প্রদর্শনীতে তিনরাত্রির জন্য সীতা অভিনয়ের অনুমতি পেয়ে বারো রাত্রি অভিনয় করেন। অতএব এখন আর্ট থিয়েটার ঐ নাটকটি অভিনয় করে লাভবান হবার প্রয়াসী। তাঁরা কালবিলম্ব না করে

আমাকে royalty হিসাবে ৪৫০৲ দিয়ে এক বৎসরের জন্য 'সীতা' অভিনয়ের স্বত্ব ক্রয় করলেন। তখন আমি জানতাম না যে, এই 'সীতা' নিয়েই তিনি নূতন থিয়েটারের পত্তন করতে উদ্যত। তিনিই একদিন আমার কাছে এসে বললেন যে, তিনি পিতৃদেবের 'সীতা' নাটক নিয়েই আসরে নামতে উদ্যত এবং এ জন্য সব সরঞ্জামই প্রস্তুত। শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম এবং তাঁর কথা শোনামাত্র সেইদিনই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে বলি যে, আমাকে দিয়ে চুক্তিপত্র সই করিয়ে নেবার সময়ে আমার কাছে সব কথা খুলে বলা হয় নি। অতএব আমাকে এ-চুক্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হোক, কারণ তা না হলে শিশিরবাবুর প্রতি মস্ত অবিচার করা হয়। তাঁরা তাতে অস্বীকৃত হলে শিশিরবাবু বলেন যে, বেশ দুপক্ষকেই অভিনয় করার অনুমতি দেওয়া হোক। তাতেও আর্ট থিয়েটার কর্তৃপক্ষ অসম্মত হন। আমি royalty ফেরৎ দিতে চাইলাম—আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাতেও রাজি হন নি। সুতরাং আমাকে বাধ্য হয়ে শিশিরকুমারের মত ভদ্রলোকের ও প্রতিভাবান নটের শত্রুতাসাধনের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। এজন্য দায়ী ও দোষী একা আমি। আমার দোষ প্রথমতঃ এই যে, আমি অনুসন্ধান না করেই হঠাৎ চুক্তি করে ফেলেছিলাম ; দ্বিতীয়তঃ শিশিরবাবুর কথায় বিশ্বাস করতে পারি নি যে, আর্ট থিয়েটার শুধু তাঁকে জব্দ করার জন্যই 'সীতা' কিনে নিয়েছিলেন, অভিনয় করবার জন্য নয়।"

শিশিরকুমার সোজা চলে এলেন 'ভারতী' পত্রিকার অফিসে। সেখানে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে (শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা) এই সর্বনাশা সংবাদ জানিয়ে বললেন, 'একি হল !'

মণিলাল বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই। দোলের দিনেই আমাদের অভিনয় সুরু—বসন্ত উৎসব নিয়ে গানে গানে পালা তৈরী করে নেব আমরা।'

শিশিরকুমার বললেন, 'কিন্তু দেশশুদ্ধ সকলে জানে, আমরা 'সীতা' নাটকের অভিনয় করব।'

মণিলাল বললেন, 'ভেব না শিশির। রামচন্দ্র তাঁর সীতাকে হারিয়ে যজ্ঞ করেছিলেন স্বর্ণসীতা তৈরী করিয়ে। আমরাও নতুন 'সীতা' লিখিয়ে নিয়ে সেই 'সীতা'র অভিনয় করব। আমাদের 'সীতা' ও 'সীতা'-র চেয়েও সেরা করে গড়ে তুলব······তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

'ভারতী' গোষ্ঠীর শিল্পী ও সাহিত্যিক বন্ধুরা এই বিপদে শিশির কুমারের পাশে এসে দাঁড়ালেন। মণিলালের উদ্যোগে 'বসন্ত-লীলা' গীতি-নাট্যের সৃষ্টি হল। 'বসন্ত-লীলা'য় গান গাইবার জন্য সাদর আহ্বান জানান হল অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দেকে। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকাশ্যভাবে মঞ্চে এই প্রথম অবতরণ। তাঁর গান সকলকে বিমুগ্ধ করেছিল। মণিলাল ছ-খানি গান লিখলেন, হেমেন্দ্রকুমার রায় গুটি ছয়েক গান লিখলেন এবং এর সঙ্গে প্রাচীন কখানি গানসহ রবীন্দ্রনাথের গান জোড়া দিয়ে একটি গানের মালা গাঁথা হল। সুর সংযোগ করলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং নৃত্য-পরিকল্পনা করলেন নৃত্য গুরু নৃপেন্দ্র-চন্দ্র বসু ('আলিবাবা' গীতি-নাট্যের 'আবদাল্লা'-খ্যাত নেপা বোস)। কৃষ্ণচন্দ্র গাইবেন চারখানি গান—মাইকেলের লেখা 'সখি রে, বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে'—প্রাচীন গান 'হোলি খেলত নন্দদুলাল'—তৃতীয় গান কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'রঙে বাউল সেজে পথে এলাম ধেয়ে' এবং চতুর্থ গান মণিলালের 'আনন্দ আজ সেজে এলো লাল চেলির ঐ সাজে'।

এই 'বসন্ত-লীলা' দিয়েই শিশিরকুমারের নিজস্ব মঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন হল ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলেন একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন।

প্রথম অভিনয়ের প্রোগ্রাম তৈরী হয়েছিল ডবল ক্রাউন ষোল পৃষ্ঠা আর্ট পেপারে। কভারে লেখা—

"বসন্ত-লীলা"

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী অনুষ্ঠিত

—০—

প্রথম অভিনয়—বাসন্তী পূর্ণিমা, ৮ই চৈত্র ১৩৩০

—

স্থান—এ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চ

প্রথম পৃষ্ঠায় শিশিরকুমারের ভূমিকা — আমার বন্ধু শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই বসন্ত-লীলার বিচিত্র মালাটি সুনিপুণভাবে গেঁথে দিয়ে

আমার প্রতি তাঁর যে আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, তাতে আমার জীবনের এই বাসন্তী-পূর্ণিমা চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল হয়ে রইল।

শিশিরকুমার 'পথিক'-রূপে মঞ্চের উপর দেখা দিলেন।

'বসন্ত-লীলা' অভিনয়ের বর্ণনা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় করেছেন ঃ "'বসন্ত-লীলা'র গানগুলি কি ভাবে সাজাতে হবে···প্ল্যান হল। মণিলালই তার ব্যবস্থা করলেন। দোলের দিন চিরকাল বাংলা রঙ্গমঞ্চে 'দোল-লীলা' গীতি-নাটিকার অভিনয় হত; মণিলাল দোল-লীলার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে রচনাটিকে আবদ্ধ রাখলেন না—তিনি ধরলেন বসন্ত-লীলা কীর্তন। একাধিক পর্যায়ে তিনি বসন্ত-লীলা রচনা করলেন···তিনটি পর্যায়ে অর্থাৎ তিনটি অঙ্কে হল বসন্ত-লীলার সৃষ্টি। প্রথম পর্যায়ে বসন্তের প্রকাশ··· দ্বিতীয় পর্যায়ে বসন্তের বিকাশ এবং তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে বসন্তের লীলা। প্রোগ্রাম পুস্তিকায় এই পর্যায়-বিভাগ এমন ভাবে লেখা হল যাতে অতি-সাধারণ দর্শকও রস উপলব্ধি করতে পারেন। প্রথম পর্যায়ে বসন্তের প্রকাশ অর্থাৎ প্রকৃতির গায়ে বসন্তের স্পর্শ এসে লেগেছে···তাই চারি-দিকে সাড়া পড়ে গেছে···পালা সুরু হল রবীন্দ্রনাথের সেই প্রসিদ্ধ গানে—ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে। 'ফুল-কোরাসে' এ গান অপরূপ জমেছিল। এ গানের পর···যখন খবর রটে গেল, বসন্ত এসেছে···প্রাণ আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল···তখন দখিন হাওয়াকে ডাকা রবীন্দ্রনাথের সেই গান—'ও দখিণ হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।' দখিণ হাওয়ার গানের স্পর্শে দর্শকের মন যখন মশগুল, তখন অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র বসন্ত-দূতের বেশে প্রবেশ করে গাইলেন মাইকেল মধুসূদনের সেই অমর গান···

সখি রে,
বন আজি রমিত হইল ফুল ফুটনে
পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল
উছলে যমুনা-জল, চল লো বনে—
চল লো জুড়াবে আঁখি হেরি ব্রজ-জীবনে।

মাইকেল মধুসূদনের বিস্মৃত উপেক্ষিত এ-গান যে-ক্লাসিক touch দিয়েছিল··· বাঙলার রঙ্গমঞ্চে তখনকার যুগে— তা সকলের চমৎকার লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ, মাইকেলের গান ছাড়া প্রাচীন কটি প্রসিদ্ধ গানও এ মালায়

সন্নিবেশিত করেছিলেন মণিলাল...সেই সঙ্গে তিনি নিজেও নূতন গান লিখেছিলেন...সত্যেন দত্তর গানও সন্নিবেশিত হয়েছিল।

"বসন্ত-লীলা বাঙলা রঙ্গমঞ্চে যে নূতন সৃষ্টি...এ-কথা সকলেই মুগ্ধচিত্তে স্বীকার করেছিলেন।"

বাইশ

শিশির-সম্প্রদায়ে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অভিনেতা হিসাবে রয়েছেন। তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তখনও পর্যন্ত তিনি কোন নাটক লেখেন নি। কিন্তু শিশিরকুমার জানতেন তাঁর রচনা-শক্তি আছে। শিশিরকুমার নূতন 'সীতা' নাটক লেখবার ভার যোগেশচন্দ্রের উপর অর্পণ করলেন। শিশিরকুমার ও মণিলাল হলেন যোগেশচন্দ্রের প্রেরণাদাতা। নূতন নাটকখানির পরিকল্পনা করলেন শিশিরকুমার। নাটক-রচনা সম্পর্কীয় নানা মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ যোগেশচন্দ্র পেলেন শিশিরকুমারের কাছ থেকে। এক দিকে নাটক রচনা চলতে লাগল আর একদিকে শিশিরকুমার 'আলমগীর', 'রঘুবীর' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় করে আসর জমিয়ে রাখলেন।

এই সময়ে মণিলাল প্রস্তাব করলেন—'পুরানো থিয়েটার ওয়ালারা প্রচার পত্রের সাহায্যে শত্রুতা সাধন করতে পারে—অতএব তাদের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের প্রয়োজন নাট্যকলা সম্বন্ধে বাঙলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করা।' তখন আর্ট থিয়েটার একখানি বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার-পত্র হিসেবে বার করেছেন—তার নাম 'নটরাজ'। নটরাজ সম্পাদনা করেন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মণিলালের প্রস্তাব গৃহীত হল। পত্রিকার সম্পাদনা ভার দেওয়া হল প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের হাতে। 'মৌচাক'-সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার পত্রিকার লালন ভার নিলেন। মণিলাল পত্রিকার নামকরণ করলেন—'নাচঘর'। 'নাচঘর'-এর প্রথম সংখ্যা মণিলালের কান্তিক প্রেসে ছাপা হয়ে বেরুলো—২৬শে বৈশাখ, ১৩৩১।

এদিকে মনোমোহন থিয়েটারের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী মনোমোহনে নিশিকান্ত বসু রায়ের 'ললিতাদিত্য' খোলা হল। দানীবাবু নামভূমিকায় অভিনয় করলেন। 'অভিনয় মন্দ হয় নি—তবু কেমন জমলো না। না জমার কারণ অভিনয়ে,

রূপসজ্জায়, আবহাওয়া-সৃষ্টিতে শিশিরকুমার তখন এমন বন্যা এনে দিলেন যে মামুলি ও আধুনিক—দুদলের দর্শকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। আর্টের স্বরূপ উপলব্ধি করলেন সকলে। মনোমোহনের মামুলি ঢং—বয়স্ক নট-নটী, তাদের *সেই একঘেয়ে রকমের স্বর-প্রক্ষেপ ও ভঙ্গী দর্শকের মনকে বিক্ষুব্ধ প্রপীড়িত* করে তুলল। মনোমোহন থিয়েটারের বিচক্ষণ মালিক মনোমোহন পাঁড়ে হাওয়া বুঝলেন।...মনোমোহন থিয়েটার তুলে দেবার সঙ্কল্প করলেন তিনি। এর উপর আবার ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্টের স্কীম—চিত্তরঞ্জন এভেনু সোজা টেনে নিয়ে যাবে সেই শ্যামবাজারের চৌমাথা পর্যন্ত। সুতরাং এসময়টায় খালি ফেলে না রেখে থিয়েটার বাড়ি ভাড়া দেওয়া ভাল। চালু থিয়েটারের নাম এবং বন্ধ থিয়েটারের দাম—দুয়ে অনেক তফাৎ তো। তিনি ঠিক করলেন, মনোমোহন থিয়েটার তুলে দিয়ে ও বাড়ি ভাড়া দেবেন।'

এ খবর যখন চাউর হল তখন মনোমোহন পাঁড়ে দার্জিলিংয়ে। শিশিরকুমার দার্জিলিংয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে মনোমোহন থিয়েটার বাড়ির লীজ নিয়ে ফিরে এলেন। ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে মনোমোহন পাঁড়ে তাঁর থিয়েটার বাড়ি খালি করে দিলেন এবং ১লা জ্যৈষ্ঠ শিশিরকুমার মনোমোহন থিয়েটার বাড়ির দখল পেলেন।

শিশিরকুমার স্থির করলেন সাবেকী চালে ইংরেজী নাম না দিয়ে নিজের থিয়েটারের নামকরণ করবেন বাঙলায়।

এর আগেকার থিয়েটারগুলোর নাম ছিল ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, রয়েল বেঙ্গল, এমারেল্ড, সিটি, গ্র্যাণ্ড, ইউনিক, অরোরা, কোহিনুর, থেস্‌পিয়ান, ক্লাসিক, মিনার্ভা, ম্যাডান, স্টার, মনোমোহন থিয়েটার।

শিশিরকুমার নাম রাখলেন—**নাট্যমন্দির**।

নুতন 'সীতা' নাটক রচনা শেষ হয়েছে। এ্যালফ্রেডে 'সীতা'র রিহার্সাল সুরু হল।

মনোমোহন থিয়েটার বাড়ির সংস্কার আরম্ভ হয়ে গেল। বাড়ির 'পুরান কাঠামো বদলে ফেলে প্রেক্ষাগৃহের সংস্কার করে নূতনতর অঙ্গরাগে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন নাট্যগৃহ। পুরানো আসন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে, দর্শকবৃন্দের জন্য নূতনভাবে তৈরী হল আসনসজ্জা। রঙ্গালয়ের ভিতর লাল রঙ দিয়ে জায়গায় জায়গায় স্ক্রোল ওয়ার্ক-এ চিত্রিত করা হল গৃহপ্রাচীর। দোতলায় গোটা সাতেক 'বক্স'-এর ব্যবস্থা রেখে বাকি জায়গাটায়

মহিলাদের বসবার সুব্যবস্থা করে দেওয়া হল। পূর্বে মহিলাদের বসবার জায়গা ছিল অন্ধকার ও অত্যন্ত ছোট। নূতন ব্যবস্থায় মহিলা-আসনের অসুবিধা আর রইল না। মঞ্চের সম্মুখে ছিল একটি থাম—সেটি ভেঙ্গে দিয়ে মঞ্চের পরিধি আরও বাড়ানো হল, মঞ্চের পাদপ্রদীপ তুলে দিয়ে নতুন উপায়-নির্দেশে আলোক-সম্পাতের ব্যবস্থা হল।" মনোমোহন মঞ্চে শিশিরকুমার মহিলাদেব বসবার যে নূতন ব্যবস্থা করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন ঃ "তখনো পর্যন্ত মহিলাদের আসন ছিল প্রায় খাঁচার মতো—নীচে পুরুষদের আসনে মহিলাদের বসবার ব্যবস্থা ছিল না, তিনিই প্রথম এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। যেসব দর্শক তাঁদের বাড়ির মহিলাদের জন্য 'জেনানা পর্দা' চান, তাঁদের মহিলাদের জন্য দোতলায় জালঘেরা স্বতন্ত্র আসনেরও ব্যবস্থা ছিল। নাচেকার আসনে কোনো 'বক্কেশ্বর' দর্শক যাতে শিখ দিতে বা অশোভন মন্তব্য প্রকাশ বা আচরণ করতে না পারে, সেদিকেও তাঁর ছিল কড়া নির্দেশ 'গার্ড'দের উপর—সুদক্ষ কর্মচারী আগাগোড়া supervision করতেন।

"তাঁর এ ব্যবস্থার সাফল্য দেখে অন্য রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন—সেজন্য কোনোদিন শান্তিভঙ্গ ঘটে নি।"

গৃহ-সংস্কারের পর শহরে ঘোষণা-পত্র বেরুলো ঃ—"ভারতের আবালবৃদ্ধ-বণিতার চিরবন্দিতা 'সীতা' শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অধিনায়কতায় নবযুগের নবীন প্রেরণায় অভিনব মূর্তিতে কলাসম্মত নিখুঁত পৌরাণিক দৃশ্যপট ও পুরাতন্ত্রের সুদৃশ্য সাজসজ্জা, অলঙ্কারমণ্ডিত হইয়া শীঘ্রই মহাসমারোহে মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে অভিনীত হইবে।"

সারা কলকাতায় সাড়া পড়ে গেল। "আর্ট থিয়েটার এটর্ণির দ্বারস্থ হলেন। নাট্যামোদীরা উৎকণ্ঠিত রইলেন। বড় একটা মামলার উত্তেজনা তাদেরকে উদ্বেল করে তুলল। ক্রমশঃ প্রকাশ পেল তিনি নতুন সীতা রচনা করিয়েছেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে দিয়ে। চৌধুরী মশাই তখন অজ্ঞাত-কুলশীল। বিরোধীরা বগল বাজিয়ে বলল—হয়ে গেল শিশির ভাদুড়ীর। তাদের মুখে ফুল চন্দন দিয়ে শিশিরকুমার পলকে প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন 'স্বর্ণ-সীতা' আর্টিষ্টস্ থিয়েটার"—একথা লিখেছেন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

তেইশ

পূর্ণোদ্যমে 'সীতা'র প্রস্তুতি চলছে।

রূপ-সজ্জা, দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে রচনা করছেন নিপুণ শিল্পী চারুচন্দ্র রায়—তাঁকে সহযোগিতা করছেন শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। টু ডাইমেন্‌সন্যাল দৃশ্যপটের পরিবর্তে 'খণ্ডপট' সৃষ্টি হল। সেই পটে রঙে রেখায় পরিস্ফুট হল পৌরাণিক পরিবেশ। 'নেপথ্য হতে মঞ্চে এবং মঞ্চ হতে নেপথ্যে প্রবেশ প্রস্থানের চিরাচরিত নির্দিষ্ট পথ নব পরিকল্পনায় পরিবর্তিত।' হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গানে সুর-সংযোজনা করেছেন রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনিই প্রমাণিত করলেন মঞ্চসঙ্গীতের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী রবীন্দ্র পদ্ধতি। 'সীতা' নাটকে তিনিই সর্বপ্রথম এই নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। আর মঞ্চে সর্বপ্রথম ব্যবহার করলেন তিনিই ভারতীয় সঙ্গীতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বর সঙ্গতি—'সীতা'র 'শৃণ্বন্ত বিশ্বে' শ্লোকের সুরে। 'সীতা'র মাধ্যমেই মঞ্চ-সঙ্গীতে নূতন ধারার প্রবর্তন হয়। গুরুদাসের সুরে কণ্ঠদান করবেন বিখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। তাঁর মত সঙ্গীত-শিল্পী এর পূর্বে রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেন নি। গিরিশযুগের অদ্বিতীয় নৃত্যগুরু নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (নেপা বোস) তখন শিশির-সম্প্রদায়ে। কিন্তু 'যে-যুগধর্ম অবলম্বন করে 'সীতা' আত্মপ্রকাশ করতে চায় তাতে তাঁর পদ্ধতি কিছুতেই খাপ খাবে না।' তাই শিশিরকুমার নৃত্য-পরিকল্পনার ভার মণিলালের উপর অর্পণ করলেন। তিনি ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে নৃত্যভঙ্গী গ্রহণ করে এক নূতন ভারতীয় নৃত্য-পদ্ধতি 'সীতা'র মাধ্যমে প্রবর্তন করলেন। পরে এই নৃত্য-পদ্ধতি উদয়শঙ্কর গ্রহণ করেছিলেন। সঙ্গীতে নৃত্যে কোথাও মামুলি থিয়েটারি ছাপ নেই। অভিনয়ের সময় নেপথ্যান্তরাল থেকে করুণ-মধুর আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে ক্ল্যারিওনেট-যোগে। এ ক্ল্যারিওনেট বাজাবেন সুনিপুণ রসশিল্পী নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি পরে কলকাতা বেতারের 'ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রামস্' হয়েছিলেন।

'সীতা'র গঠনে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিল্পাচার্য যামিনী রায়, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, নরেন্দ্রদেব, নলিনীকান্ত সরকার।

অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর জামাতা যতীন লাহিড়ী (চিত্র-পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর পিতা), নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্র চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীচরণ গোস্বামী, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ যতীন্দ্রকুমার চৌধুরী এবং শিশিরকুমারের পরম সুহৃদ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়।

শিষ্য হয়ে এলেন প্রফুল্ল রায় ও পশুপতি চট্টোপাধ্যায় যাঁরা পরবর্তীকালে প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক হয়েছিলেন।

কিন্তু 'সীতা'র গঠনে সর্বত্রই শিশির-মনীষা ক্রিয়া করছে। এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার উত্তরকালে লিখেছেন: "আলোকিত, সুসজ্জিত, সুচিত্রিত নাট্যশালা, বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন সাজপোশাকে শিশিরকুমার করেন রঙ্গাবতরণ; তাঁর বাক্যস্ফূর্তি, অঙ্গভঙ্গ ও গতিবিধি পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহকে করে তোলে প্রশস্তি-গানে মুখরিত। নাট্যপ্রিয় জনসাধারণ বাহিরে বসে শিশিরকুমারের কাছ থেকে এইটুকু দান পেয়েই খুসি হয়ে বিদায় গ্রহণ করে।

"কিন্তু শিশিরকুমারের দান করবার শক্তি যে আরও কত বেশী, সে পরিচয় পেয়েছেন কেবল তাঁর শিষ্য, সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গগণ। মহলার সময়ে মঞ্চের উপর বাইরের জাঁকজমক কিছুই থাকে না—না অত্যুজ্জ্বল আলোকমালা, না বর্ণবিচিত্র দৃশ্যপট ও পোশাক পরিচ্ছদ, না অবিচ্ছিন্ন ও ক্রমবর্ধমান নাটকীয় ক্রিয়া, কিন্তু তবু শিশিরকুমার যখন একাই একাধিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন পুরুষ ও নারীর ভূমিকায় অভিনেয় যা কিছু তা বুঝিয়ে দিতে আরম্ভ করেন, তখন বারবার আমার মনে হয়—কোন্ শিশিরকুমার বড়? প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের বিশেষ ভূমিকার অভিনেতা শিশিরকুমার, না অপ্রকাশ্য মহলায় একাধারে বহু ভূমিকার নাট্যশিক্ষাদাতা শিশিরকুমার? রঙ্গমঞ্চের উপরে তাঁকে দেখি কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর অভিনেতারূপে, কিন্তু মহলার আসরে তাঁকে দেখতে পাই—উচ্চতর ও মহত্তর এক বিপুল ও বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী কলাবিদ্‌রূপে। সেখানে তিনি ছবি না এঁকেও ছবিকার, নাট্যকার না হয়েও নাট্যরস-স্রষ্টা, সুরকার না হয়েও সঙ্গীতজ্ঞ এবং নৃত্যপরায়ণ না হয়ে নৃত্যকলাবিদ্; সেখানে তিনিই নট, তিনিই নটী এবং তিনিই মূক কাটা-সৈনিক; সেখানে তিনি ভাবুক, কাব্যরসিক, ঐতিহাসিক ও সমালোচক; সেখানে তিনি দ্রষ্টা, শ্রোতা ও স্রষ্টা। 'সীতা' পালার কথাই ধরুন। তিনি স্বয়ং নাটক বা

গান রচনা করেন নি, গানের সুরও দেন নি, নাচও শেখান নি, বা দৃশ্য-পটও আঁকেন নি। কিন্তু উপরোক্ত প্রত্যেক বিভাগেই সকলের উপরে কাজ করেছে তাঁরই মস্তিষ্ক। ঐ সব বিভাগের কর্মকর্তাদের উপরে তিনি যে পদে পদে হুকুমজারি করেছেন, তাও নয়; অধিকাংশ স্থলেই তাঁকে মৌখিক উপদেশ দিতেই হয় নি, প্রত্যেককেই তিনি প্রায় স্বাধীনভাবেই কাজ করবার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বেছে বেছে এমন সব সহকর্মী নির্বাচন করেছিলেন, যাঁরা তাঁর ধ্যানধারণা ও পরিকল্পনার সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিত।

"নিজের সম্প্রদায় গড়বার পর তথাকথিত নামজাদা অভিনেতাদের দলভুক্ত করবার জন্যে তিনি কোনই আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। আজ পর্যন্ত কচি ও কাঁচাদের উপরেই তাঁর আস্থা বেশী। সাধারণ রঙ্গালয়ে অজ্ঞাতনামা যে সব তরুণকে তিনি নিজের পতাকার তলায় ডেকে এনে চলতে-বলতে শিখিয়ে তৈরি করে তুলে অকুতোভয়ে 'সীতা'কে মঞ্চস্থ করেছিলেন, অনতিকালের মধ্যেই তাঁরা প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন বাংলার সমগ্র নাট্যজগতে। শিষ্যের পর শিষ্য মানুষ হয়ে প্রস্থান করেছেন স্থানান্তরে; কিন্তু তবু তিনি হতোদ্যম হন নি; সমান আগ্রহে ও উৎসাহে শিক্ষা দিয়ে আবার তৈরি করেছেন নূতন নূতন শিষ্যের পর শিষ্য। আজ বাংলা দেশের প্রত্যেক রঙ্গালয়ে দৃষ্টিপাত করলে শিশিরকুমারের শিষ্য বা প্রশিষ্যকে আবিষ্কার করতে বিলম্ব হবে না।"

এদিকে মনোমোহন থিয়েটার উঠে গেলে দানীবাবু হলেন কর্মহীন। দানীবাবুকে 'নাট্যমন্দির'-এ নেবার জন্য তাঁর সঙ্গে শিশিরকুমার কথাবার্তা চালাতে লাগলেন—এই খবর পেয়ে আর্ট থিয়েটার অবিলম্বে দানীবাবুকে তাঁদের থিয়েটারে টেনে নিলেন—১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসের গোড়ার দিকে।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি শিশিরকুমার এ্যালফ্রেড থিয়েটারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মনোমোহন থিয়েটারের বাড়িতে চলে এলেন তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে। তখন ঘোষণা-পত্রে জানান হল ২রা শ্রাবণ থেকে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে প্রত্যহ সকাল আটটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত টিকিট ঘর খোলা থাকবে এবং 'সীতা'র অভিনয়ের টিকিট কিনতে পাওয়া যাবে; advance booking-ও সুরু ঐ তারিখ থেকে। সীতার প্রথম অভিনয় ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল (ইং ৬ই আগস্ট, ১৯২৪) বুধবার, রাত্রি সাড়ে সাতটা।

আর্ট থিয়েটার ব্যর্থ হল শিশিরকুমারের অগ্রগমনকে প্রতিহত করতে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত চিত্র ও নাট্য পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষের মন্তব্যটি উদ্ধৃতি যোগ্য। তিনি লিখেছেন: "প্রতিভাকে এভাবে ঠেকান যায় না; শিশিরকুমার যদি আর কিছু কম শক্তিসম্পন্ন হইতেন, তবে তিনি আর্ট থিয়েটারের বিরুদ্ধতার সামনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না। কিন্তু প্রকৃত শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, তাই বাধা অতিক্রম করিয়া জয়দামামা বাজাইয়াছিলেন।"

চব্বিশ

মনোমোহন-নাট্যমন্দির

৬৮ বি, বিডন স্ট্রীট] [ফোন নং ১৭১৭ বড়বাজার

বুধবার ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩১ (ইং ৬ই আগস্ট, ১৯২৪) রাত্রি সাড়ে সাতটায়

শুভ উদ্বোধন

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত অভিনব পৌরাণিক নাটক

সীতা

ভূমিকালিপি :—

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী প্রভা

লক্ষ্মণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ভরত—তারাকুমার ভাদুড়ী, শত্রুঘ্ন—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, বশিষ্ঠ—ললিতমোহন লাহিড়ী, বাল্মীকি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্বুক—প্রফুল্ল রায়, লব—জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, কুশ—রবি রায়, দুর্মুখ—অমিতাভ বসু, অষ্টাবক্র—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, বৈতালিক—কৃষ্ণচন্দ্র দে, তুঙ্গভদ্রা—নীরদাসুন্দরী।

সুসজ্জিত, সুচিত্রিত মনোমোহন নাট্য-মন্দির আজ বিচিত্র আলোকমালায় সমুজ্জ্বল। দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট, আম্র পল্লব আর কদলীবৃক্ষের মাঙ্গলিক চিহ্ন। তোরণে নহবতের তান। অগণিত দর্শক সমাগম হয়েছে। বহু দর্শক স্থানাভাবে ভগ্নহৃদয়ে ফিরে যাচ্ছেন। একে একে দর্শকবৃন্দ প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করছেন। আজ তাঁরা 'টিকিট' নিয়ে আসছেন না, আসছেন 'প্রবেশ পত্র' নিয়ে—দর্শনীর বিনিময়ে। প্রবেশ-পত্রে মুদ্রিত নেই 'রো' আর 'সীট নং'—

তার পরিবর্তে পংক্তি ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি এবং আসন সংখ্যা ১, ২, ৩, ৪ ক্রমে। সবই বাঙলায় লেখা। এইরকমটা তাঁরা ইতিপূর্বে আর দেখেন নি। মুগ্ধ তাঁরা দ্বাররক্ষীর আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার আর আদর-আপ্যায়নে। দর্শকদের হস্তে প্রোগ্রামের পুস্তিকা। তাতে রয়েছে বৈচিত্র্য। পুস্তিকার প্রচ্ছদে শিল্পী চারু রায়ের আঁকা আলো-ছায়ার বক্ষ ভেদ করে সদ্য ফোটা পদ্ম আর পদ্মের কুঁড়ি। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। দর্শকবৃন্দ আসনে বসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন যবনিকা উন্মোচণের জন্য। এত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে যিনি আজ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হচ্ছেন তাঁর দীপ্তি দেখার লোভ প্রতিটি দর্শকের।

যবনিকা উন্মোচনের পূর্বে বঙ্গরঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু বক্তৃতা দিতে উঠলেন। পুরাতন যুগের প্রবীণ নাট্যাচার্য্য নবনাট্যযুগের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন ঃ—

"কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশে নাট্যকলা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়েছিল। সারাজীবন ধরে আমি এই কলার সাধনা করে এসেছি শেষে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে নাট্যকলার এই অবনতি দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল। কিন্তু আজ যাঁরা বাংলার নাট্যশিল্পে নবযুগ এনেছেন—আর্ট থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করছেন এবং বিশেষ করে শিশিরবাবুই এই নবযুগের প্রবর্তক। যে ব্যথা নিয়ে আমায় ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল, সে বেদনা থেকে এঁরা আমায় মুক্তি দিয়েছেন। যাঁদের সঙ্গে এক-সঙ্গে আমি এই কাজে নেমেছিলুম, তারা একে একে সকলেই এই সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে—আমি ভাবছিলুম, ঈশ্বর কি আমাকে রঙ্গালয়ের এই হীন অবস্থা দেখবার জন্যই জীবিত রেখেছেন! কিন্তু আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি এঁরা আমায় সে আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।"

এরপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন—"শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার কখন হয় নি। তবে আমি শুনেছি যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে তার স্থান আছে। অভিনয় এমন একটা জিনিস যে, চক্ষু-কর্ণের মিলন না হলে একমাত্র যাথার্থ অনুভব করা যায় না। সেইজন্য আমি আগ্রহ করে আজ তাঁর অভিনয় দেখতে এসেছি।"

রসরাজ আর দেশবন্ধু অভিনয় দেখবার জন্য রয়্যল বক্সে আসন গ্রহণ

করলেন। দেশবন্ধুর একপাশে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর একপাশে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র।

অভিনয় আরম্ভ হল। রঙ্গগৃহ অন্ধকার। জনৈক নাট্যরসজ্ঞ প্রত্যক্ষদর্শী লিখছেন: "যবনিকার অন্তরালে বেজে উঠল 'হাত-ঘণ্টা' অপূর্ব ছন্দে। থেমে গেল তোরণদ্বারের নহবতের ধ্বনি। ধীরে ধীরে সরে গেল যবনিকা দর্শকবৃন্দের দৃষ্টিপথ হতে। নাটমঞ্চ স্বল্পালোকিত। এক টুকরো ঘন সবুজ আলোর আভাস ছড়িয়ে পড়েছে সারা দৃশ্যপটের পর। একটি নাতিদীর্ঘ স্থানের উপর দণ্ডায়মানা এক গীতমুখরিতা নারীমূর্তি। নেপথ্যে দক্ষিণ দিক হতে সেই নারীমূর্তির উপর আলোর একটি সরলরেখা এসে পড়েছে। মুগ্ধ বিস্মিত দর্শক প্রথমেই শুনতে পেলেন সেই নারীকণ্ঠে (নটী প্রফুল্লকুমারী) রবীন্দ্র গীতির বাণী—'কথা কও, হে অনাদি অতীত অনন্ত রাতে'। নাট্যের প্রথম উন্মোচনের অভিনবত্বে ও ভঙ্গিবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের জনমণ্ডলী চিত্তজয়ী প্রয়োগ নৈপুণ্যে অভিভূত হলেন।

"…সীতা নাটকের শেষ দৃশ্য। যবনিকা উঠল—দর্শকের সামনে আলোকিত হয়ে উঠল রামচন্দ্রের রাজসভা। অভূতপূর্ব মঞ্চসজ্জা, চিত্তরঞ্জক চরিত্র-চিত্রের নয়ন-শোভন ভঙ্গিমা, কদলীবৃক্ষ রোপণ, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, ধূপের ধোঁয়া, পুষ্পবৃষ্টির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কালোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং মঞ্চোপরি বৃহৎ জনতা পরিচালনের দুর্লভ নৈপুণ্যে বিমুগ্ধ প্রাণ দর্শক রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন—প্রাণভরে উপভোগ করলেন নবতম অভিনয়কলার সম্পূর্ণতাকে।

"সীতা নাটকের শেষ সংলাপ—'সীতা—সীতা'—! শিশিরকুমারের তুলনাতীত বাচনভঙ্গীতে,—অঙ্গিকাভিনয়ের চমৎকারিত্বে কোন বিধুর বেদন-বিধুর হৃদয়ের গভীর আক্ষেপে মূর্ত হয়ে উঠল,—অশ্রুভরা দৃষ্টিতে, রোমাঞ্চিত হৃদয়ের সাত্ত্বিকাভিনয়ের পরিপূর্ণ স্বাদ-উপভোগের পরিতৃপ্তিতে নিমীলিত হল দর্শকের দৃষ্টি। নূতন সৃষ্টির শেষ যবনিকা পড়ল ধীরে—অতি ধীরে।

অভিনয় শেষে বিগত যুগের নাট্যাচার্য অমৃতলাল নবযুগের নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে করলেন আশীর্বাদ।

'জয়যাত্রায় যাও গো'।"

দেশবন্ধু প্রশংসা-পত্র দিলেন:—"আমি আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম যে শ্রীমান শিশিরকুমার ভাদুড়ী জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের

মধ্যে অন্যতম। আজ আমি রামের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা অতি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। রামের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় অপূর্ব হইয়াছে।

"আমি পূর্বে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে সকল অভিনয় দেখিয়াছি সে অভিনয়ে অপ্রধান চরিত্রগুলি কোনও দিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু শিশিরকুমারের সম্প্রদায়ের এই অভিনয়ের অপ্রধান অংশগুলির অধিকাংশই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

"সীতার চরিত্রে যে অভিনেত্রী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন শিশিরকুমারের সহিত তুলনায় তাঁহার অভিনয় অনেক নিরেশ হইলেও সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের তুলনায় তাঁহার অভিনয় শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর হইয়াছে।

"মোটের উপর অভিনয় আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে আমার শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অভুক্ত অবস্থায় শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ফিরিতে পারি নাই।"

শ্রাবণের শেষ সন্ধ্যায় অভিনয় দেখতে এলেন সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র। তিনি লিখলেন : "বিগত দুই রাত্রি উপর্যুপরি আদ্যোপান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি সীতা নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ইহার তুলনা নাই। আশ্চর্য এই স্বল্পকালের মধ্যে শিশির কি করিয়া না তাঁহার দলের নূতন লোকগুলিকে এমন মানুষ করিয়া তুলিলেন! বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের অভিনয় দেখিবার সময় বহুবারই মনে হইয়াছে এই বাঙলা দেশের সমস্ত অভিনেতাই যে সবিনয়ে ইঁহার কাছে আপনাদের শিশু বলিয়া মনে করেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এবং সত্য স্বীকার করায় তাঁহাদের গৌরব আছে।"

'সীতা'-র অভিনয়ের সুখ্যাতি রবীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছল। তিনিও অভিনয় দেখতে এলেন। সঙ্গে শরৎচন্দ্র। সেদিন রবিবার ১লা ভাদ্র, ১৩৩১— সীতা অভিনয়ের পঞ্চম প্রদর্শনী। জনৈক নাট্যরসজ্ঞ প্রত্যক্ষদর্শী লিখছেন : "মনোমোহন নাট্য-মন্দিরের রঙ্গ প্রদীপ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল সহস্রগুণ বেশী। সেদিন ছিল নাট্য-মন্দিরের বিশেষ স্মরণীয় অভিনয়-আসর। আনন্দ ও আশঙ্কায়, কম্পিত ও পুলকিতচিত্তে অপেক্ষমান নাট্যমন্দির সম্প্রদায়। চোখে-মুখে তাঁদের অপরিসীম কৌতূহল আর উল্লাসের ছাপ ; অনুচ্চ আলোচনায়, মৃদু গুঞ্জনে নাট্যগৃহ প্রাণচঞ্চল।...রবীন্দ্রনাথের শুভাগমনে শতগুণ উৎসাহিত হয়ে উঠল নূতন যুগের নবীন প্রতিভা শিশিরকুমার। জানালেন শ্রদ্ধা, প্রণাম

করে বসালেন সুসজ্জিত আসনে। শুভ্র সজ্জায় সজ্জিত, অপূর্বকান্তি, সদাহাস্যময় প্রাণ মহাভারতের মহান কবি আশীর্বাদ করে আসন গ্রহণ করলেন।"

একাদিক্রমে চার পাঁচ ঘণ্টাকাল কবিগুরু বিমুগ্ধ প্রাণে বসে অভিনয় দেখলেন। 'প্রেক্ষাগৃহে কবির পাশে সারাক্ষণ বসেছিলেন সীতা নাটকের অন্যতম নৃত্য-পরিকল্পক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। অভিনয়ের মধ্যে ও বিরতির ফাঁকে আগ্রহে শুনছিলেন কবির সুবিজ্ঞ অভিনয়ালোচনা ও প্রশংসনীয় মন্তব্য।'

অভিনয় শেষে কবিগুরু শিশিরকুমারের বাচন-ভঙ্গির অকুণ্ঠ প্রশংসা জানিয়ে বললেন, 'মৌলিক'।

উত্তরকালে কবি তাঁকে 'নটরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "সেদিন আমাদের নটরাজ শিশির ভাদুড়ী মশায় কোনো শোকাবহ অতি গম্ভীর নাটকের জন্য আমার কাছে গান ফরমাস করে বসলেন।" পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'নাট্যাধিনায়ক' অভিধা দিয়েও শিশিরকুমারেকে প্রশংসা পত্র দিয়েছিলেন।

বহুযুগ পরে কবি সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। এই সংবাদ 'নাচঘর' (৬ই ভাদ্র, ১৩৩১) পত্রিকায় পরিবেশিত হয়েছিল ঃ "গত রবিবার মনোমোহন নাট্যমন্দিরের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ 'সীতা'র অভিনয়ে সে রাত্রে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন হয়েছিল। অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি আসন ত্যাগ করেন নি। অভিনয় যে তাঁর ভালো লেগেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা প্রকাশ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করা বাঙালী অভিনেতার ভাগ্যে এই প্রথম।...গত রবিবারের 'সীতা'র অভিনয় দেখবার জন্যে মনোমোহন নাট্য মন্দিরে যত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সেবক ও কলাবিদের সমাগম হয়েছিল এর আগে বাংলা রঙ্গালয়ে আমরা তা দেখি নি। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, রসিক সমাজে এখন শিশিরকুমারেব মতন প্রতিষ্ঠা আর কোন অভিনেতার নেই।"

'সীতা' দেখতে 'নাট্যমন্দির'-এ লোক ভেঙে পড়তে লাগল।

আর্ট থিয়েটার গোষ্ঠী আবার ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের প্রচার-পত্র মারফত শিশিরকুমার ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে নানা কুৎসা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন 'সীতা'-র অভিনয় রবীন্দ্রনাথের মোটেই ভালো লাগে নি।

রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়ে মণিলালকে একটি চিঠি লেখেন :—

কল্যাণীয়েষু,

কাগজে নিজের জবানীতে অভিনয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তুমি লিখে দিতে পার যে শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগ-নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই-একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি। সীতা বইটিকে আমি একটুও পছন্দ করিনে—ওটা নাটকই নয়—এই জন্যই এ নাটক অবলম্বন করে অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখান কঠিন—তৎসত্ত্বেও শিশিরবাবু নিজের ক্ষমতার জোরে এ বইটিকেও চালিয়ে দিতে পেরেছেন। তুমি আমার কাছ থেকে এসব কথা শুনেছ বলে লিখে দিতে পার। ইতি ১২ই ভাদ্র ১৩৩১।

রবিদাদা

এই চিঠি পেয়ে মণিলাল 'নাচঘর'-এ (২০শে ভাদ্র, ১৩৩১) লিখলেন :—

"শোনা যাচ্ছে মনোমোহন নাট্যমন্দিরের সীতা অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ তার বিশেষ নিন্দা করেছেন—এই রকম একটা গুজব শহরে চালাবার চেষ্টা চলেছে। এ গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা—রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের নিন্দা করেন নি, একথা আমি ভালোরকম জানি, তাই এই প্রতিবাদ লেখবার সাহস করছি। রবীন্দ্রনাথ যেদিন সীতা অভিনয় দেখতে যান, সেদিন সমস্তক্ষণ অভিনয়ের শেষপর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে ছিলুম। বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে তিনি এই অভিনয় সম্বন্ধে আমার সঙ্গে অনেক রকম আলোচনা করেছিলেন, মাঝে মাঝে এ-পাশ ও-পাশ থেকে দুই-চারিটি কৌতূহলী উদ্যত গ্রীবা আমাদের এই আলোচনার সারটুকু ছোঁ-মেরে নেবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কি এবং কতটুকু নিতে পেরেছিলেন তা আমি ঠিক জানি না। খুব সম্ভব তাঁদের এই আধশোনা ও আধবোঝার ধাঁধার ভিতর থেকেই নানারকম কাল্পনিক জনরবের সৃষ্টি হয়েছে।

"রবীন্দ্রনাথ সীতা-অভিনয়ের নিন্দা করেছেন এই রটনা যখন প্রথম আমার কানে আসে, তখন কবিকে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলুম যে, তিনি কারো কাছে এই অভিনয়ের নিন্দাবাদ করেন নি। বরং অভিনয় ভালোই হয়েছে এমনিতর অভিমতই তিনি প্রশ্নকারীদের কাছে প্রকাশ করেছেন। কোন কোন অংশ তাঁর খুবই ভাল লেগেছে, এমন কথা তিনি আমাকে সেই অভিনয়-রাত্রেই জানিয়েছিলেন। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, নাচগান

সুন্দর ও সুরুচিসঙ্গত হয়েছে, এ অভিমতও তিনি প্রকাশ করতে হন নি।

"শিশিরকুমার বাংলা রঙ্গমঞ্চের উন্নতির উদ্যোগে লেগেছেন—এই ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের নাট্যকলার পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ শুভ লক্ষণ বলে মনে করেন। সেইজন্যে সীতা অভিনয়ে তিনি কতটুকু কি করে তুলতে পেরেছেন তাই দেখবার আগ্রহে তিনি সেদিন মনোমোহন নাট্যমন্দিরে গিয়েছিলেন নইলে বাংলা থিয়েটার দেখবার তাঁর কোনরকম উৎসাহই নেই তা আমি ভালরকম জানি। শিশিরকুমারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা আস্থা স্থান লাভ করেছে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাই তিনি শিশিরকুমারকে তাঁর নিজের বাড়িতে ডেকে এনে অভিনয় ও নাট্যকলা সম্বন্ধে নানা পরামর্শ ও উপদেশ দেবার আগ্রহ অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। কেবলমাত্র সীতা অভিনয়টি ভাল কি মন্দ হল, খুঁত আছে কি নিখুঁত হয়েছে এমনিতর খুঁতখুঁতে মত জ্ঞাপন করে রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হতে চান নি, ভবিষ্যতে শিশিরকুমারের যাত্রাপথকে সুনির্দিষ্ট করবার যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়ে তিনি যে স্নেহটি প্রকাশ করেছেন, সেইটেই শিশিরকুমারের পক্ষে তাঁর সাফল্যের সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট বলে মনে করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে আমাকে লিখেছেন—তুমি লিখে দিতে পার যে, শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগ-নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই-একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বিরুদ্ধপক্ষ এর জবাবে লিখলেন :—

"আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ সীতা অভিনয় দেখিয়া আদৌ তুষ্ট হইতে পারেন নাই। নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে মণিলালবাবুর চিঠির প্রতিবাদ করেন নাই। তবে এ লইয়া আর বাড়াবাড়ি করিলে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইবেন।"

নাচঘর লিখলেন :—

"গুটি কয়েক পত্রিকা আমাদের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এমন কি ছাপার হরফে অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত প্রয়োগ করেছেন। এজন্য আমরা আশ্চর্য হই নি।...

"কিন্তু এখন দেখছি এঁরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ওপরেও নানা প্রকারের বাণ নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছেন। পত্রবিশেষে এই সম্পর্কে

রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববরেণ্য কবির প্রতি এইরকম অসম্মান কোন্ শ্রেণীর মনস্তত্ত্বের পরিচয় দেয় সাধারণই তার বিচার করবেন।"

এর পর নাচঘর ঘোষণা করলেন ঃ—

"নাচঘরে রবীন্দ্রনাথের পত্রের সঙ্গে মণিলালবাবুর যে উক্তি বেরিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যদি কেউ তার প্রতিবাদ আনতে পারে আমরা তাকে নগদ হাজার টাকা পুরস্কার দেব।"

উপায়ান্তর না দেখে প্রতিপক্ষ চুপ করে গেলেন। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ বিদেশযাত্রার পূর্বে মণিলালকে আর এক চিঠিতে লেখেন ঃ—

মণিলাল, আমি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম যে, সীতা অভিনয়ের পর আমার নাম নিয়ে কোন কোন লোক শিশির ভাদুড়ীর নিন্দা রটনা করছে। যদি প্রয়োজন হয় তুমি জানাতে পার যে তাদের কারো সঙ্গে আমার কোনো প্রকার আলাপ মাত্রই হয় নি—এবং শিশিরকে আমি ক্ষমতাশালী লোক বলেই জানি।

আমি শীঘ্রই বিদেশে যাচ্ছি—আশঙ্কা হচ্ছে আমার অনুপস্থিতিকালে এইরূপ মিথ্যা রটনা প্রশ্রয় পাবে। তোমার উপর ভার রইল তুমি এদের মিথ্যাচরণের প্রতিবাদ করবে। ইতি ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমল হোম লিখেছেন, "Rabindranath once told me that the acceptance of Sisir as an actor and producer by the public of Bengal was much quicker than it was in his case as a poet and man of letters."

নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় 'সীতা' নাটকের অভিনয় দেখে শিশিরকুমারকে আশীর্বাদ জানালেন। তিনি লিখলেন ঃ—

"যেদিন প্রথম তোমার আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম মনে হইয়াছিল তাদৃশ সুন্দর আবৃত্তি আমি আর কাহারও নিকট শুনি নাই, আমার সে ধারণা আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহার পরে যেদিন 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে তোমাকে চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করিতে দেখিলাম, সেদিন মুগ্ধ হইলাম, ভাবিলাম, অভিনয়-

কলা কেবল প্রতীচীরই নিজস্ব নহে, প্রাচ্যদিকবাসীও চেষ্টা করিলে উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখাইতে পারে, আলমগীরের ভূমিকায় তোমার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছি।

"শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর রচিত 'সীতা' নাটকের অভিনয় যখন আরম্ভ হইল, আমার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে সেই অভিনয়ের প্রশংসা শুনিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল আমার বন্ধুগণ তোমার প্রাপ্য যশের পূর্ণভাগ দেন নাই, কার্পণ্য করিয়াছেন ; রামের ভূমিকায় যাহা তুমি দেখাইয়াছ, তাহা যথার্থই মনোমুগ্ধকর ; অভিনয়-কালে তোমার হস্ত-পদাদির চেষ্টা, নাটকের ভাবানুযায়ী মুখ-চক্ষুর ভঙ্গী, অপর পাত্র-পাত্রী গণের কথোপকথন সময়ে তোমার মূক অভিনয়, এ সমস্তই অপূর্বসুন্দর ও দর্শকের চিত্তহারী। বাঙলার সমস্ত রঙ্গমঞ্চে যেদিন তোমার ন্যায় কলানিপুণ অভিনেতৃগণের আবির্ভাব হইবে সেদিন রঙ্গমঞ্চ আনন্দ ও শিক্ষার গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে পরিণত হইবে।...

"...গ্রন্থকর্তা তাঁহার নাটকে রামচন্দ্রকে সীতাবিরহে অতিমাত্র কাতর করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, তোমার অভিনয়ের মধ্য দিয়া রামের সেই মানবোচিত বিরহ কাতরতা সুসঙ্গতরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।...

"রঙ্গমঞ্চের অভিনব ব্যবস্থা তোমার কল্পনা কুশলতা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক ; নেপথ্য হইতে মঞ্চপ্রবেশের ও তথা হইতে প্রস্থানের নির্দিষ্ট পথ উঠাইয়্য দিয়া যে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনোরম হইয়াছে।

"কদলীবৃক্ষরোপণ, শঙ্খধ্বনি, ধূপধূনা, পুষ্পবৃষ্টি এ সমস্তই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং যে কালের ব্যাপারে অভিনয় করিতেছ, সেই কালোপযোগী হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। পাত্রপাত্রীগণের আভরণ পরিচ্ছদ প্রভৃতি সামগ্রীও কালোপযোগী এবং নয়নের তৃপ্তিপ্রদ। অপরাপর পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অভিনয়ে উৎকর্ষ সাধনের অবসর রহিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

"তুলনা সর্বথা পরিহার করাই কর্তব্য। কিন্তু নিজের অন্তরে যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা বলিতে হইলে আমাকে বলিতে হইবে যে তোমার অভিনয় দক্ষতা যে কোনও দেশের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতৃগণের দক্ষতার সমতুল্য ; আমাদের দেশে তোমা অপেক্ষা অভিনয়কুশলী নট আমি দেখি নাই।

আশীর্বাদ করি তুমি রঙ্গমঞ্চের উৎকর্ষসাধন-ব্রতে সফলকাম হও এবং অভিনয় দর্শনার্থিগণের চিত্তে সৌন্দর্যের অনুভূতি তোমার অভিনয় দর্শনে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকুক।"

'সীতা'-র অভিনয় ও প্রযোজনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছিলেন: "গত ৭ই ভাদ্র শনিবার মনোমোহন নাট্য মন্দিরে 'সীতা' দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রায় ২০।২২ বৎসর গত হইল, ব্যবসায়ী থিয়েটার দেখি নাই, অনেকের মুখে 'সীতা' অভিনয়ের কথা শুনিয়া দেখিতে গিয়া বুঝিলাম, যদি না যাইতাম নয়ন-মনকে বঞ্চিত করা হইত। দেওয়ান বাহাদুর ডাক্তার হীরালাল বাবু, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বসু ও আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে বসিয়াছিলাম, আদ্যন্ত অশ্রুধারে ভাসিয়াছিলাম। এই পরিণত বয়সে মনে হয়,—বাঙলায় নাট্যমন্দিরে এমন-ই ভাবে কেন অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয় না? 'সীতা'র—রাম, সীতা, লব ও তুঙ্গভদ্রার তুলনা নাই. কথার চেয়েও নীরব দৃষ্টিতে, উচ্ছ্বাসের কম্পনে যে ভাব ও রসের স্ফূর্তি কত অনুপম অপূর্ব হইতে পারে তাহা এতকাল অলঙ্কার শাস্ত্রে পড়িয়াছি ও পড়াইতেছি, কিন্তু সেইদিন প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, এ কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বাল্মীকির অভিনয় দর্শনে সকলে অবাক হইলাম। আর্য-ভাবের অভিব্যক্তি মানুষের দ্বারা এর চেয়ে উত্তম হইতেই পারে না। বায়োস্কোপের এই মহামারির দিনে আমাদের মেয়েরা যদি এই সকল পৌরাণিক অভিনয় দেখেন,—ধ্রুব বিশ্বাস, তাঁদের পুরাণের গল্প আর পুরান বলিয়া মনে হইবে না, পক্ষান্তরে পরোক্ষভাবে বিপন্ন বাঙ্গালীর সমাজের বাতাস পরিবর্তিত হইবে।

"রাম ও সীতার অভিনয় দর্শনের সময় মধ্যে মধ্যে ভাবিতেছিলাম ভারতবর্ষ দিন দিন কত বড় সম্পদ হইতে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে, কত বড় আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে! সীতা যে সত্যিকার একজন মানুষের দ্বারা অভিনীত হইতে পারে, তাহা ইহার পূর্বে জানিতাম না। স্বয়ং শিশিরকুমার রামের ভূমিকায় দর্শকগণের চিত্তে একটা বিষাদের একটা স্থায়ী ছাপ আঁকিয়া দিয়াছেন। যখন নির্বাসিতা সীতার পুত্র লবের কণ্ঠস্বর শ্রবণে চমকিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া রাম অবশভাবে ভরতকে জড়াইয়া ধরিলেন, তখন অতিবড় পাষাণেরও বুক ফাটিয়া গিয়াছিল, মহিলামণ্ডলীর

মধ্যে রোদনের রোল পর্যন্ত শোনা গিয়াছিল। এত সুন্দর অভিনয়ের অবতারণা ও প্রচলন করিয়া শিশিরকুমার বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এখন বুঝিতেছি যে,—কেন একক্রমে ৪।৫ ঘণ্টাকাল কবিবর রবীন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ প্রাণে বসিয়া সেদিন সীতার অভিনয় দেখিয়াছিলেন।

"সাজ-সজ্জার নির্মানে ও নির্বাচনে শিশিরকুমার ভারতের সনাতন ও নয়নরঞ্জন প্রাচীন পরিচ্ছদ-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া অভিনয়-কলার সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। নৃত্য-দর্শনের সময়ে ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া সেই প্রাচীন যুগের কপোতহস্তিকা, দ্বিপাদিকা প্রভৃতি ভারত-নাট্য-সূত্রের নৃত্যাদি সমূহ ইঁহারা অভ্যাস করাইলেন! সারা অভিনয়টির মধ্যে (জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে) একটা প্রাচীনত্বের ছায়া আদ্যোপান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে; নবীন পাত্রগণের দ্বারা অতি প্রাচীন ভাব এত সুন্দর ভাব করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শিশিরকুমারকে শত শত ধন্যবাদ।

"নাট্যালয়ে বাঙ্গালীর গৌরব শিশিরকুমারের সবই খাঁটি বাঙলার জিনিস। এ, বি, সি, ডির বদলে ক, খ, গ, ঘ চিহ্নিত দরজা। প্রত্যেকের পৃথক আসন। বিলাতী কনসার্টের বদলে সেই প্রাণমাতানো দেশী রোসনচৌকি সমস্ত চোখ বুজিয়া উপভোগের বিষয়।"

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক রবিবারে এসে 'সীতা' দেখে গেলেন। এক বিরাট শিল্পীর চোখে আর এক বিরাট শিল্পীর সৃষ্টি কৌশলের রহস্যটি ধরা পড়ল। সেইটি তিনি 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদককে একটি চিঠি লিখে জানালেন। অবনীন্দ্রনাথের চিঠিটি উদ্ধৃত করে দিলাম :—

"শুনবেন—গত রবিবারে শিশিরবাবুর মনোমোহন নাট্যমন্দিরে গিয়ে সীতাভিনয় কেমন দেখলেম ?—ভালই দেখলেম—কেন না মন্দ দেখতে পাব এটা যদি বোধ করতেম তো যেতেমই না, কিন্তু এই যে ভাল দেখলেম শব্দটি হাতের লেখার মধ্যে দিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছে এটাতে আমি কতখানি যে ভাল দেখলেম তা বোঝাই তো গেল না। ঐ কথা দুটো যদি কোনদিন এখানে এসে আমার মুখে শুনে যেতেন, তবে বুঝতেন কতখানি ভাল লেগেছে সেদিনকার সমস্ত অভিনয়টি। লেখার মধ্যে বাঁধা পড়লে শুধু যে কথাটা নির্জীব হয়ে যায় তা নয়, অনেক সময় পাঠকের পড়ার দোষে কথাটার উল্টো অর্থ হয়ে পড়ে, সুতরাং 'শতং বদ মা লিখ', এটা পণ্ডিতেরা বুঝে-সুঝেই উপদেশ দিয়েছেন, অথচ আপনারা চাচ্ছেন লেখার মধ্যে দিয়ে শুনতে

আমার মনের কথা। ভাল তাই হোক, কেউ উল্টা বুঝলে দায় দোষ আপনাদের।

"সে বছরে আমি আর একদিন কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে গিয়ে আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় শিশিরবাবুর অভিনয় দেখার সুযোগ পেয়েছিলেম। সেবারে দেখেছিলেম শিশিরবাবু একা সমস্ত অভিনয় ব্যাপারটি পরিপূর্ণ করে আছেন, তাঁর সহচর নেই, সমকক্ষ অভিনেতাও নেই, সেবারের রঙ্গমঞ্চে। এবারে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে গিয়ে দেখলেম যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীকে শিশিরবাবু নিজের হাতে গড়ে তুলছেন,—আস্তে আস্তে তাঁরা যাতে তাঁর সমকক্ষতা করতে পারেন, তার কারণে নিজের অভিনয়পটুতা তিনি ইচ্ছা করেই সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে অন্যের অভিনয়টিকে অনেকখানি ফুটে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছেন। বড় যে, সে ছোটদের কল্যাণ কামনা করে নিজের বৃহৎ আওতা অনেকখানি সরিয়ে নিয়েছে, এটুকু আমার কাছে ভারি নূতন লাগল। ইতিপূর্বে বাংলার কোন রঙ্গালয়ের কর্তারা এমন করে নিজেকে একপাশ করে রেখেছেন দেখেছি বলে তো মনে হয় না। যে গড়ছে, সে যদি যাকে গড়লে তাকে আড়াল করে নিজেই এগিয়ে দাঁড়ায়, সে যে নিজেরই পায়ে নিজে কুড়ুল মারে একথাটা কেবল যাঁরা সত্যিই রসিক তাঁরা বোঝেন এবং সেই বুঝে কাজও করে চলেন ; তথা কথিত রসিক তারা এটা বোঝে না, শুধু মুখে বলে। প্রখর আলোর মত প্রতিভা যখন সম্পূর্ণ প্রকাশ পেতে চাচ্ছে, তখন কাঁচা অভিনেতা অভিনেত্রীদের খাতিরে তার উপরে আবরণ টেনে রাখতে যে কতখানি ধৈর্য এবং শক্তি ব্যয় করতে হয় বড় অভিনেতাকে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ সীতাভিনয়ের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শিশিরবাবুর চলাবলার মধ্যে আমি লক্ষ্য করে এসেছি। এক এক সময়ে তাঁকে দেখে মনে হল বুঝি এবারে বাঁধ ভাঙে মন আর বাগ মানে না। অভিনয় ব্যাপারে যারা নতুন, যারা ছোট তাদের উপরে এই মমতা অত্যন্ত মধুর ঠেকল আমার কাছে। চারুচন্দ্র নিপুণ চিত্রকর, তিনি দৃশ্যপট সাজগোজ যত্নে রচনা করলেন, অভিনয়কে প্রাধান্য দিতে গেলে নিশ্চয় দৃশ্যপটগুলিকে অনেকটা পিছনে রাখা দরকার, সেখানেও দেখলেম শিশিরবাবু অনেকটা বড় জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন দয়া করে চারুবাবুকে। প্রথম দৃশ্যেই এটা চোখে পড়ল আমার, তারপর যখন দুর্ম্মুখ প্রবেশ করলেন তখন এটা আরোও স্পস্টতর হয়ে উঠলো। দুর্ম্মুখকে সাজসজ্জায় শিক্ষাদীক্ষায় অভিনয়ের চাতুর্যে

একেবারে নিখুঁত করে ছেড়ে দিয়েছেন শিশিরবাবু, অথচ নিজের বেলায় তিনি সবদিক দিয়ে একটুখানি ঢিলে দিয়ে বসে আছেন। রচয়িতাকে অনেকখানি আবরণ করে রচনা বর্তমান হলে যা হয় ঠিক সেইটি হল সেদিনকার রামের পাশে অতি চমৎকার এই দুর্ম্মুখের রচনা। এই দুর্ম্মুখকে যখন আর একটা দৃশ্যে দেখলেম রামের কাছে মণিমালা ভিক্ষে চাচ্ছে, তখন শিশিরবাবুর অপূর্ব প্রতিভার পরিপূর্ণতা চকিতের মত দেখা দিলে—হিমালয়ের চূড়া থেকে একটুখানি দাক্ষিণ্য যেন ঝরে পড়ল মুক্তা-নির্ঝরের ছলে পায়ের তলায় যে মহারণ্য পড়ে রয়েছে তার দিকে।

"কি অভিনয় করার দক্ষতা, কি অভিনয় শিক্ষা দেবার ক্ষমতা দুইদিক দিয়ে শিশিরবাবুর পরিচয় নেবার সৌভাগ্য হয়ে গেল আমার সেদিন, এবং এটার জন্যও তাঁকেই আমার ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে। তিনি যদি নিজের রচনা সীতা, তুঙ্গভদ্রা, দুর্ম্মুখ ইত্যাদি সবাইকে একেবারে নিখুঁত ভাবে তৈরি করে নিয়ে তবে আমাকে ডাকতেন তো একটা মস্ত আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতেন, এবং তাঁর নিপুণ সৃষ্টিকৌশলের রহস্য ধরবার অবসর আমার অদৃষ্টে ঘটা সম্ভবও হত না।

"প্রথম দৃশ্যের একটি ঘটনা আমার কাছে বড় সুন্দর লাগল। সীতা যেখানে রামচন্দ্রের কাছ থেকে আশীর্বাদের মত বনবাস-দুঃখ অঞ্জলি ভ'রে গ্রহণ করছেন এই ছবিখানির মধ্যে আমি যে শুধু রামসীতাকে দেখতে পেলেম তা তো নয়, আমি দেখলেম, গুরুর কাছে শিষ্য, বড়র কাছে ছোট নিজের কৃতজ্ঞতার ফুল করপুট ভরে নিয়ে এল, নূতন প্রণতি দিলে উত্তম ও নূতনতমকে।"

'সীতা' নাট্যাভিনয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নবযুগের উদ্বোধন করল। এই প্রসঙ্গে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা 'নবযুগের উদ্বোধক শিশিরকুমার' নামক প্রবন্ধের অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :—

" 'সীতা' নাট্যাভিনয় যে যে কারণে বাংলা নাট্যজগতে যুগান্তরের অভিজ্ঞান হয়ে থাকবে, 'বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার' গ্রন্থে আমি তা বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা করেছি। যাঁরা তা পাঠ করেন নি, তাঁদের জন্যে কারণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি :

১। আগাগোড়া একই ভঙ্গী অনুসারে একসুরে বাঁধা নূতন আদর্শের অভিনয়।

২। পাদপ্রদীপের ব্যবহার বন্ধ। স্বভাবত আলো আসে উপর থেকে এবং এপাশ ওপাশ দিয়ে। পাদপ্রদীপের আলো নীচেথেকে ওঠে ওপরে। তাই পাদপ্রদীপ নিবিয়ে 'সীতা'র প্রত্যেক দৃশ্যে স্বাভাবিক আলোর ব্যবস্থা করে বাংলা রঙ্গালয়ে সর্বপ্রথমে আলোকপাত কৌশলের নিদর্শন দেখান হয়।

৩। ঐকতান বাদন বন্ধ। বাংলা রঙ্গালয়ের ঐকতান বা 'কনসার্ট' নাটকীয় ক্রিয়ার সহগামী ছিল না, বরং অনেকক্ষেত্রেই ছিল তার পরিপন্থী। তার পরিবর্তে প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতের ব্যবস্থা। এও ছিল অভাবিত।

৪। পিছন থেকে টেনে তোলা সমতল ক্ষেত্রে আঁকা দৃশ্যপটের ব্যবহার তুলে দেওয়া। 'সীতা'র ঘর বাড়ি ছিল সত্যিকার ঘরবাড়ির মত, তার প্রত্যেক দরজার ভিতর কিংবা নগর বা অরণ্যের পথ দিয়ে প্রমাণ আকারের মত মানুষ আনাগোনা করতে পারত। আগে এমন দৃশ্য সংস্থান দেখা যায় নি।

৫। নাট্যক্রিয়ার অনুসারী যুগোপযোগী গানের সুর এবং নৃত্যে নূতন ধারা —প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে নৃত্যভঙ্গী গ্রহণ বাংলা রঙ্গালয়ে অভূতপূর্ব।

৬। আগাগোড়া প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রামাণিক স্থাপত্য ও সাজ-পোশাক এই প্রথম।

৭। সংলাপে শব্দের অর্থ বুঝে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন।

৮। মঞ্চের উপরে অবস্থানকালে সংলাপ না থাকলেও কোন অভিনেতাই স্থির বা আড়ষ্টভাবে থাকবে না—উপযোগী ভাবাভিনয় দ্বারা নাটকীয় ক্রিয়াকে সাহায্য করবে। 'সীতা'র শেষ দৃশ্যে মঞ্চের উপরে দেখা যেত শতাবধি নটনটীকে,—তাদের অধিকাংশেরই মুখে কথা ছিল না বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গে ছিল ভাবের অভিব্যক্তি। আগেকার নাট্যশিক্ষকরা এদিকে বড় দৃষ্টি দিতেন না।

এই সঙ্গে আরো কয়েকটি নূতনত্বের জন্য 'সীতা' নাট্যাভিনয়কে বাংলা নাট্যজগতে সকলে অনন্যসুলভ বলে গ্রহণ না করে পারে নি। 'সীতা' পালা খোলার আগে—এমন কি গিরিশ-যুগেও—আমাদের রঙ্গালয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রয়োগপটুতা দেখা যায় নি। অধিকন্তু আগে এখানে সকলের উপরে প্রয়োগকর্তা বলে কোন স্বাধীন কর্মীর অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না। শিশিরকুমারই হচ্ছেন বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম প্রয়োগকর্তা।

'সীতা' যে অভিনব ও নবযুগের উদ্বোধক হতে পেরেছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, ঐ পালাটি খোলবার সময়ে শিশিরকুমার পেশাদার বাংলা

রঙ্গালয়ের অচলায়তনের সঙ্গে সংযুক্ত কোন কর্মীর কাছ থেকে সহযোগিতা প্রার্থনা করেন নি। তিনি নিজে আনন্দলাভ করতেন সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক-শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনা করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রতিদিন 'ভারতী'র সাহিত্য-বৈঠকে নিয়মিত ভাবে যোগদান করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসতেন। 'ভারতী'র বিখ্যাত বৈঠকের শোভাবর্ধন করতেন কেবল উচ্চশ্রেণীর কবি ও ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকারবা নন—সেই সঙ্গে সেখানে উপস্থিত থাকতেন অন্যান্য শ্রেণীর সাহিত্যরসিক শিল্পীরাও। শিশিরকুমারের সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে সেখান থেকেই এলেন দৃশ্যপটচিত্রকর, গীতিলেখক, সুরশিল্পী ও নৃত্যপরিকল্পক। উপরন্তু পরিচালনায় সর্বসময়ে সর্ববিষয়ে শিশিরকুমারকে অতিশয় উল্লেখ্য সাহায্য করেছিলেন 'ভারতী'র নাট্যকলাপ্রিয় সম্পাদক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

'সীতা'র কুশীলবদের নির্বাচনের সময়েও শিশিরকুমার তখনকার চলতি থিয়েটারের নামজাদাদের দিকে ফিরে তাকান নি। নিজে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে তুলেছিলেন এমন একদল নবীন শিল্পীকে, যাঁরা কেবল তাঁরই মুখরক্ষা করেন নি, পরের যুগে প্রত্যেকে বাংলা রঙ্গালয়ে লাভ করেছিলেন রীতিমত উচ্চাসন। মানুষ কি নশ্বর জীব! 'সীতা'র প্রধান ভূমিকায় যেসব নবীন শিল্পী অভিনয় করে যশস্বী হন, তাঁদের কেহই আজ ইহলোকে বিদ্যমান নেই।

আমার জীবনে আর কারুকেই আমি শিশিরকুমারের মত নিখুঁতভাবে নাট্যাচার্য্যের কর্তব্যপালন করতে দেখি নি। তাঁর হাতে পড়লে অকৃতীও হয়ে উঠত কৃতী। বারংবার তিনি নূতন নূতন দল গড়েছেন, কিন্তু কখনও খ্যাতিমানদের নিয়ে মাথা ঘামান নি, পরম আনন্দে কচি ও কাঁচাদের বেছে নিয়ে নিজের অপূর্ব শিক্ষার যাদুমন্ত্রে দুদিনেই পরিপক্ক করে তুলেছেন এবং তাঁর এই শেখাবার ক্ষমতা দেখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিরাও রীতিমত বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। অনেকেরই মনে প্রশ্ন জেগেছে—অভিনেতা শিশিরকুমার শ্রেষ্ঠ, না নাট্যশিক্ষক শিশিরকুমার শ্রেষ্ঠ?"

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন: "নাট্যাচার্যের রিহার্সাল দেখবার, জানবার, শেখবার, বোঝবার বিষয় ছিল।...রিহার্সালের সময় দেখেছি কোন কাব্যাংশ তিনি সকালেও বলাচ্ছেন, বিকেলেও বলাচ্ছেন,

আবার রাত দুপুর পর্যন্তও বলাচ্ছেন। কিছুতেই তাঁর মন খুশি হচ্ছে না… শিশিরকুমার খুব সহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। কিন্তু রিহার্সালের সময় তাঁর ধৈর্যের প্রগাঢ়তা দেখে কতই না বিস্মিত হয়েছি। এমনও হতে দেখেছি তাঁর নিজের অভিনেয় অংশটুকু ছাড়া গোটা বইখানিই, বারবার প্রতি অভিনেতা অভিনেত্রীকে বলিয়ে বলিয়ে, তিনি মুখস্ত করে ফেলেছেন।"

গিরিশ-যুগের নাট্য-সম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী বলেছেন—"গিরিশবাবুর রিহার্সালও দেখেছি, ভাদুড়ী বাবারও দেখছি। এমন শেখাবার কৌশল তাঁর ছিল না।…এমন করে মনের দুয়ার গিরিশবাবু খুলে দিতে পারতেন না।"

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য উত্তরকালে লিখে গেছেন ঃ "নাট্যশালার দুজন প্রযোজককে আমি জানি। প্রথম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয়—শিশিরকুমার ভাদুড়ী। এই তালিকায় তৃতীয় জনের প্রতীক্ষায় আছি।"

শিশিরকুমারের 'রাম'-এর ভূমিকায় অভিনয় সম্পর্কে অধ্যাপক চারুচন্দ্রের অভিমত ঃ "অভিনয়ে শিশিরকুমার অতুলীয়—a class by himself·· লব-কুশের উক্তি শুনে রাম-বেশী শিশিরকুমার যখন চমকিত হয়ে বললেন,—সেই কণ্ঠস্বর, তখন দর্শকও সঙ্গে সঙ্গে চমকিত হল, আর আজও সেই দুটি কথা তার কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের চোখে শিশিরকুমার 'শিল্পাদিত্য'। শিশিরকুমার 'রাম'-এর ভূমিকায় অভিনয়ে যে-লোককালাতীত বেদনার ব্যঞ্জনা আনলেন তাকে কাব্যে প্রকাশ করতে হলো তরুণ অচিন্ত্যকুমারকে। সেদিনের অনুভূতি বাণীবদ্ধ করেছেন অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে। অচিন্ত্যকুমার লিখছেন ঃ

"ইডেন গার্ডেনে একজিবিসনের তাঁবু ছেড়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই সময়ে মনোমোহনে 'সীতা' অভিনয় করছেন, আর সমস্ত কলকাতা বসন্ত-প্রলাপে অশোক-পলাশের মত আনন্দ-উত্তাল হয়ে উঠেছে। কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বাণবিদ্ধ করার দরুণ বাল্মীকির কণ্ঠে যে-বেদনা উৎসারিত হয়েছিল, শিশিরকুমার তাকে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে বাণীময় করে তুললেন। সমস্ত কলকাতা শহর ভেঙে পড়ল মনোমোহনে। শুধু অভিনয় দেখে লোকের তৃপ্তি নেই। রাম নয়, তারা শিশিরকুমারকে দেখবে, নরবেশে কে সে দেবতার দেহধারী, তার জয়ধ্বনি করবে, পারে তো পা স্পর্শ করে প্রণাম করবে তাঁকে।

"সে সব দিনের 'সীতা' জাতীয় মহাঘটনা, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'য়

হস্তক্ষেপ করল প্রতিপক্ষ, কুছ পরোয়া নেই, যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হল নতুন বই। রচনা তো গৌণ, আসল হচ্ছে অভিনয়, দেবতার দুঃখকে মানুষের আয়তনে নিয়ে আসা, কিংবা মানুষের দুঃখকে দেবত্বমণ্ডিত করা, শিশিরকুমারের সে কি ললিতগম্ভীর রূপ, কণ্ঠস্বরের সে কি সুধাতরঙ্গ। কতবার যে সীতা দেখেছি তার লেখাজোখা নেই ; দেখেছি অথচ মনে হয় নি দেখা হয়েছে। মনে ভাবছি, জন কিটসের মত অতৃপ্ত চোখে তাকিয়ে আছি সেই গ্রীসিয়ান আর্মের দিকে আর বলছি : A thing of Beauty is a joy for ever.

"কিন্তু কেবলই কি দু-তিন টাকার ভাঙা সিটে বসে হাততালি দেব, একটিবারও কি যেতে পারব না তাঁর সাজঘরে, তাঁর অন্তরঙ্গতার রংমহলে? যাবে যে, অধিকার কি তোমার? তাঁর অগণন ভক্তের মধ্যে তুমি তো নগণ্যতম। নিজেকে শিল্পী, সৃষ্টিকর্তা বলতে চাও? বলতে চাও, সেই অধিকার? তোমার শিল্পবিদ্যা কি আছে তা তো জানি, কিন্তু দেখছি বটে তোমার আস্পর্ধাটাকে, তোমাকে কে গ্রাহ্য করে? কে তোমার তত্ত্ব নেয়?

"সব মানি, কিন্তু এত বড় শিল্পাদিত্যের আশীর্বাদ পাব না এটাই বা কেমনতর?

"তেরোশো বত্রিশ সালের ফাল্গুনে 'বিজলী' দীনেশরঞ্জনের হাতে আসে। তার আগে সাবিত্রীপ্রসন্নের আমলেই নৃপেন 'বিজলী'তে নাট্যসমালোচনা লিখত। সে সব সমালোচনা মামুলি হিজিবিজি নয়, নয় সেটা ব্যবসাদারি চোখের কটাক্ষপাত। সেটা একটা আলাদা কারুকর্ম। নৃপেন তার আবেগ-গম্ভীর ভাষায় 'সীতা'র প্রশস্তি রচনা করলে—সমালোচনাকে নিয়ে গেল কবিতার পর্যায়ে।

"সে সব আলোচনা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। বলা বাহুল্য, শিশিরকুমারের চোখ পড়ল, কিন্তু তাঁর চোখ পড়ল লেখার উপর তত নয়, যত লেখকের উপর। নৃপেনকে তিনি বুকে করে ধরে নিয়ে এলেন।

"কিন্তু শুদ্ধ শ্রদ্ধাভক্তির কবিতাকে কি তিনি মূল্য দেবেন? চালু কাগজের প্রশংসা প্রচারে কিছু না হয় টিকিট বিক্রির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কবিতা? কেই বা পড়ে, কেই বা অর্থ অনর্থ নিয়ে মাথা ঘামায়? পত্রিকার পৃষ্ঠার ফাঁক বোজাবার জন্যেই তো কবিতার সৃষ্টি। অর্থাৎ পদের দিকে থাকে বলেই তার আরেক নাম পদ্য।

"জানি সবই, তবু সেদিন শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে যে লোককালাতীত বেদনার ব্যঞ্জনা আনলেন তাকেই বা প্রকাশ না করে থাকতে পারি কই? সোজাসুজি শিশিরকুমারের উপর এক কবিতা লিখে বসলাম। আর একটু সাফ সুতরো জায়গা করে ছাপালাম 'বিজলী'তে।

দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিল : সীতা, সীতা, সীতা—
পলাতকা গোধূলি প্রিয়ারে,
বিরহের অস্তাচলে তীর্থযাত্রী চলে গেল ধরিত্রী-দুহিতা
অন্তহীন মৌন অন্ধকারে।
যে কান্না কেঁদেছে যক্ষ কলকণ্ঠা শিপ্রা রেবা বেত্রবতী তীরে
তারে তুমি দিয়েছ যে ভাষা ;
নিখিলের সঙ্গীহীন যত দুঃখী খুঁজে ফেরে বৃথা প্রেয়সীরে
তব কণ্ঠে তাদের পিপাসা।
এ বিশ্বের মর্মব্যথা উচ্ছ্বসিছে ওই তব উদার ক্রন্দনে
ঘুচে গেছে কালের বন্ধন ;
তারে ডাকো—ডাকো তারে—যে প্রেয়সী যুগে যুগে চঞ্চল চরণে
ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন।
বেদনার বেদমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক করিলে সৃজন
আদি নাই, নাহি তার সীমা ;
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব প্রত্যুষ-স্বপন
চিত্তে তব ধ্যানীর মহিমা।

"শিশিরকুমারের সানন্দ ডাক এসে পৌঁছুল—সস্নেহ সম্ভাষণ। ভাগ্যের দক্ষিণ মুখ দেখতে পেলাম মনে হল। দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে চলে গেলাম তাঁর সাজঘরে। প্রণাম করলাম।

"নিজেই আবৃত্তি করলেন কবিতাটা। যে অর্থ হয়তো নিজের মনেও অলক্ষিত ছিল তাই যেন আরোপিত হল সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বরের ঔদার্য্যে, বললেন, 'আমাকে ওটা একটু লিখে টিখে দাও, আমি বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখে দিই এখানে।'

"দীনেশরঞ্জন তাঁর চিত্রীর তুলি দিয়ে কবিতাটা লিখে নিলেন, ধারে ধারে কিছু ছবিরও আভাস দিয়ে দিলেন হয়তো। সোনার জলে কাজ করা ফ্রেমে বাঁধিয়ে উপহার দিলাম শিশিরকুমারকে। তিনি তাঁর ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন।

"একটি স্বজন বৎসল উদার শিল্পমনের পরিচয় পেয়ে মন যেন প্রসার লাভ করল।

... ...

"তারপর থেকে কখনো-সখনো গিয়েছি শিশিরকুমারের কাছে। অভিনয়ের কথা কি বলব, সহজ আলাপে বা সাধারণ বিষয়েও এমন বাচন কানে আর কোথাও শুনিনি। যত বড় তিনি অভিনয়ে তত বড় তিনি বলনে কথনে। তা খৃষ্টধর্মের ইতিহাসই হোক বা সেক্সপিয়রের নাটকই হোক বা রবীন্দ্রনাথের গীতি কাব্যই হোক। কিংবা হোক তা কোন অন্তরঙ্গ বিষয়, প্রথমা স্ত্রীর ভালবাসা। তাঁর সেই সব কথা মনে হত যেন বিকিরিত বহ্নিকণা, কখনো বা মৃগমদবিন্দু। অভিনয় দেখে হয়তো ক্লান্তি আসে, কিন্তু মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত জেগে কাটিয়ে দিতে পারি তাঁর কথা শুনে। তাতে কি শুধু পাণ্ডিত্যের দীপ্তি? তা হলে তো ঘুম পেত, যেমন উকিলের অতিকৃত বক্তৃতা শুনে হাকিমের ঘুম আসে। না, তা নয়। তাতে অনুভবের গভীরতা, কবিমানসের মাধুর্য আর সেই সঙ্গে বাচনকলার সুষমা। তা ছাড়া কি মেধা, কি দীপ্তি, কি দূর বিস্তৃত স্মরণ শক্তি! মুহূর্তেই বোঝা যায় বিরাট এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি—বৃহৎ এক বনস্পতির প্রচ্ছায়ে।"

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার শিশিরকুমারকে 'নট-কবি' আখ্যা দিয়ে সনেট লিখলেন। এই সনেটটি পরে তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দশী' কাব্য-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সনেটটি উদ্ধৃত করছি ঃ—

"বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তোমা হেরিনু যেদিন,
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-মুকুর—
চমকি চাহিনু ঊর্ধ্বে, নিশার চিকুর
দিগন্তের নীলাকাশে হয় যে বিলীন।
হেরিলাম, কলা-লক্ষ্মী আজি এ নবীন
নেপথ্য-লীলায় ধরি' নবতন সুর,
নয়নমোহন কাব্যে নিপুণ নূপুর,
বাজাইতে বঙ্গে আর নহে উদাসীন!
ছন্দ হেথা শরীরী যে, বাক্য হতমান!
শব্দ-অর্থ প্রাণ পায় মূর্ত রস-রাগে!

হৃদয়ের রসাতলে যার অধিষ্ঠান,
নর-কণ্ঠস্বরে তার কি আকৃতি জাগে !
প্রতি অঙ্গ কথা কয় রচনা সমান—,
শ্রোত্র চেয়ে নেত্র তাই কাব্য-সুধা মাগে !"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "তাহার 'সীতা' নাটকে কেবল যে পৌরাণিক জগতের রূপোজ্জ্বল, সম্পূর্ণ পরিবেশ ও যথাযথ ভাব-সমন্বিত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে কেবল তাহাই নহে, সার্বভৌম, যুগ-নিরপেক্ষ মানবিক সুরটিও ধ্বনিত হইয়াছে। পৌরাণিক পরিবেশকে নিখুঁত ভাবে বজায় রাখিয়া তাহার মধ্যে সর্বকালীন মানবহৃদয়ের আর্তি-প্রকাশ-শক্তিই শিশির-প্রতিভার পরিচয়। রামের মর্মবেদনা যে কেবল কোন সুদূর অতীতের এক বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় ও নীতি-নিগড়ে আবদ্ধ দেব-মানবের নহে, তাহা যে সকল দেশের, সকল কালের শোক-দগ্ধ মানবাত্মার অসংবরণীয় রোদনাবেগ তাহা শিশিরের কণ্ঠে শাশ্বত অভিব্যক্তি পাইয়াছে।"

'সীতা'র অভিনয় নাট্য-শিল্পে নূতন ধারা নিয়ে এল। এই প্রসঙ্গেই সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "শিশিরকুমারের 'সীতা'র অভিনয় বাঙলার রঙ্গমঞ্চকে যেন নূতন করে সৃষ্টি করল। অভিনয়ে, প্রয়োগ-নৈপুণ্যে শিশিরকুমার যে বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করলেন, তা একেবারে স্বপ্নাতীত কল্পনাতীত। দৃশ্যসজ্জায়, রূপসজ্জায় অভিনবত্ব, অভিনয়ের অন্তরালে নেপথ্যে বিষয়ানুরূপ আবহযন্ত্রসঙ্গীতের অবতারণা—এবং প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বাভাবিক সংযতভঙ্গী, —এর পূর্বে বাঙলার রঙ্গমঞ্চে ছিল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। রামের ভূমিকায় তিনি দেখালেন—সীতার সঙ্গে রামের কি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সীতার বিরহে রামের অন্তর্গূঢ় বেদনার আভাস—তাঁর অভিনয়কে আগাগোড়া করুণ রসে অভিষিক্ত রেখেছিল। তুঙ্গভদ্রার সেই অভিশাপ-বাণী—তোমার মনের দুঃখ কেহ বুঝিবে না।—এ বাণীর বেদনা তাঁর অভিনয়ে রূপলাভ করে আগাগোড়া দর্শকচিত্তকে উদ্বেল রেখেছিল। তাঁর শিক্ষায় বাল্মীকির ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সীতার ভূমিকায় প্রভা, কুশ ও লবের ভূমিকায় রবি রায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, শম্বুকের ভূমিকায় প্রফুল্ল রায়, তুঙ্গভদ্রার ভূমিকায় নীরদাসুন্দরী—এঁরা যেন নূতন জন্ম নিয়ে নূতন মূর্তিতে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।"

স্বর্গত নরেশচন্দ্র মিত্র তখন আর্ট থিয়েটারের অভিনেতা। 'কর্ণার্জুন'-

নাটকে তিনি 'শকুনি'র ভূমিকা 'জ্বালিয়ে' দিয়েছেন। তিনি 'সীতা' নাটকের উদ্বোধন-রজনীতে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। উত্তর কালে তিনি লিখেছেন: "বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে শিশির সৃষ্ট 'সীতা' নাটকের অভিনয় দেখলাম। ডি. এল. রায়ের সীতা ভাল কি যোগেশ চৌধুরী রচিত সীতা উন্নত ধরণের এ বিচার-ক্ষমতা হারিয়ে গেল অভিনয় দেখতে দেখতে। 'সীতা' নাটকে সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল 'টিম ওয়ার্ক'। একদল শিল্পী এক হয়ে একান্নবর্তী সংসারের বাসিন্দা হয়ে যদি কিছু সৃষ্টি করে, তা হলে তা অসাধারণ হয়ে ওঠে। শিশিরের রাম, প্রভার সীতা, মনোরঞ্জনবাবুর বাল্মীকি আর কৃষ্ণচন্দ্র দে-র বৈতালিক আমার কাছে মূর্ত হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' বৈতালিকের সঙ্গীত। সেই সঙ্গীত শিশিরকুমারের মঞ্চ ছাড়িয়ে আকাশে বাতাসে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।"

'সীতা'র অভিনয় আর প্রয়োগকুশলতা সম্পর্কে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনি লিখেছেন: "সীতা রেকর্ড সৃষ্টি করে রচনার গুণে নয়, প্রয়োগ-নৈপুণ্যের আর অভিনয়ের গুণে। দৃশ্যপটকে, আলো অন্ধকারকে, গানকে আর আবহ-সঙ্গীতকে নাটকের বিকাশে নিয়োগ করে অভিনয়ের ভিতর দিয়ে কি করে নাটকের অলিখিত রূপও ফুটিয়ে তোলা যায় সীতায় তাই তিনি দেখিয়েছিলেন।"

'সীতা' নাটকের বিকাশে আবহ-সঙ্গীতকে কি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল তা 'সীতা' নাটকের আবহ-সঙ্গীত-স্রষ্টা নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর 'নাট্যাভিনয়ে যন্ত্র-সঙ্গীতের স্থান' নামক প্রবন্ধে বিবৃত করেছেন। সেই প্রবন্ধে নৃপেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "নাটকীয় রসকে ঘনীভূত করতে Inidoutel muil বা নাট্য-যন্ত্র-সঙ্গীত যে কতখানি সহায়তা করে তা যাঁদের পাশ্চাত্য নাটক দেখবার সুযোগ হয়েছে, কিম্বা সুহৃদ্বর শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত 'সীতা' যাঁরা দেখে এসেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন। যখন শিশিরকুমার 'সীতা'র রিহার্সাল আরম্ভ করলেন তখন তাঁর অভিনয় ও শিক্ষাদান নিখুঁত হলেও একটা জিনিষের অভাব তখন বোধ করছিলুম। মনে হচ্ছিল সব জিনিষটাই সুরে বাঁধা হয়েছে বটে কিন্তু কোথায় যেন একটা তার ঠিক বাঁধা হয় নি—কি যেন একটা শূন্যতা কোথায় রয়ে গিয়েছে। তখনই মনে হল যন্ত্র-সঙ্গীতের সাহায্যে সেই অপরিপূর্ণতার অভাব হয়তো দূর হতে পারে—হলও তাই। অভিনয়ের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো যেন বাঁশীর সুরে বাঁধা পড়ল। নাট্যকলা-রসিক মাত্রেই

তার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমস্ত অভিনয়টি মাত্র যন্ত্রসঙ্গীতে একটা পরিপূর্ণতা লাভ করলে। বহু দৃশ্যে তখন যন্ত্র-সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হল। শিশিরকুমারের নিজের অভিনয়ও যেন আরও সজীব হয়ে উঠল। একটি দৃশ্যের কথা এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করছি। সীতার বিরহে রামের হৃদয় যখন একটা বিরাট শূন্যতায় ভরে উঠেছে, সেই সময় চতুর্দশ বর্ষ পরে বালক লবের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। সন্ধ্যার ম্লান আলোকে অযোধ্যার প্রাসাদ তখন ম্লানতর হয়ে উঠেছে, দূরে বাঁশীর অস্ফুট করুণ-মূর্চ্ছনায় যেন কার বিরহ-ব্যথা ঝরে প'ড়ছে...এমনিই এক বিষাদের সময়ে বিনাদোষে নির্বাসিতা মাতার বিচার প্রার্থনা করতে ছুটে এল ভিখারী রাজপুত্র লব তার পিতার কাছে। পিতাকে দেখেই তার অভিমান হল, কোন কথা না শুনে পিতার সকাতর আহ্বান উপেক্ষা করে সে যখন ছুটে চলে গেল তখন অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। সে সময় সকলের মূক অভিব্যক্তি যন্ত্র-সঙ্গীতের সাহায্যে যেন মূর্ত হয়ে উঠল। অযোধ্যার প্রাসাদ-সোপানে মূর্চ্ছিত নিস্পন্দ রামের সকরুণ মনোবেদনা তখন বাঁশীর সুরের ভেতর দিয়ে শুধু সেই প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কেঁদে ওঠেনি, প্রত্যেক দর্শকের অন্তর-দ্বারে লুটিয়ে পড়ে তাঁদের প্রাণকেও কাঁদিয়ে তুলেছিল। যে-বেদনা কথার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হত না সেই বেদনা সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলে।"

সর্বশেষে একটি কথার উল্লেখ ক'রে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী এলিয়নোরা দুজে একবার স্টানিস্লাভস্কিকে বলেছিলেন,—"নটশিল্পের মূলমন্ত্র হচ্ছে একই সময়ে সমস্ত মনে রেখে সমস্ত ভুলে যাওয়া—tutto ricordare e tutto dimenticare"। শিশিরকুমার তাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন: "লোকমুখে শুনি, আমি ভাল অভিনেতা। অনেকে বলেন,—আমার অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন,—এবং সময় সময় প্রশ্ন করেন,—'আপনি কি সত্য-সত্যই সীতার বিরহে রামের ভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন?' আমি তাঁহাদের বলি,—সত্য সত্যই ভাবে অভিভূত হইলে—চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোর পরিবেষ্টনের সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। যে মুহূর্তে "লবের" মুখ দেখিয়া আমি "সীতার" কল্পনায় আত্মহারা হইয়া যাই, সেই মুহূর্তেই আমি "লবকে" আমার দক্ষিণপার্শ্বে সরাইয়া নিজের মুখে ঐ পাঁচশো ওয়াট্ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের (Watt Candle Power) সবটুকু আলোর সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ নিজেকে গ্রহণ করিতে হয়। আত্মহারা হইলে কি এটা

সম্ভব হয়? "সু-অভিনয়" মানে "দৃশ্যপট, স্বকীয় পরিচ্ছদ, পারিপার্শ্বিক আলোকসম্পাত,"—সর্ববিষয়ে সজাগ থাকা। এ থাকিতে না পারিলে শুধু "ভাবাহত" হইলে "সু-অভিনয়" করা চলে না।

"'আর্ট' শব্দের অর্থ হইতেছে 'সৃষ্টি' (creation)। স্রষ্টা যদি সজাগ না থাকেন, তাহা হইলে তিনি সৃষ্টি করিবেন কি প্রকারে? প্রত্যেক সু-অভিনেতা, প্রত্যেক "আর্টিস্ট" (Artist) শিল্পী—নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে দুইটি মানুষকে বহন করেন। একজন—যিনি সৃষ্টি করেন, আর একজন যিনি সৃষ্ট হন। একজন "বিচারক"—একজন "কর্মী"। এই দুইয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে সত্যকার আর্টিস্টের জন্ম। এ কথা যিনি না বুঝিবেন, তাঁহার অভিনয় করা বৃথা। কারণ, অভিনেতা শুধু "পাঠক" নহেন, নাট্যকারের ভাষার পুত্তলিকা নহেন। প্রাণবন্ত সজীব সুন্দর দেহভঙ্গী, ভাষার প্রত্যেক "মোচড়ে" ভাবকে জীবন্ত করিয়া তোলা, এই হইতেছে অভিনয়ের অঙ্গ।"

পঁচিশ

এর পর নাট্যমন্দিরে দ্বিতীয় নূতন নাটক খোলা হ'ল দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী'। 'পাষাণী'র প্রথম অভিনয় ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৪। 'পাষাণী' দ্বিজেন্দ্রলালের একখানি বিস্মৃত নাটক। শিশিরকুমারের পূর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে এই নাটক মঞ্চস্থ করতে কেউ-ই সাহসী হন নি। এই নাটক নিয়ে তখন সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। প্রতিপক্ষরা 'পাষাণী'কে 'পুরাণ-বিরোধী' বলে প্রচার করতে লাগলেন। রব উঠলো এই নাটকে হিন্দুধর্মের ভিত্তির উপরে আঘাত করা হয়েছে।

ভূমিকালিপি:—ইন্দ্র ও গৌতম—শিশিরকুমার, চিরঞ্জীব—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বামিত্র—অমিতাভ বসু, শতানন্দ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মদন—জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, রাম—রবি রায়, রতি—উষা, মাধুরী—মনোরমা, অহল্যা—প্রভা।

শিশিরকুমার ইন্দ্র ও গৌতমের ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

ইন্দ্র ও গৌতমের দুটি পরস্পরবিরোধী ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়-সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: "গৌতম ও ইন্দ্র—পাষাণীর এই দুটি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় নিখুঁত হয়েছিল। সুরামত্ত, রূপলুব্ধ ও ভোগ-শেষে

বিগত-কাম অবস্থায় শিশিরকুমারের অভিনয়ে লঘুচিত্ত ইন্দ্রের চিত্র উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক রূপে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, গৌতমের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের সৌন্দর্য সকলে ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। সাধারণ দর্শকরা 'সেন্সেসানাল' না হলে অভিনয় পছন্দ করে না—বিশেষতঃ বাংলা দেশে। ধীর, স্থির, গম্ভীর এবং সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত গৌতমের যে-ধারণা শিশিরকুমার দিয়েছেন, সূক্ষ্মরসের রসিককে তা মুগ্ধ করবে নিশ্চয়ই। এ রকম ভূমিকায় চমকপ্রদ বা চিত্তোত্তেজক অভিনয় রস-বিকাশের পরিপন্থী। শিশিরকুমার এখানে হাততালির মোহ এড়িয়ে নিজের অসাধারণ রূপদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সংযমের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর কলাবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ।

৩রা জুন।

নাট্যমন্দিরে খোলা হল গিরিশচন্দ্রের 'জনা'।

এর আগে এপ্রিল মাসে আর্ট থিয়েটার 'জনা' মঞ্চস্থ করেছেন।

ভূমিকালিপি দিচ্ছি ঃ—জনা—সুশীলাসুন্দরী, মদনমঞ্জরী—নীহারবালা, নায়িকা—আশ্চর্যময়ী, বিদূষক—দানীবাবু, প্রবীর—অহীন্দ্র চৌধুরী। কয়েক রাত্রি পরে দানীবাবু সাজতে আরম্ভ করলেন প্রবীর আর বিদূষক তখন করতে লাগলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী।

'জনা' গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর 'মিনার্ভা'য় এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর প্রধান ভূমিকালিপি দিচ্ছি ঃ—প্রবীর—দানীবাবু, বিদূষক—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, জনা—তিনকড়ি।

গিরিশ-যুগে বিনোদিনীর পর তিনকড়ি ছিলেন মঞ্চরাজ্ঞী। 'লেডি ম্যাকবেথ' ও 'জনা' বলতে তখন তিনকড়িকেই বোঝাত। তিনকড়ির পর তারাসুন্দরী ছিলেন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। প্রাক্ শিশির-যুগে তিনিও 'জনা'র ভূমিকায় তিনকড়ির প্রতিদ্বন্দ্বিনী হতে সাহসী হন নি। শিশিরকুমার তারাসুন্দরীকে সসম্মানে আহ্বান করে আনলেন 'নাট্যমন্দির'-এ 'জনা'র ভূমিকায় রূপ দেবার জন্য। তারাসুন্দরী তখন মঞ্চ থেকে একরকম অবসর নিয়েছেন—বছর তিনেক ধ'রে তিনি আর নামছিলেন না। উত্তরকালে শিশিরকুমার বলেছেন, "আমরা যা মাল পাই নটীদের মধ্যে তাকে পয়মাল

বলে। তবে তারা, কুসুম, চারু, প্রভা—এদের মধ্যে নটীসত্তা দেখেছি পেয়েছি।...ওরা সব ভালো অভিনেত্রী। প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতো। ফাজিল মেয়ে নয়। এ যুগের অভিনয় অনেকখানি ফাজলামি।"

তারাসুন্দরীর অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: "গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে গম্ভীর রসের ভূমিকায় যত অভিনেত্রীকে দেখেছি, তারাসুন্দরীর স্থান নির্দেশ করতে পারি তাঁদের সকলের উপরে। শিল্পী হিসাবে দানীবাবুও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার ও উচ্চারণ ছিল অতি স্পষ্ট, নটের প্রধান যে গুণ দুটির উপরে দানীবাবুর দাবী নেই। দানীবাবুর অভিনয় হত একান্তভাবেই মেলোড্রামাটিক, কিন্তু কি মেলোড্রামায় আর বাস্তব নাটকে তারাসুন্দরী সমান দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারতেন। দানীবাবুর আর্টের মধ্যে পাওয়া যেত একটা আন্তরিকতা ও জন্ম-অভিনেতার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতার পরিচয় এবং তারাসুন্দরীর আর্টের মধ্যে আমরা লাভ করতাম আন্তরিকতার সঙ্গে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও ক্রিয়াশীল মনীষার প্রভাব।...আয়েসা ও রিজিয়ার ভূমিকায় তারাসুন্দরীকে যিনি দেখেন নি, তিনি জীবনের একটি প্রধান উপভোগ্য সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন।"

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "বাংলা রঙ্গমঞ্চের গৌরবাস্পদা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীর যশোমুকুটে অভিনয়-সাফল্যের যতগুলি রত্ন আছে, রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয়-নৈপুণ্য তন্মধ্যে মধ্যমণিস্বরূপে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন এবং এখনও রিজিয়া বলিতে তারাসুন্দরীকেই বুঝায়। এ ভূমিকায় এ পর্যন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইবার সাহসও কেহ করেন নাই।"

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন—"ইউরোপ ও আমেরিকার কোনো রঙ্গমঞ্চে তারার রিজিয়ার অভিনয়ের মতো অভিনয় আমি দেখি নি।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, "তারাসুন্দরীর আশ্চর্য প্রতিভা। ওঁর সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনার ইচ্ছা আছে।"

এ-হেন তারাসুন্দরী নাট্যমন্দিরে যোগদান করলেন।

'জনা'কে কেটেকুটে এডিট্ করে ঢেলে সাজলেন শিশিরকুমার। 'বিদূষক' চরিত্রটিকে বই থেকে কেটে উড়িয়ে দিলেন। এই 'বিদূষক' চরিত্রে এর আগে অভিনয় করে গেছেন অর্ধেন্দুশেখর ও পরে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। আবার সমালোচনার ঝড় উঠল। যুগোপযোগী প্রযোজনার দিকে লক্ষ্য রেখে 'জনা'

পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্তিত হল। এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন: "তার কোন কোন দৃশ্য বা বাক্যাংশ পরিবর্জ্জিত হল, মূল রসকে অধিকতর ঘনীভূত করে তোলবার জন্য। গানে নতুন সুর দেওয়া হল না বটে, কিন্তু পুরাতন সুরকেই এমন সুকৌশলে ব্যবহার করা হল যাতে করে নবযুগের শ্রোতারা তুষ্ট হতে পারে। স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা অনুসারে নাচগুলি নূতনভাবে তৈরি করা হল। সাজপোষাক ও দৃশ্যপটও পরিকল্পিত হল আধুনিক রসানুভূতিকে প্রবুদ্ধ করবার জন্যে। প্রয়োগকর্তা শিশিরকুমার এমনভাবে নাট্যশিক্ষা দিলেন, যার মধ্যে প্রাচীন পরিকল্পনার চিহ্নমাত্র ছিল না। যখন গিরিশযুগে বিখ্যাত তিনকড়ি জনা সাজতেন, তখন এই পালাটির সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু সমগ্রভাবে ধরলে নিশ্চিতরূপে বলতে পারি, নূতন হয়েছিল পুরাতনের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত। তারাসুন্দরী (জনা), শিশিরকুমার (প্রবীর) ও চারুশীলা (নায়িকা) অভিনয়ের দিক দিয়েও অতুলনীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন। নবযুগের জনসাধারণ নূতন 'জনা'কে সাদর অভিনন্দন দিলে বটে, কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের একদল গেলেন ক্ষেপে, 'জনা'কে অঙ্গহীন করে গিরীশচন্দ্রকে অপমান করা হয়েছে বলে তুমুল আন্দোলন করতে লাগলেন।"

আর্ট থিয়েটারও 'জনা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামলেন। তাঁরা বিজ্ঞাপন দিলেন:—

"হেথা অঙ্গহীন নহে বঙ্গ পূর্ব অবয়ব
এসো, দেখো যেই জনা গিরিশ গৌরব।"

প্রতিযোগিতার ফলে দুই থিয়েটারেই 'জনা' দারুণ জমে গেল।

অমরেন্দ্রনাথ রায় সমালোচনা করে লিখেছেন: "বড়ই দুঃখের বিষয়, মনোমোহনে আমরা জনা নাটককে ঐরূপ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় অভিনীত হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। জনার গলায় নির্মমভাবে ছুরি চালাইয়া ভাদুড়ী সম্প্রদায় যে গিরিশ-প্রতিভার লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিয়াছেন তাহা নহে, ইহার ফলে তাঁহাদের অভিনয় অনেক স্থলেই জমিবার অবসর পায় নাই।"

'শিশির'-পত্রিকার মন্তব্য: "বিদূষককে কাটিয়া ছাঁটিয়া খোঁড়া করিয়া যেভাবে স্টেজে বাহির করা হইয়াছে, তাহা না করিয়া তাহার ব্রাহ্মণীর ন্যায় তাহাকেও নাটক হইতে একেবারে বিদায় দিলে বরং ভালো হইত।"

'সার্ভেণ্ট' পত্রিকার মন্তব্য: "In the final scene, for instance,

'Jana' commits suicide in Mr. Bhaduri's play, where as in the original, the Goddess Ganga appears from under the water and takes "Jana" into her bosom.'...

এই সব সমালোচনার উত্তরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় লিখছেন: "We are perfectly sure that had Girish Chandra Ghosh lived upto the present day and tried to reproduce his "Jana", he would have felt the necessity of recasting the book."

'জনা' নাটকে শিশিরকুমারের 'প্রবীর'-এর ভূমিকার অভিনয় সম্পর্কে 'নাচঘর'-এর মন্তব্য: "তিনি তাঁর পূর্ববর্তী প্রবীরের পদাঙ্কের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়েও এই বহুখ্যাত ভূমিকাটির যশ-গৌরব কোথাও ক্ষুণ্ণ করা দূরে থাক, বরং দ্বিগুণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তুলেছিলেন। তাঁর মাতৃসন্নিধানে এসে বীরপুত্রের দুর্জয় অভিমান প্রকাশ, তাঁর প্রিয়তমা পত্নীসকাশে প্রেমের অনবদ্য সহজ লীলা, তাঁর নায়িকার রূপমোহে কামাতুর ও অসহায় অবস্থা, পরিত্যক্ত শ্মশানপ্রান্তে জীবনের ধিক্কৃত মুহূর্তে তাঁর সেই শ্লেষাত্মক 'কৃষ্ণার্জুন' সম্ভাষণ—সবই অনুপম কলানৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে এনেছিল বিমুগ্ধ দর্শকদের সামনে।"

'জনা'র নায়িকার দৃশ্যে শিশিরকুমারের শৃঙ্গার-রসাত্মক অভিনয় অতুলনীয় হয়েছিল। শৃঙ্গার রসাত্মক অভিনয়ে শিশিরকুমারের অভিনয়-ক্ষমতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী লিখেছেন:—

"প্রত্যেক নাটকেই বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ আমাকে প্রশ্ন করেন, কিরূপ চরিত্রের অভিনয় অভিনেতৃর পক্ষে সব চেয়ে কঠিন, তবে উত্তরে আমি প্রেমিক বা প্রেমিকার ভূমিকাভিনয়েরই উল্লেখ করিব। সাহিত্য রচনায় যেমন নাটক লেখা সর্বাপেক্ষা কঠিন, অভিনয়েও তেমনি প্রেমিক-প্রেমিকার রূপায়ণ অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। অবশ্য এক অর্থে যে-কোনরূপ চরিত্রের রূপায়ণই শক্ত। কারণ উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতৃ একই শ্রেণীর বিভিন্ন চরিত্রাভিনয়ে বিভিন্নরূপাভিব্যক্তি ফুটাইয়া তোলেন। ইহার অর্থ এই যে, খাঁটি নাটকে কোন চরিত্রই একরূপ হয় না। কোনও বীরই এক নয়, কোন অসৎ ব্যক্তিও এক নয়। তথাপি বীরত্বব্যঞ্জক এমন কতকগুলি ভাবভঙ্গী আছে যাহা যে-কোন বীর-চরিত্রেই খাপ খাওয়াইয়া লওয়া চলে। তেমনি কুটিলতা-

অভিব্যক্তি হইতে পারে এমন কতকগুলি মৌলিক কুঞ্চনরেখা আছে যাহা সকল কুটিল চরিত্রেরই সাধারণ অভিব্যঞ্জনরূপে গণ্য করা যায়। কিন্তু প্রেমের মতই প্রেমিকতার পরিস্ফুটনও এতই বিচিত্র যে, কোন সাধারণ প্রকাশের গণ্ডিতে উহাকে ধরা যায় না। প্রেমিক প্রেমিকার অভিনয় করিতে গেলে অভিনেতৃর পক্ষে প্রয়োজন হয় সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের, আর সাধনালব্ধ বিচিত্র দৃষ্টিভংগীর। যাঁহার গলা মিষ্টি নয়, প্রেমিকের অভিনয় করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। আর যাঁহার দৃষ্টিতে কামনা, বাসনা, মান, অভিমান, আনন্দ, বেদনার রূপ প্রতিফলিত না হয়--প্রেমিকের অভিনয় তাঁহার পক্ষে অধিকতর বিড়ম্বনা। কারণ অন্য কোনরূপ চরিত্রাভিনয়ে চক্ষু ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার যেরূপ অবকাশ থাকে, প্রেমিক চরিত্রাভিনয়ে সেরূপ অবকাশ থাকে না। সেখানে চোখকেই সব কথা বলিতে হয়। দানীবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত কোনো অভিনেতৃই যে প্রেমের অভিনয়ে কৃতকাম হইতে পারেন নাই উহার কারণ এই যে, তাঁহাদের কেহই যুগপৎ উক্ত দুইটি গুণের অধিকারী ছিলেন না, বা নহেন। আবার কাহারও হয়ত দৃষ্টিভংগির কুশলতা ছিল, কিন্তু মিষ্ট কণ্ঠ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে—দানীবাবু অনবদ্য প্রকাশ-ভংগির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর আদৌ সুখশ্রাব্য ছিল না। স্বর্গত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিষ্টি চেহারা ছিল, কণ্ঠস্বর ছিল উদাত্ত-মধুর, কিন্তু প্রকাশভংগি ছিল ঠিক সেই পরিমাণেই অক্ষম, দরিদ্র। অপর পক্ষে ঠিক ঐ দুইটি গুণের অধিকারী বলিয়াই প্রেমিকের ভূমিকায় শিশির-কুমারের জুড়ি কেহ নাই বলিলেই সব বলা হয় না, প্রেমিক-চরিত্রের অভিনয়ে তিনি বাংলা মঞ্চ জগতে একক এবং অদ্বিতীয়।

"উপরে যে প্রেমিক-প্রেমিকা চরিত্রের কথা বলিয়াছি, বলা বাহুল্য উহা সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকা চরিত্র নয়। 'সাধারণ' অর্থ—বাংলা নাটক-সুলভ সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকা। পুরাতন বাংলা নাটকে প্রেমিক-প্রেমিকা চরিত্র একটিও নাই। প্রেমাস্পদের হাত ধরিয়া 'আমি তোমায় ভালবাসি' বলিলেই উহাতে প্রেমিকত্ব ফুটিয়া উঠে না, কিংবা প্রেমিকার বুকে মাথা রাখিয়া দুইবার 'প্রাণনাথ' বলিয়া নাকি-কান্না কাঁদিলেই প্রেমিকার পরিচয় প্রকাশিত হয় না, অথবা প্রেমিকার নাম ধরিয়া পাগলের মত চীৎকার করিলেই প্রেমিক-চরিত্রের বিকাশলাভ ঘটে না। অথচ প্রাচীন বাংলা নাটকে প্রেমিক-প্রেমিকা চরিত্রের ঐ সকল একমাত্র লক্ষণ ছিল। সেখানে প্রেমিক চরিত্রের মধ্যে

বলিষ্ঠতা বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল। নাটকের, অপেরার—সকল প্রেমিক চরিত্রের মধ্যেই কেমন একটা মিনমিনে ভাব, একটা নপুংসক দুর্বলতা। মিশরকুমারীর 'রামেশিশ'ও যেমন, আলিবাবার 'হুসেন'ও তেমনি। বৈচিত্র্য কোথাও নাই। চন্দ্রগুপ্তের প্রেমের মধ্যেও বলিষ্ঠতার অভাব, 'সুজা'র কাব্য-গন্ধী মেলাই সংলাপসত্ত্বেও সুজা-পিয়ারার প্রেম হাস্যকর। বর্তমান যুগের বাংলা নাটকেও যে প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, এমন মনে করিলেও ভুল হইবে। আধুনিক নাটকের প্রেমিক-প্রেমিকারা হয় পুরাতন অনুসারী, না হয় অতিমাত্রায় intellectual বুলির কসরৎকারী। ইহারই মধ্যে বিধায়কের 'বিশ বছর আগে' নাটকের 'দীপক' চরিত্রই একমাত্র ব্যতিক্রম। প্রেমিক-প্রেমিকা চরিত্র খুঁজিতে হইলে তাই উপন্যাসের নাট্যরূপ-গুলিতেই খুঁজিতে হয়। এ বিষয়ে কি পুরাতন কি নূতন দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। তাও আবার সব উপন্যাস নয়, কেবলমাত্র বঙ্কিম আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিই উল্লেখযোগ্য। সেই প্রতাপ, সেই শৈবলিনী, সেই গোবিন্দলাল-রোহিণী-ভ্রমর, সেই নবকুমার-কপালকুণ্ডলা, সেই মোবারক-জেবউন্নিসা, সেই জীবানন্দ-ষোড়শী, সেই রমা-রমেশ, সেই সতীশ-সাবিত্রী, সেই অচলা-সুরেশের কথাই বলিতে হয়। শিশিরকুমারের অভিনয়-স্পর্শ লাগে নাই বলিয়াই বঙ্কিম-সৃষ্ট কোন প্রেমিক চরিত্রের অভিনয় জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। অভিনয় মাত্র হইয়াই রহিয়াছে। কিন্তু জীবানন্দ, রমেশ প্রভৃতি অবিস্মরণীয় একমাত্র শিশিরকুমারের জন্যই। এমন কি 'সীতা'র 'রাম'-ও একমাত্র শিশিরকুমারেই সম্ভব হইয়াছে।"

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'জনা' নাটকে শিশিরকুমার ও তারাসুন্দরীর অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "তিনি সেজেছিলেন প্রবীরের ভূমিকায়, সে অভিনয়ে আমরা প্রবীরের আসল রূপ দেখেছিলুম এবং তাঁর শিক্ষায় তারাসুন্দরী জনার ভূমিকায় যে অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন—তাতে পুত্রগর্বে জননীর গৌরব এবং পুত্রবধের প্রতিশোধ স্পৃহার যে সংযত মনোভাব তাও বাঙলা রঙ্গমঞ্চে সম্পূর্ণ অভিনব।"

সীতার একাধিকশততম রজনীর অভিনয় হলো রবিবার ২১শে আষাঢ়, ১৩৩২। অভিনয়ের পূর্বে একটি সুন্দর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'নাচঘর' পত্রিকা (২৬শে আষাঢ়, ১৩৩২) সেই উৎসবের বিবরণ দিয়ে লিখেছিলেন ঃ "গত রবিবার নাট্যমন্দিরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত সীতা নাটকের

একাধিক শততম রজনীর উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। সেদিন শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিচিত্র পত্রপুষ্পপতাকায় ও রঙীন বৈদ্যুতিক দীপালোকে মনোমোহন-নাট্যমন্দির সেদিন মনোহর শ্রী ধারণ করেছিল। সমাগত দর্শকবৃন্দকে পুষ্প ও মাল্যদানে এবং সুবাসিত গোলাপের নির্যাসে অভিষিক্ত করে তাঁদের সম্বর্ধনা করা হয়েছিল। অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে আশীর্বাদ করে বলেন যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আশীর্বাদ মস্তকে নিয়ে এবং তাঁর উপস্থিতিতে নাট্যমন্দিরে সীতার প্রথম অভিনয় রজনী আরম্ভ হয়েছিল। তিনি আশা করেন যে এই সীতা নাটকখানি আরও দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হবে। শিশিরকুমার যেন এই একাধিক শততম অভিনয়ের পর 'সীতা'র বনবাস না দেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে, একখানি নাটক যদি এইরূপ একাদিক্রমে শতরাত্রি বা সহস্র রাত্রি চলে তাহলে শিশিরকুমারের ন্যায় একজন প্রতিভাবান দক্ষ নাট্যশিল্পীকে নব নব ভূমিকায় দেখবার অবকাশ আমরা খুবই কম পাব। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী কৃতাঞ্জলিপুটে দর্শকদের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অভ্যর্থনা করে বললেন যে, একখানি নাটককে সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করতে হলে যথেষ্ট সময় ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং একখানি নাটকের প্রয়োগব্যয় যতদিন পর্যন্ত না উঠে আসে, ততদিন পর্যন্ত সে নাটকের অভিনয় বন্ধ করা বা অপর একখানি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা সম্ভবপর নয়।··· বাংলা দেশ যে শিল্পীর আদর করতে শিখেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে এই নবগঠিত নাট্যসম্প্রদায়ের আশাতিরিক্ত সফলতা। তিনি যেরূপ বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই নাট্য প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে পেরেছেন তা হয়তো কোন দিনই সম্ভব হত না, যদি না বাংলা দেশের নাট্যামোদী সুধী-সজ্জনেরা এতখানি সহানুভূতি দেখাতেন এবং এতটা অনুগ্রহ করতেন। আমার স্বজাতির নামে আর যে কোন বদনামই লোকে দিক না কেন, তারা যে শিল্পের কদর বোঝে না, শিল্পের আদর করতে জানে না, এ অপবাদ তাদের কেউ দিতে পারবে না।"

১৩ই আগষ্ট খোলা হল ব্যারিষ্টার শ্রীশচন্দ্র বসুর নাটক 'পুণ্ডরীক'। এখানি ছিল একটি দুর্বল নাটক—জমে নি।

ভূমিকালিপি :—পুণ্ডরীক—শিশিরকুমার, শাকী—তারাসুন্দরী, ইরাণী

রুস্তানা—চারুশীলা, ভৃঙ্গার—নরেশ মিত্র, উষানাথ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, কাশীমদ—গোপাল ভট্টাচার্য, কমলা—সরলা, অমলা - শেফালিকা (পুতুল)।

নরেশ মিত্র তখন 'আর্ট থিয়েটার' ছেড়ে 'নাট্য-মন্দির'-এ যোগ দিয়েছেন।

এই বৎসরে ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিংয়ে মহাপ্রয়াণ করেন। দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধ হয় বুধবার ১লা জুলাই। এই উপলক্ষে সেদিন নাট্যমন্দিরের অভিনয় বন্ধ ছিল। 'সীতা'র অভিনয় দেখে দেশবন্ধু বলেছিলেন—ভারতের জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের সামর্থ্য যদি কারো থাকে তো তা আছে একমাত্র শিশিরকুমারের। দেশবন্ধু শিশিরকুমারকে পুরোভাগে রেখে কলকাতায় জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের জন্য উদ্যোগীও হচ্ছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুর অকালমৃত্যুতে এই মহৎ কীর্তিস্তম্ভ আর গঠিত হল না। শিশিরকুমার সারা জীবন এর জন্যে হাহাকার করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমার উত্তরকালে তাঁর 'রঙ্গালয় ও নাট্য-পরিচালনা' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : "যেখানে অভাব সেখানে অভিনয়ের বিকাশ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যদেশে এক একখানি নাটকের জন্য তিন চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও অনেক সময়ে সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হইতে হয়, কিন্তু এই চারি লক্ষের ক্ষতি তাঁহারা যেরূপ নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করেন, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। আমরা যে কোন একখানি নাটক যে কোন ভাবে রঙ্গমঞ্চে নামাইয়া দিনের পর দিন অর্থের ভাবনা লইয়া চলিতে থাকি—ইহার ফলে অভিনয়ের উৎকর্ষ-সাধন সম্ভবপর হইতে পারে না। অনুমান চারি লক্ষ টাকা ও একখানি সুন্দর বাড়ি হইলে বাঙলার রঙ্গমঞ্চকে অভীপ্সিত পথে পরিচালিত করিতে পারা যায়।

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত তাঁহার দার্জিলিং যাইবার পূর্বে এই সম্পর্কে কথা হয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাঙলা দেশে চারিলক্ষ টাকা ও ভাল একখানি বাড়ি মিলিবে না? আচ্ছা আমি দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিব'; কিন্তু দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিল তাঁহার মরদেহের শেষ চিহ্ন।"

এর পর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর 'মনোমোহন-নাট্যমন্দি'র হলো 'নাট্যমন্দির লিমিটেড কোম্পানী'। মূলধন হয় পাঁচ লক্ষ টাকা, প্রতি শেয়ার একশত টাকা।

ডিরেকটার বোর্ডে আছেন তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শিশির-কুমার ভাদুড়ী।

ম্যানেজিং এজেন্টস—মেসার্স ভাদুড়ী য়্যাণ্ড কোং।

কিন্তু ইতিমধ্যে মনোমোহন থিয়েটার বাড়ী ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্টের দখলে চলে গেল। শিশিরকুমার ম্যাডানদের কাছ থেকে তাদের কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার (এখনকার উত্তরা) বাড়ি তিন বছরের জন্য লীজ নিলেন।

ছাব্বিশ

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে 'নাট্যমন্দির' স্থাপিত হল। হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন ঃ "ঐখানেই শিশিরকুমার নিজের প্রতিভা-বৈচিত্র্য দেখাবার চরম সুযোগ লাভ করেছিলেন। ঐখানে নাট্যকলার নানা বিভাগে নানারূপে তিনি এমন ভাবে দেখা দিয়েছিলেন যে, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অমর করে রেখেছেন নিজের সঙ্গে নাট্যমন্দিরেরও নাম।"

২৩শে জুন নাট্যমন্দিরের অভিনয় শুরু হল 'সীতা' নাটক দিয়ে।

২৬শে জুন নতুন নাটক খোলা হল—রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এই ভাবে ঃ—

নমঃ নটনাথায়

নাট্যমন্দির

নবনিকেতন—১৩৮ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের

বিশ্ববিশ্রুত নাটক

বিসর্জন·

রঘুপতি—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এই

বিসর্জন

অধুনা প্রচলিত বিসর্জন নাটককে ভাঙিয়া গড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছে। আকারে প্রকারে যথেষ্ট নূতনত্ব দেওয়া হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনুগ্রহপূর্ণ

আদেশে ও তাঁহার সুনিপুণ নির্দেশে নাট্যমন্দিরে অভিনয়ার্থ এই নাটক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক নূতন গান সংযোজিত হইয়াছে। দৃশ্যাবলীর সংস্থানেও অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। কাজেই এই বিসর্জনে নূতনত্বের অভাব হইবে না। কবির সুরভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুশিক্ষায় এই নাটকের গানগুলি সঠিকরূপে তৈরী হইয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের ভাবোপযোগী দৃশ্যপট রূপদক্ষ শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন নাটক নূতন হইয়াছে।

বিসর্জন

নাটকের এই নূতন রূপ দেখিবার জন্য সুধীবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

মঞ্চে রবীন্দ্র-শিশির প্রতিভার যোগাযোগ এই প্রথম। এই নাটকেই শিশিরকুমার বাঙলা মঞ্চে সর্বপ্রথম mood light ব্যবহার করেন। এই অভিনয় সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেনঃ "তিনি নামলেন রঘুপতির ভূমিকায় এবং তাঁর অপূর্ব শিক্ষায় জয়সিংহের ভূমিকায় রবি রায়, গোবিন্দ-মাণিক্যের ভূমিকায় মনোরঞ্জন, রাণী গুণবতীর ভূমিকায় চারুশীলা, অপর্ণার ভূমিকায় পুতুল—এদের অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ—এঁরাও মুগ্ধ হয়ে শিশিরকুমারের অভিনয় শিক্ষাদান এবং প্রয়োগকৌশলের বহু প্রশংসা করেছিলেন।"

শিশিরকুমারের 'রঘুপতি' সম্পর্কে 'নবশক্তি' (১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা) পত্রিকার মন্তব্য ঃ—"বিসর্জনের রঘুপতি যেন একটা দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্মণ্যতেজে গরীয়ান, লুপ্ত ব্রহ্মণ্যগরিমা উদ্ধারে কূটচক্রী—আবার আজন্ম-লালিত জয়সিংহের প্রতি নারীর মত কোমল স্নেহশীল, শিশিরকুমারের অভিনয়ে এর প্রত্যেকটি রস অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজার সঙ্গে কথোপকথনকালে কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর করে শিশিরকুমার কতখানি শ্লেষ, ঘৃণা, ক্রোধ যুগপৎ অভিব্যক্ত করেছেন—যাঁরা বলেন অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক নয় তাঁদের প্রণিধানযোগ্য।"

এই প্রসঙ্গে জনৈক নাট্যরসজ্ঞ সমালোচকের সমালোচনার কিংয়দশ উদ্ধৃত করছি ঃ—

"রঘুপতির অভিনয়টাকে শিশিরকুমার নিতান্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করেন নি ; সেইজন্য আমাদের বিশ্বাস নাটকের প্রথম দিকটায় তিনি সাধারণ দর্শকের

সম্পূর্ণ মনোহরণ করতে পারেন নি — যদিও আমরা তাঁর প্রত্যেক গতিবিধি বিস্মিত আগ্রহে লক্ষ্য করে চমৎকৃত হচ্ছিলুম। নাটকের এই অংশে ভাবাবেগে খুব খানিকটা চেঁচিয়ে ও হাত-পা ছুঁড়ে আসর জমিয়ে হাততালি পাবার বেশ একটু সুযোগ ছিল, কিন্তু শিশিরকুমার সে প্রলোভন পরিত্যাগ করে চরিত্রের সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে বেশী করে নজর দিয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর অভিনয় আড়ম্বরপূর্ণ না হয়ে সহজ সরল গতির সৌন্দর্যে মহীয়ান হয়ে উঠেছিল। তিনি নাটকের অংশ-বিশেষকে জমিয়ে তোলবার চেষ্টা না করে সমগ্র চরিত্রটিকে তাঁর বিচার মত একটি বিশেষ রূপের রেখার মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে করে রঘুপতি একটা পুরা মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত আমরা দেখি অভিনেতারা আপাত প্রশংসার প্রলোভনে উদ্‌গ্রীব হয়ে খণ্ডর দিকে এতটা দৃষ্টি দিয়ে ফেলেন যে সমগ্র দৃষ্টিটা হারিয়ে যায়; তাতে ফল হয় এই যে, চরিত্র হয়ত খণ্ড হিসাবে কিছু কিছু জমে কিন্তু তার পরিণতিতে সে না পৌঁছে একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। শিশিরকুমার রঘুপতি চরিত্র অভিনয় করবার সময় কেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই পরিণতির সূক্ষ্ম জটিল পথ ধরে চলেছিলেন সেটি লক্ষ্য করতে বিস্ময় ও আনন্দ আছে। তিনি যে ধারায় অভিনয় করেছেন সে ধারার সঙ্গে মন মিলিয়ে তাঁর অভিনয় না দেখলে অনেকের তা পানসে লাগতে পারে; কিন্তু রসিকজনের আনন্দনিবেদন তাঁর জন্য অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

শিশিরকুমার দশম অভিনয়-রজনী থেকে জয়সিংহের ভূমিকায় এবং নরেশ মিত্র রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন।

শিশিরকুমারের 'জয়সিংহ' সম্পর্কে 'নাচঘর' পত্রিকার মন্তব্য : —

"পরিধানে চাঁপাফুলের মত একখানি ক্ষৌমবসন, গৌর অঙ্গে জবাফুলের মত রক্তরাঙা রেশমী আঙরাখা, মাথায় কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে একটি সুন্দর সোনালী রঙের চিকণ কেশবন্ধ শোভন করে বাঁধা, স্কন্ধে তার রুধিরাক্ত লোহিত উত্তরীয়, বিলম্বিত প্রকোষ্ঠে তার স্ফটিক মণিবন্ধন, নগ্নপদে সেই সুধীর সুব্রত ব্রহ্মচারী যখন রঙ্গভূমে প্রবেশ করলেন—সেই সুঠাম সুকান্ত সুবেশ সাধকের তপ্তকাঞ্চনকান্তি তরুণ মূর্তি প্রথম সন্দর্শন করেই দর্শকচিত্ত যুগপৎ মুগ্ধ ও উল্লসিত হয়ে উঠল।...সেই প্রথম দৃশ্যের করুণ-কোমল অভিনয় থেকে সুরু করে তারপর রাজার ব্যবহারে, গুরুর ছলনায়, তাঁর সেই দ্বিধা-সন্দেহ সংশয়-অবিশ্বাস, তার প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সাধনার

ভিত্তিমূলে যে প্রচণ্ড ভূকম্পন লাগিয়ে দিলে—দারুণ দ্বন্দ্বের চাপে, মর্মান্তিক বজ্রঝংকার বিপুল সংঘাতে তার সেই তিনটি দেবতার প্রত্যেকটির অন্তরের বেদী হতে কেমন করে বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় লুটিয়ে গেল, তার আশৈশবের শিক্ষা ও সংস্কার কেমন করে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে দুর্বল হয়ে তার নিজের বিরুদ্ধে তাকে বিদ্রোহী করে তুললে, উন্মত্ত জয়সিংহ কেমন করে শেষে দেবীর পায়ে রাজরক্ত নিবেদন করে দিতে শ্রাবণের শেষ রাত্রে আপনাকে আহুতি দিলে, নিপুণ রূপদক্ষ শিশিরকুমার সেই অভিশপ্ত জীবনের প্রত্যেকটি পলে যা-কিছু ব্যথা, যা-কিছু আনন্দ—যেটুকু হাসি—যতখানি অশ্রু ছিল একেবারে উজাড় করে আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁর এই জয়-সিংহের ভূমিকায় সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়, রঘুবীর, আলমগীর প্রভৃতি তাঁর অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকার ন্যায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

১লা জুলাই গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের নবপর্যায়ে প্রথম অভিনয় হল। 'ভীম', 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ'—পরস্পরবিরোধী এই তিনটি ভূমিকায় শিশিরকুমার অবতীর্ণ হলেন।

অন্যান্য ভূমিকালিপি ঃ—বৃহন্নলা—রবি রায়, কীচক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিরাট—শীতল পাল, যুধিষ্ঠির—যোগেশ চৌধুরী, অভিমন্যু—ধীরেন দাস, উত্তর—চারুশীলা, উত্তরা—শেফালিকা (পুতুল), দ্রৌপদী—প্রভা।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার এই নাটকেই অপূর্ব প্রয়োগকুশলতা এবং 'ভীম' ও 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ'-এর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ওল্ড ক্লাবের উদ্যোগে স্টার থিয়েটারে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। শৌখিন অভিনেতা হিসাবে শিশিরকুমারের সেই শেষ অভিনয়। এই গ্রন্থের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে সে অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশিরকুমারের 'ভীম', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ'-এর ভূমিকার অভিনয় সম্পর্কে 'নাচঘর' পত্রিকা ও নাট্যসমালোচক বীরেন্দ্র-নাথ পালচৌধুরীর মন্তব্য দশম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। এখানে শুধু আর একজন শ্রদ্ধেয় প্রত্যক্ষদর্শীর অভিমত উদ্ধৃত করব। তিনি যশস্বী চিত্র ও নাট্য-পরিচালক স্বর্গত কালীপ্রসাদ ঘোষ। তিনি লিখেছেন—"ব্যক্তিগত ভাবে আমার কিন্তু শিশিরকুমারের 'রাম' অপেক্ষা 'ভীমের' অভিনয় শ্রেষ্ঠ মনে হইয়াছিল। সে ভীমে প্যাঁচ ছিল না, কিন্তু বিপরীতমুখী ভাবধারার এমন অপূর্ব সাম্য ও প্রকাশ ছিল যাহা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।"

১লা ডিসেম্বর খোলা হল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ'। ভূমিকা-লিপি ঃ—কর্ণ—শিশিরকুমার, শ্রীকৃষ্ণ—বিশ্বনাথ ভাতুড়ী, যুধিষ্ঠির—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ভীষ্ম—শীতলচন্দ্র পাল, ভার্গব ও অর্জুন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভীম—অমিতাভ বসু, শকুনি—নৃপেশচন্দ্র রায়, গান্ধারী—হরিসুন্দরী, দ্রৌপদী—চারু-শীলা, পদ্মাবতী—কৃষ্ণভামিনী।

পরবর্তীকালে দ্রৌপদীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন শ্রীমতী কঙ্কাবতী। সে-সময়কায় একটি দিনের মহলার অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন যশস্বী প্রচারবিদ সুধীরেন্দ্র সান্ন্যাল। তিনি লিখেছেন ঃ "নর-নারায়ণের মহলা বসেছে। কঙ্কাবতী বারবার একটি মাত্র লাইনই আবৃত্তি করে যাচ্ছেন। শিশিরকুমারের যেন মনে হল আবৃত্তিতে প্রাণ নেই। তখন—শ্রীকৃষ্ণের সংলাপটুকু কণ্ঠে তুলে নিয়ে শিশিরকুমার আবৃত্তি করলেন ঃ 'কেঁদো না, কেঁদো না কৃষ্ণা, এনো না কৃষ্ণের চোখে জল!'—সেই মুহূর্তে চোখের জলের ধারা বয়ে গেল কৃষ্ণার চোখেও। ভাবের আবেগে বিহ্বল হয়ে গেল শিল্পীর সত্তা। সে কান্না তাঁর অন্তরের অন্তরালে থেকেও সখা কৃষ্ণের মনেও যে দোলা দিয়ে গেল, শিশিরকুমারের অভিব্যক্তিতে তা গোপন থাকে নি। মহলার জন্যে যে ভাবগম্ভীর পরিবেশের প্রয়োজন হয়, এবং যার অভাবে নাটকের মহলা প্রাণহীন হতে বাধ্য—জীবিতকালে শিশির-কুমারকে যাঁরা এই পরিবেশে দেখেছেন তাঁরা তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন।"

এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন ঃ "ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'নর-নারায়ণ' নাটকে শিশিরকুমারের 'কর্ণ'—তাঁর শিক্ষায় পদ্মার ভূমিকায় কৃষ্ণভামিনী, দ্রৌপদীর ভূমিকায় চারুশীলা যে অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, তা অবিস্মরণীয়।"

শেষজীবনে শিশিরকুমার ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটে 'গ্রন্থজগৎ'-এর ঘরে 'নব্য বাংলা নাট্য-পরিষদ'-এর নাট্যরসিক ও নাট্যামোদী সভ্যবৃন্দের কাছে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন ঃ "নর-নারায়ণে কৃষ্ণভামিনী করত পদ্মা ও চারু দ্রৌপদী। দুজনেই অপূর্ব অভিনয় করেছিল। যেখানে দ্রৌপদী বলছে—

সেই আমি, মুক্ত কেশরাশি লয়ে
সহিতেছি হে মাধব—নিত্য সহিতেছি

অগ্নিজিহ্ব সহস্র ফণার
বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন—

সেখান থেকেই জমে যেত। এরপর দর্শকরা আর নিশ্বাস ফেলতে পেত না।"

'নব্য বাংলা নাট্য-পরিষদ'-এর আর একদিনের বৈঠকে শিশিরকুমার বলেছিলেন: "চারুর উচ্চারণে কতকগুলো দোষ ছিল তবে চেষ্টা করলে কি করা যায় দ্রৌপদীতে তার প্রমাণ দিয়েছিল। 'হে কেশব, তুমি নাকি বিরাট হইয়াছিলে কুরু সভাস্থলে', এই কথাগুলোর মূল সুর সে ফোটাতে পেরেছিল।"

'নর নারায়ণ' নাটকে শিশিরকুমারের সূক্ষ্ম প্রয়োগ-কুশলতা সম্পর্কে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটি মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। সেইটি উদ্ধৃত করে 'নর-নারায়ণ' প্রসঙ্গের উপসংহার করছি। শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণকে জনপ্রিয় করেছিলেন এবং প্রযোজনায় অতি সহজ সঙ্কেত দ্বারা বিরাটকে রূপ দিয়েছিলেন সার্থকভাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তিনিও প্রতিফলিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার জন্য কাঠের রথ বা মাটির ঘোড়া দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি; দুটো ভাঙা রথের চাকা, কিছু দলিত মথিত বৃক্ষশাখা এবং একটা থমথমে আবহ সৃষ্টি করে দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে একটা দ্বৈরথ সংগ্রাম হয়ে গেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্যসম্পদ অপরেশচন্দ্রের চেয়ে বেশি ছিল, এবং কাব্যাবৃত্তিতে নাট্যাচার্য আর তাঁর শিষ্যরা অধিকতর দক্ষ ছিলেন বলেই নর-নারায়ণে বেশি জটিলতা থাকলেও নাট্যাচার্য তাকে সার্থক সৃষ্টি করে তুলতে পেরেছিলেন। দুইটি থিয়েটারের সব পৌরাণিক নাটক আলোচনা না করে এ-কথাই বলা যায় যে, নাট্যাচার্যের সৃষ্টিতে যে কাব্যের পরিচয় পাওয়া যেত, আর্ট থিয়েটারের সৃষ্টিতে তা পাওয়া যেত না। আমি নাট্যাচার্যকে কয়েকবার বলিছি তিনি বড় কবি না বড় অভিনেতা, সে বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগে।"

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন: "কাব্যের সমজদার ও নাটকের সমজদার তাঁর চেয়ে বড় হয় তো আর বেশি কেউ ছিল না; তাঁর মত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়।"

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "শিশিরকুমার যে অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন জগতের নাট্যসাহিত্যের এক বিরল

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রসবোদ্ধা ও সমালোচক, নাট্যতত্ত্বে এক অদ্বিতীয় বিদগ্ধ-মানসের অধিকারী।"

সাতাশ

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ।

এই বৎসরের গোড়ার দিকে হার্ডিঞ্জ হস্টেলের ছাত্রবৃন্দ হস্টেলের লাইব্রেরী হলে শিশিরকুমারকে সংবর্ধিত করে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। সংবর্ধনা সভার সভাপতি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী। এই সভায় আরও বহু মনীষী উপস্থিত ছিলেন, যথা—নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্ববিৎ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি ও সুরস্রষ্টা দিলীপকুমার রায়, হাসির গানের বিখ্যাত গায়ক নলিনীকান্ত সরকার, সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় ও কবি নরেন্দ্র দেব। সেই অভিনন্দন পত্রটি :—

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

হে নবযুগের শ্রেষ্ঠ নটবীর, বাংলার নাট্যশিল্প সাধনাক্ষেত্রে তুমি তোমার ঐন্দ্রজালিক মায়াস্পর্শে যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছ, তাহার বিপুল উচ্ছ্বাস আজ আমাদের রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে।

ওগো রূপদক্ষ! তোমার প্রদীপ্ত প্রতিভার উজ্জ্বল প্রভায় বাঙলার কলা-সরস্বতী এক অভিনব মূর্তিতে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছেন। তোমার সেই দিব্য প্রতিভার যথাযোগ্য আদর ও সম্মান করিবার সুযোগলাভে আমরা ধন্য।

ওগো নবীন! তোমার সবুজ প্রাণে শক্তিরসের অজস্র ধারা গতির উচ্ছ্বাসে অতীতের সকল বাধা লঙ্ঘন করিয়া বাঙলার নাট্যক্ষেত্র শ্যামল শোভায় পূর্ণ করিয়াছে। পুরাতনের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, হে নূতনের সারথি, সেই সংগ্রামে সকল অপমান ও লাঞ্ছনা সহিয়া একাকী সত্যের মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস ও গৌরব তোমারই।

নাট্যকলার স্রোতোধারাকে উজান বহাইয়া দিবার জন্য তুমি যে শঙ্খ-ধ্বনি করিয়াছিলে তাহার আহ্বানে বাঙলার তরুণপ্রাণ আজ সাড়া দিয়াছে, —ইহাই তোমার যাত্রাপথের সকল দুঃখ সকল বেদনার পরম সুখ ও সান্ত্বনা।

হে বরেণ্য, তোমার সাধনা জয়যুক্ত হউক। তুমি আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

হার্ডিঞ্জ হস্টেলের ছাত্রবৃন্দ
সন ১৩৩৩, ৮ই মাঘ।

১লা জুন।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে 'যোগেশ'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন শিশিরকুমার। সাধারণ মঞ্চে সামাজিক নাটকে তাঁর এই প্রথম আত্মপ্রকাশ।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল স্টারে 'প্রফুল্ল' প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্টারে তখন যোগেশ সেজেছিলেন অমৃতলাল। ঐ পার্টে তাঁর অসামান্য খ্যাতি। এর ছ বছর পরে গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় মিনার্ভা থিয়েটার 'প্রফুল্ল' নিয়ে আসরে নামলেন। অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই। স্টারও ঐ দিনই 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি দিলেন। স্টারের হ্যাণ্ডবিলে গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করে লেখা হল 'তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়'। মিনার্ভায় তখন রিহার্সাল চলছে। ট্র্যাজেডিয়ান মহেন্দ্র বোস সাজবেন যোগেশ। তিনি একদিন মহলায় গিরিশচন্দ্রকে বললেন, "দেখুন এই যোগেশের পার্টে সব দৃশ্যেই বোধ হয় আপনি যেমন দেখাচ্ছেন তেমনই অভিনয় করতে পারি কিন্তু 'আমার সাজানো বাগানো শুকিয়ে গেল' আপনার মুখে যেমন শুনছি তেমনটি বা তার কাছাকাছিও আমি চেষ্টা করেও পেরে উঠবো না! প্রতিযোগিতায় শেষ বয়সে কি অমৃতের কাছে হেরে যাবো। এ পার্টে তার খুব সুনাম।" কাজেই গিরিশচন্দ্রকে যোগেশের পার্টে নামতে হল। অমৃতলালও বললেন, "যদি হারি গুরুর কাছেই ত হারবো, তাতে গৌরবই বেশী।"

কলকাতা শহরে তুমুল চাঞ্চল্য। গুরু শিষ্যের রণ, কে হারে কে জেতে?

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-এ দুই যোগেশের অভিনয়ের তুলনামূলক সমালোচনা বেরোল। তার কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি :—

"So far the advantages and disadvantages almost balance each other. Now comes the question of the claims of the two Jogeshes to superiority. The character of Jogesh is the pivot on which the whole mechanism of the play moves and the weight of its correct impersonation is there calculated to turn the scales

one way or the other. Here is a case of Greek meeting Greek. It would however be no discredit to the original Jogesh if he owes his inferiority to the new, nor would we believe, the latter take it as anything but a matter of self-gratulation if he is beaten by the former whom he trained to the part some years ago. The former has the gift of a clear incisive voice and a roundness of a delivery while the latter has the advantage of being the author of the piece (not necessarily an advantage in the case of all authors) and of being possessed with the intuitive skill probing into the depeths of human thought and giving it feeling expression. The former voices the thunder, while the latter emits the lightning of the gloomy atmosphere of the character's life."

উত্তরকালে এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে লিখেছেন: "প্রথম রাত্রে গিরিশচন্দ্রের যোগেশ দেখিয়া যোগেশের এমন একটা ছাপ আমাদের মনে বসিয়া গিয়াছিল যে, অমৃতলালের যোগেশ ইহার পূর্বে আমাদের ভাল লাগিলেও তাঁহার এবারের যোগেশ সেখানে স্থান পাইল না। অমৃতলালের ছবি গিরিশবাবু একেবারে বদলাইয়া দিলেন। অমৃতলালের কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুরের মাধুর্য ছিল,—যাহা তাঁহার কণ্ঠে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, এবং সত্যই সেটি তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদই ছিল। তাহা নিতান্তই অননুকরণীয়। গিরিশচন্দ্র যে অভিনয় করিলেন তাহাতে কোনো সুরের সংস্পর্শ তো ছিলই না, কিন্তু তথাপি তাহা অমৃতলালের অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও মর্মভেদী হইয়াছিল। কথার প্রত্যেক ভঙ্গীতে, চালচলনে, ভাবের অভিব্যক্তিতে, বয়সের আকারে, গাম্ভীর্যে, গিরিশচন্দ্রের যোগেশের পার্শ্বে অমৃতলালের যোগেশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। মনে হইল একজন যথার্থই যোগেশ, আর একজন যেন যোগেশ সাজিয়াছেন।"

অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্রের পর 'যোগেশ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী আর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। এখন দানীবাবুর এই পার্টে প্রচুর যশ। নাট্যামোদী মহলে আবার একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল।

দানীবাবুর 'যোগেশ'-এর সঙ্গে শিশিরকুমারের 'যোগেশ'-এর তুলনা করেছেন এ যুগের বিখ্যাত নাট্যসমালোচক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।

তিনি লিখেছেন: "'প্রফুল্ল' নাটকের 'যোগেশ' চরিত্র বহু অভিনেতার অভিনয়ের কষ্টিপাথর বিশেষ। গিরিশচন্দ্র কিংবা অমৃত মিত্রের কথা বলিতে পারিব না, তবে দানীবাবুর এবং পরবর্তীকালে নির্মলেন্দু, তিনকড়ি এবং শিশিরকুমারের 'যোগেশ' আমি দেখিয়াছি। দানীবাবুর যোগেশের সঙ্গে শিশিরকুমারের যোগেশের তুলনা করিলেই দুইজনের অভিনয়ধারার বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে। দানীবাবুর অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করে, কিন্তু শিশিরকুমারের অভিনয় দর্শককে ভাবায়। ইহার কারণ, অভিনয়ে শিশিরকুমারের চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়াস। দর্শকের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার প্রশ্ন সেখানে নাই, সেখানে আছে শিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টির আনন্দ।

"অবশ্য এ কথাও নির্মম সত্য যে 'যোগেশ' চরিত্রে বিশ্লেষণের কিছুই নাই। কারণ, গিরিশ-ভক্তদের ভাবাবেগে আঘাত লাগিলেও সমালোচনার খাতিরে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 'যোগেশ' কোন চরিত্রই হইয়া উঠে নাই। বিশেষতঃ অমন দুর্বলচিত্ত পুরুষ কখনও ট্রাজেডির নায়ক হইতে পারেন না। তাই প্রফুল্ল ট্রাজেডি না হইয়া একটি মেলোড্রামা হইয়াছে। ইহার সম্পর্কে দুই একটি কথা না বলিলে আমাকে অনেকে ভুল বুঝিতে পারেন সেই কারণেই অতি সংক্ষেপে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

"'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশকে আমরা প্রথমে দেখি একজন কর্মঠ, সৎ, স্নেহপ্রবণ গৃহস্বামীরূপে। পূর্বে তিনি ছিলেন অতি সাধারণ অবস্থার মানুষ,—দরিদ্র বলিলেও হয়। কিন্তু নিজের কর্মক্ষমতায় সেই অবস্থাকে তিনি স্বচ্ছল করিয়া তুলিয়াছেন, বিষয়-আশয়ও করিয়াছেন, সমাজে প্রতিষ্ঠাও লাভ করিয়াছেন। এক কথায় তিনি একজন 'self-made man'; বুদ্ধিমান এবং স্থিতধী। কিন্তু নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দেখি, এ-হেন যোগেশ যেই ব্যাঙ্ক-ফেলের কথা শুনিলেন অমনি 'আবার ফকির হলুম' বলিয়া অপরিমিত মদ্যপান আরম্ভ করিলেন, এবং নাটকের শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক আর কিছুই করিলেন না; কেবল মদেই আকণ্ঠ ডুবিয়া রহিলেন। একবার খোঁজ নিলেন না—ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকাটার সত্যই কী হইয়াছে, চেষ্টা করিয়াও উহার কিছু অংশ উদ্ধার করা যায় কিনা। স্বীকার করি—আজীবন কষ্টার্জিত অর্থ সম্পর্কে এরূপ দুঃসংবাদ শুনিলে মানুষের মন আঘাতে বিচলিত হইবারই কথা, কিন্তু সে চাঞ্চল্যের রূপ কি এই? বিশেষতঃ যোগেশের মত মানুষের পক্ষে? আর যে-মানুষ দুঃখের প্রথম আঘাতেই এমন ভাঙিয়া পড়েন সে মানুষ কখনও

ট্রাজেডির নায়ক হইতে পারেন না। নাটকের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত যিনি কেবল হা-হুতাশ করিয়া গেলেন তাঁহার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি বা বিস্ময় জাগিবে কী প্রকারে? 'প্রফুল্ল'র যোগেশ কেবলই মদ্যপ, ব্যাঙ্ক ফেলের ব্যাপারটা একটা ছুতামাত্র। আসলে তিনি মদের পিচ্ছিল পথে পা বাড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, সামান্য উপলক্ষেই সেই পথে নামিয়া অধঃপতনের পঙ্কিল পল্বলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এমন মানুষের সাজানো বাগান যদি শুকাইয়াই যায় তবে কাহারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি?

"অতএব বলাই বাহুল্য যে, ট্রাজেডির নায়ক চরিত্র হিসাবে যোগেশ চরিত্র ত্রুটিপূর্ণ। তথাপি সেই চরিত্রের কিছুটা আকার যে আছে তাহা তো আর অস্বীকার করা যায় না। এবং সেই অসম্পূর্ণ আকারের মধ্যেও যোগেশ চরিত্রের দুই চারটি লক্ষণ যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও সত্য। আমার বক্তব্য এই যে, যোগেশ-চরিত্র অভিনয়ে শিশিরকুমার এই দিকটার কথা ভাবিয়াছেন এবং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও দিয়াছেন।

"'প্রফুল্ল' নাটকের যে দৃশ্যে যোগেশ রাস্তায় দাঁড়াইয়া জনৈক পথচারীর নিকট 'একটা পয়সা দাও না—একটা পয়সা' বলিয়া হাত পাতিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, যোগেশ-চরিত্রের অভিনয়-প্রসঙ্গে দর্শক সমালোচকগণ সেই দৃশ্যটির বিশেষ উল্লেখ করিয়া থাকেন। দানীবাবুর যোগেশ চরিত্রাভিনয়ে ঐ দৃশ্য দেখিয়া কেবলই মনে হইয়াছে, হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাওয়ার মধ্যে কী এমন আছে যেজন্য দর্শকগণ অভিনয়-নৈপুণ্যের চরম নিদর্শনস্বরূপ উহাকে এমন ভাবে অভিনন্দিত করিয়া থাকেন? বরং 'প্রফুল্ল' নাটকে এমন অনেক দৃশ্য আছে যেখানে যোগেশ-চরিত্রাভিনেতা তাঁহার কলাদক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখাবার সুযোগ পাইতে পারেন। 'একটা পয়সা দাও না' এই সংলাপ-সমন্বিত দৃশ্যে দেখিয়াছি—দানীবাবু একজন দীন ভিক্ষুকের মতই মুখভঙ্গী করিয়া পথিকের নিকট হাত পাতিতেন। উহাতে স্বভাব-ভিক্ষুকের স্বাভাবিকতা সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিত বলিয়াই কি দর্শকগণ 'আহা-আহা' করিয়া উঠিতেন? কিন্তু ঐটুকু স্বাভাবিক অভিনয় অভিনেতার শক্তিমত্তার মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। কারণ—আমার মনে হয়, ঐরূপ অভিনয় যে-কোন অভিজ্ঞ মাঝারি গোছের নটের পক্ষেই সম্ভব। যোগেশ-চরিত্রাভিনয়ে দানীবাবু ইহার চেয়ে আরও উন্নত কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন বিভিন্ন দৃশ্যে। যাহাই হোক, পরবর্তীকালে শিশিরকুমারের যোগেশ-চরিত্রাভিনয় দেখিয়া মত পরিবর্তন

করিয়াছি। মনে হইয়াছে—ঐ ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গীর ভিতর দিয়াই যোগেশ চরিত্রের একটা দিক যেন উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ শিশিরকুমার তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সামগ্রিক অভিনয়ের ভঙ্গী কালি-কলমের রেখায় আঁকা দুষ্কর। তবে আকারে-ইঙ্গিতে ভাবটাকে খানিকটা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। শিশিরকুমার ঐ দৃশ্যে 'একটা পয়সা দাও না' কথাটা বলিয়া চুপি চুপি পথিকের নিকট হাত পাতেন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে, মুখের ভাবটা এই হয়—পাছে পরিচিত কেহ দেখিয়া ফেলে। ঐরূপ অভিনয়ের মাধ্যমে শিশিরকুমারের বক্তব্য এই যে, যোগেশ যতই মদ্যপান করুন এবং যতই অধঃপতনের পথে পা বাড়াইয়া থাকুন—তখনও পর্যন্ত নিজের আভিজাত্য-সংস্কার-বোধকে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আর প্রফুল্ল নাটকের প্রথম দৃশ্য হইতে আলোচ্য দৃশ্যের মধ্যবর্তীকালের হিসাব করিলে স্বতঃই মনে হয়—এত কম সময়ের মধ্যে সমাজে একদা-প্রতিষ্ঠাবান্ একজন ব্যক্তি একটা স্বভাব-ভিক্ষুকে পরিণত হইতে পারেন না। নাটকেও দেখা যায়—যোগেশ অপরিমিত মদ্যপান করিতেছেন বটে, কিন্তু নিজের সম্মান এবং সুনাম সম্পর্কে জ্ঞান এতটুকুও হারান নাই; মাকে বলিতেছেন—'মা, আমার সুনাম গেছে—আমার সব গেছে।' এ-হেন আত্মমর্যাদাজ্ঞান-সম্পন্ন যোগেশের পক্ষে নির্লজ্জের মত রাস্তায় হাত পাতিয়া একটা পয়সা চাওয়া অনেকখানি অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য অনেকে প্রতিবাদ-স্বরূপ এস্থলে শুঁড়িখানার দৃশ্যের উল্লেখ করিতে পারেন—যে-যোগেশ প্রকাশ্য দিবালোকে শুঁড়িখানার ইতর মাতালদের সঙ্গে 'রাণী মুদিনীর গলি' বলিয়া মাতলামির চরম করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে হাত পাতিয়া পয়সা চাওয়া কি অসঙ্গত? ইহার বিরুদ্ধে দুটি কথা বলিবার আছে। প্রথম, মনে রাখিতে হইবে শুঁড়িখানার দৃশ্যে যোগেশ যে-কাণ্ড করেন তাহা চুরচুরে মাতাল অবস্থাতেই করেন। তখনও তিনি জ্ঞানহীন, নিজে জানেন না—কী করিতেছেন। তবে পয়সা চাওয়ার দৃশ্যে মানসিক বিকারগ্রস্ত বটে, কিন্তু মাতাল নন। দ্বিতীয় কথা এই যে, এক অর্থে শুঁড়িখানার দৃশ্যটি যোগেশ-চরিত্রের পক্ষে অসংগতিমূলক। যিনি বেশ মাতাল অবস্থাতেও নিজের পূর্ব সুনামের কথা ভুলিতে পারেন না, রমেশ সুযোগ বুঝিয়া দলিল সই করাইয়া লইলেও বুঝিতে পারিয়া 'কি ভাবছ—নিজের কাজ গুছিয়েছ? মা আমার রত্নগর্ভা! তার এক ছেলে মাতাল, এক ছেলে জোচ্চোর, আর এক ছেলে

চোর' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে পারেন, তিনি শুঁড়িখানার ইতর মাতালদের গলা ধরিয়া অমন মাতামাতি করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করা শক্ত হইয়া উঠে। অবশ্য বেশ কিছুটা কাল অমনি কাটিলে যখন সুনাম হারাইবার ভয়ও আর থাকিত না, তখন যোগেশের পক্ষে ইতর মাতাল হওয়া অস্বাভাবিক হইত না। কিন্তু এ স্থলে পূর্বোত্তর ঘটনাবলী এবং ক্রিয়াকলাপাদির বিচার করিয়া সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার করিতে হইবে। এবং এই জন্যই, অর্থাৎ যোগেশ-চরিত্রের কার্যকারণ সূত্রকে যথাসম্ভব বজায় রাখিবার জন্যই শিশিরকুমার প্রথম হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করেন। মদ খান. বটে, কিন্তু মেলাই মাতলামি করেন না। তাই পয়সা চাওয়ার দৃশ্যে তাঁহার অভিনয় যোগেশ-চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতভাবেই তাল রাখিয়া বিদগ্ধ দর্শককে মুগ্ধ করে; তিনি যে একজন চরিত্র-বিশ্লেষক অভিনেতা ঐ একটি দৃশ্যেই তাহার আশ্চর্য প্রমাণ পাওয়া যায়।...

"শ্রেষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীই শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ। কিন্তু প্রকাশভঙ্গী আলাদা কোনও বস্তু নয়, উহা ভাব, ছন্দ এবং বাণী সুষমার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। পৃথকভাবে উহার ব্যাখ্যা চলে না। রং, পাপড়ি, গন্ধ মিলাইয়াই সমগ্র ফুল। রূপসজ্জা, বাচনভঙ্গী, আঙ্গিক অভিব্যক্তি সব কিছু মিলিয়াই চরিত্র-বিশ্লেষণী, তথা উচ্চপ্রথম শ্রেণীর অভিনয়। অনেক সময় অভিনেতার রূপসজ্জার মধ্যেও চরিত্র বিশ্লেষণের ইঙ্গিত থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিশিরকুমারের যোগেশের রূপসজ্জার উল্লেখ করা যায়। মদ কিনিয়া খাইবে বলিয়া যোগেশ যখন রাস্তায় রাস্তায় পয়সা ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে, তখনকার যোগেশরূপী শিশিরকুমারের মঞ্চসজ্জার কথা স্মরণ করুন। পরিধানে শতছিন্ন গ্রন্থিযুক্ত ময়লা কাপড়, কিন্তু গায়ে দামী শাল। ঐ রূপসজ্জা দ্বারা অভিনেতা বুঝাইতে চাহিয়াছেন—যোগেশ অধঃপতনের পথে নামিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু আভিজাত্যবোধকে ত্যাগ করিতে পারে নাই; গায়ের দামী শালটার মত এখনও উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

"বাচনভঙ্গীতেও অভিনেতার চরিত্র বিশ্লেষণী প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে ও দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে শিশিরকুমারের যোগেশ-চরিত্রাভিনয়ের উল্লেখ করিব। তাঁহার অননুকরণীয় বাচনভঙ্গী যে কিরূপে নাটকীয় চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার ক্ষমতা রাখে, যোগেশের অতি বিখ্যাত উক্তি

'একটা পয়সা দাও না—একটা পয়সা' সম্পর্কে আমি বিশদরূপে তাহা বলিয়াছি।"

শিশিরকুমারের 'যোগেশ' সম্পর্কে 'নাচঘর' পত্রিকার মন্তব্য ঃ—

"সেই বেগস্পন্দিতভাবের প্রবাহে যোগেশের মনের কথা যতদূর ফোটাবার তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারপর 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—এই কথাগুলি বলবার সময়ে শিশিরকুমার তাঁর মুখে বারংবার যে কান্নামাখা হাসির অবতারণা করেছিলেন তা যেমন বিচিত্র, তেমনি অপূর্ব। এ হাসি তাঁর নিজের সৃষ্টি। কথিত আছে, গিরিশচন্দ্র এখানে প্রস্তরীভূত মূর্তির মত স্তম্ভিত হয়ে থাকতেন, অর্ধেন্দুশেখর মুখ ঢেকে রোদন করতেন, অমরেন্দ্রনাথ অধীরভাবে চেঁচিয়ে উঠতেন এবং দানীবাবু অর্ধচেতন ও অর্ধ-অচেতনের মতন হয়ে থাকতেন। কিন্তু শিশিরকুমার এই দৃশ্যে যোগেশ চরিত্রের যে conception বা ধারণা করেছিলেন তাতে এই অর্ধ উন্মাদের মত কান্নামাখা হাসি তাঁর মুখে চমৎকার মানিয়েছিল।"

২৭শে জুলাই খোলা হল দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'।

শিশিরকুমার নিমচাঁদ দত্তর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

কোন কোন সমালোচক নাকি অভিমত প্রকাশ করেছেন 'মদ্য পানের কুফল প্রচারই এই নাটক প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য'।

কিন্তু উত্তরকালে শিশিরকুমার বলেছেন, "আমি মনে করি this is one of the best plays in Bengali literature. এর মুখ্য উদ্দেশ্য শুধু মদ খাওয়াকে গালাগাল দেওয়া নয়, বাঙালীর মধ্যে যে নকল সাহেব হওয়ার আদিখ্যেতা তাকেই স্যাটায়ার করা।"

'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে তখন শিশিরকুমার 'সধবার একাদশী' সেই শেষবার revive করেছেন। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় এক সন্ধ্যায় এই নাটকের অভিনয় দেখতে গেছেন। অভিনয়ের শেষে তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা করেন। শিশিরকুমার তখন তাঁকে বলেছিলেন, "নিমচাঁদের জীবনটা ছিল ফ্রাসট্রেসনে ভরা। এত বড় শিক্ষিত এক যুবক। ইংরেজ তাকে দিত কী? কেরানীর চাকরি! এত বড় ইংরেজীনবিশ কি না কেরানী হয়ে সাহেব সেবা করবে! তাই তাকে করতে হল বিদ্রোহ। কিন্তু বিদ্রোহই বা তখনকার দিনে করে কী করে! তাই তাকে ধরতে হল মদ। সেই তার বিদ্রোহ। অমন একটা গুণী লোক উৎসন্ন গেল।

সেও এক রকম বিদ্রোহ। বিদ্রোহী নিমচাঁদকে দেশ একদিন চিনবে। সে মাতাল নয়। সে স্বাধীন।"

বাগবাজারের সখের দলের সঙ্গে এই নাটকেই গিরিশচন্দ্র মঞ্চে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের দুর্গাসপ্তমীর রাত্রে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুজ্জের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ির উঠোনে সে অভিনয় হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। উত্তরকালে রসরাজ অমৃতলাল লিখেছিলেন ঃ—

"—মদে মত্ত পদ টলে
নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ
নব নটগুরু তার—"

গিরিশচন্দ্রের নটজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'নিমচাঁদ'। এই ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র অতুলনীয় ছিলেন। গিরিশচন্দ্র যেন জীবন্ত 'নিমচাঁদ'। দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতকুমার মিত্র একটি কবিতায় লিখেছেন ঃ—

"নিমচাঁদ ভূমিকায় তুষি সুধীজন
নিদ্রাশেষে যবে তুমি হলে জাগরিত।
দেখিলা জয়ের ধ্বনি কাঁপায়ে পবন
গৃহপথ রঙ্গমঞ্চ করে মুখরিত॥"

এখন শিশিরকুমার নিমচাঁদের ভূমিকায় কেমন অভিনয় করলেন? এই প্রসঙ্গে নাট্যরসজ্ঞ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখেছেন ঃ "'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ তাঁর এক অতুলনীয় সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্রের নিমচাঁদ দেখি নি। তুলনা করতে পারলুম না।"

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর মতেও শিশিরকুমার নিমচাঁদের ভূমিকায় 'অপ্রতিরোধ্য'। তিনি লিখেছেন ঃ "...এই শিশিরকুমারই 'সধবার একাদশী'তে এক তুলনাহীন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়ে এই নাটকটি দেখার সুযোগ ঘটেনি আমার; আমি দেখেছিলাম শ্রীরঙ্গমে, তাঁর অপরাহ্ণকালে, কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশত যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এই তিন জনেই জীবিত ছিলেন তখনও, এবং এঁদের প্রণীত ডেপুটি, অটল ও বাঙালটিকে আমার মনে হয় না, আমি কখনো ভুলতে পারব। যদিও লোকপ্রিয়তায় 'সীতা' সর্বাগ্রগণ্য, তবু শিশিরকুমারের সৃষ্টির

তালিকায় 'সধবার একাদশী'কে আমি প্রথমে স্থান দিতে চাই ; অমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রূপকর্ম তিনিও আর পরিবেশন করেন নি।"

৬ই আগস্ট।

শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' মঞ্চস্থ হল। মঞ্চে শরৎ-শিশির প্রতিভার যোগাযোগ এই প্রথম। 'ষোড়শী'র বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এই ভাবে :—

"শরৎচন্দ্রের অপূর্ব প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান

নূতন সামাজিক নাটক

ষোড়শী

ষোড়শী ভৈরবী গড়চণ্ডীর প্রধানা সেবিকা সন্ন্যাসিনী। অস্ফুটন্ত কোরকটির মত—সে যখন অতি ছোট মেয়ে, নারীর প্রাণের গোপন ক্ষুধার রহস্য তার হৃদয়ের দ্বারে কোনো আঘাত দেয় নি —সেই সময়ে এক অর্ধরাত্রির স্তিমিত আলোকে তন্দ্রাতুরা চোখে সে দেখেছিল শুভবিবাহের শুভদৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার স্বামীকে—সে রাত প্রভাত হোল না—তার আগেই জীবনের খরস্রোতে কোথায় ভেসে গেল স্বামী আর কোথায় ভেসে গেল স্ত্রী। একজন তলিয়ে গেল জীবনের পঙ্কিলতার তলায়—আর একজন ভেসে উঠল পঙ্কের স্পর্শ থেকে ঊর্ধ্বে'র—শুভ্র পঙ্কজের মত। দুজনে দেখা হোল। এই দেখার গতি ও পরিণতি নিয়েই 'ষোড়শী' নাটক।"

ভূমিকালিপি :—জীবানন্দ—শিশিরকুমার ভাদুড়ী, এককড়ি—গোপাল ভট্টাচার্য, জনার্দন—যোগেশ চৌধুরী, শিরোমণি—অমলেন্দু লাহিড়ী (নির্মলেন্দু লাহিড়ীর ভ্রাতা), প্রফুল্ল—রবি রায়, তারাদাস—হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়, নির্মল—শৈলেন চৌধুরী, সাগর সর্দ্দার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হৈমবতী—পদ্মা, ষোড়শী—চারুশীলা।

শিশিরকুমারের 'জীবানন্দ' সম্পর্কে স্বর্গত সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন : "ষোড়শীতে তাঁর জীবানন্দ—এমন অনবদ্য অভিনয়—যদিও আমি সেই গিরিশ-চন্দ্রের আমল থেকে কোন নাটকের কোন অভিনয় দেখতে বাকি রাখি নি—তবু আমার মনে হয় এমন অভিনয় বাঙলা রঙ্গমঞ্চে পূর্বে কখন দেখি নি। তাঁর অতি বড় শত্রুও স্বীকার করেছিল—He revealed talents of a master artist."

'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার মন্তব্য :—"In the role of Jivananda Mr. Bhadury revealed talents of the master actor. The audience remained spell-bound by the graceful and free movements. Constant modulation of voice was the special feature and the acting of Sisir was superb."

রসরাজ অমৃতলাল বসু বলেছিলেন, "পার্টে জীবন দেবার ক্ষমতা ছিল তার (অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর) অপূর্ব। এ যুগে দেখতে পাই তা একমাত্র শিশিরের আছে। 'ষোড়শী'র জীবানন্দের মত wretched part-এ dignity দেওয়া একমাত্র শিশিরেরই সম্ভব।...He is a genius...শিশিরের সম্পর্কে এই বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে, এটা শিশিরের যুগ। যেমন গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখরের যুগ গিয়েছে, তেমনি এটা শিশিরের যুগ।"

'ষোড়শী'র অভিনয় দেখে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট তারিখে শরৎচন্দ্র বেহালার জমিদার মনীন্দ্রনাথ রায়কে এক চিঠিতে লেখেন:—

"ষোড়শী অভিনয় আমি একবার মাত্র দেখেছি।...বাস্তবিকই শিশির এবং চারুর (জীবানন্দ-ষোড়শী) অভিনয় দেখবার মত বস্তু।"

১৩৩৪ সালের ২৩শে ভাদ্র তারিখের এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র কবি রাধারানী দেবীকে লিখছেন :—

"ষোড়শী বইটা পোড়ো। বোধহয় তোমার মন্দ লাগবে না। আর অভিনয় দেখবার যদি সময় পাও, সত্যিই খুশি হবে। শিশির কি শেখানোই শিখিয়েছে। আমি একটি দিন মাত্র দেখেছি। সেদিন আবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়ে শরীরটা পীড়িত হয়েছিল। তবু চমৎকার লেগেছিল।"

কবি রাধারানী দেবী 'ষোড়শী' অভিনয় দেখেছেন এই সংবাদ পেয়ে তাঁকে আর একটা চিঠিতে লিখছেন :—

"রাধে, 'ষোড়শী' দেখে খুশি হয়েছ শুনে আমিও খুশি হলাম। বাস্তবিক কি চমৎকার অভিনয় করে শিশির। আরও চমৎকার তার শেখানোর পদ্ধতি। অদ্ভুত ধৈর্যের সঙ্গে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে থাকতে পারে। তারই বাহাদুরি।"

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথার উল্লেখ করি। উত্তরকালে শরৎচন্দ্র তাঁর কোন এক বইয়ের নাট্যাভিনয় নিয়ে একবার শিশিরকুমারকে বলেছিলেন, "দেখ, শিশির, তুমি আমার বইয়ের ডায়ালগ আদৌ বদলাবে না, বইয়ে যেমন

আছে, তেমনি রাখবে। আমার বইয়ের পাত্রপাত্রীদের মুখে যে সব ডায়ালগ আছে, তা সবাই পছন্দ করে। আমার বই কুকুরের গলায় বেঁধে দিলেও সবাই পড়বে।”

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে শিশিরকুমার তাঁকে বলেছিলেন, “না শরৎবাবু তা নয়। কেউ পড়বে না, কিন্তু এই শিশির ভাদুড়ী কোনও ডায়ালগ না বলে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু যদি এ, বি, সি, ডি আবৃত্তি করতে থাকে তা হলেও লোকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনবে ও দেখবে। অন্য লোকেও ত আপনার বই অভিনয় করল। কিন্তু কই তারা তো আপনার বই আদৌ জমাতেই পারল না।”

শিশিরকুমারের ‘জীবানন্দ’ সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: “শিশিরকুমারের শক্তি ও কলাজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান আমরা এই জীবানন্দের ভূমিকার মধ্যে লাভ করেছি। শরৎচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার মিলনে যে কি মধুর সুধার আস্বাদ লাভের সুযোগ উপস্থিত, না দেখে তার ধারণা করা অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব! শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্যে এ হচ্ছে আর এক অভিনব সৃষ্টি, নূতন রূপের তরঙ্গ, না-দেখা ভাবের মূর্তি!

“রঙ্গালয়ের জীবানন্দ কোথাও কর্ণভেদী গর্জন বা হস্তপদের প্রচণ্ড আস্ফালন করে নি কিংবা মুখ বিকৃত করে কোলের ছেলেদের ককিয়ে তোলে নি; অথবা চলচ্চিত্র ও বিলাতী অভিনয়ের সচিত্র কেতাব থেকে হরেকরকম ভঙ্গী চুরি করে আমাদের চোখকে চমক দেয় নি। কিন্তু এ রকম ভূমিকায় যা পাওয়া উচিত আমরা তা থেকে কিছুমাত্র বঞ্চিত হই নি। বর্তমান যুগে শিশিরকুমার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেন? তিনি এখনকার আর সব নটের চেয়ে সরলভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারেন। এবং তিনি কেবলমাত্র স্বাভাবিকতার মুখ চেয়ে থাকেন না, উপরন্তু স্বাভাবিকতাকে নিজের ইপ্সিত আকারের মধ্যে এনে স্বেচ্ছামত রূপ দিতে পারেন—ভাস্করের হস্তে কর্দমপিণ্ড যেমন তাঁর স্বেচ্ছামত আকার লাভ করে। পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম দৃশ্যে শিশিরকুমারের অভিনয়ে বিশেষ করে যে সৌন্দর্য, যে ভাববৈচিত্র্য ও যে হাসিকান্নার প্রশান্ত ইঙ্গিত ফুটে ওঠে, দর্শকের হৃদয় তাতে মৌন প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারে না। জীবানন্দের ভূমিকায় আমরা যা দেখেছি তা অভিনয় নয়,—অভিনয় বললে তাকে যেন ছোট করা হয়,—আসলে তা হচ্ছে

সৃষ্টি, স্বাধীন সৃষ্টি,—যা নাটকের মুখাপেক্ষা করে না। আমাদের বিশ্বাস, শিশিরকুমার জীবানন্দের স্রষ্টার মানস-কল্পনাকেও অতিক্রম করেছেন।"

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ "'ষোড়শী'র জীবানন্দে তিনি যা দিয়ে গেলেন, বঙ্গ-রঙ্গালয়ে তা অতুলনীয় হয়ে রইল ; এ জীবানন্দ যেন শরৎচন্দ্রের জীবানন্দকে ছাপিয়ে গেল।"

শিশিরকুমারের অতুলনীয় অভিনয়-প্রতিভা শরৎচন্দ্রের ভাব-কল্পনাকে অদ্ভুতভাবে মূর্ত করে তুলল। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র শিশিরের অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া বারবার স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা চরিত্র সৃষ্টির সময় চরিত্রের এত গভীরে অবতরণ, এত সূক্ষ্ম ও জীবন্তভাবে চরিত্রের প্রতিটি ভাবস্পন্দন, অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত কল্পনা করেন নাই। নাট্যকারের সৃষ্টি অভিনেতার রূপায়ণে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এমন অনেক জটিল ও রহস্যময় চরিত্র আছে যাহাদের সম্বন্ধে নাট্যকার নিজেও সম্পূর্ণ জ্ঞানের দাবী করিতে পারেন না, যাহারা তাঁহাদের চোখেও খানিক দুর্বোধ্যতার কুহেলিকায় আবৃত থাকে।...জীবানন্দ কতখানি পাষণ্ড ও কতটা হৃদয়বান, তাহার মধ্যে উচ্চ ও নীচ প্রবৃত্তি কি পরিমাণে মিশ্রিত, অত্যাচারী জমিদার ও ব্যথানিপীড়িত মানবসত্তার পরস্পরবিরোধী অংশ তাহার মধ্যে কি অপরূপ ঐক্যে সম্মিলিত, দুষ্ক্রিয়াসক্ত বিলাসী ও ট্রাজেডির উন্নতচরিত্র নায়ক কেমন করিয়া তাহার মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত, এই জটিল দ্বৈততত্ত্ব—যাহা হাজার বার বই পড়িয়া ও সহস্র প্রকারের সূক্ষ্ম সমালোচনার সাহায্যেও সুস্পষ্ট হইত না—শিশিরের অভিনয়ে খোলা বই-এর পাতার মতো সহজবোধ্য হইয়াছে। জীবানন্দের পরিবর্তন যে অতর্কিত ও অবিশ্বাস্য নহে, ধীরে ধীরে তুঁষের আগুনে পুড়িয়া তাহার অন্তর বিশুদ্ধ হইয়াছে, রায় মহাশয়ের ন্যায় ক্ষুরধার বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও চক্রান্তকুশল সমাজপতির বিরুদ্ধে, নিজে অপরাধের সহকারীরূপে জেলে যাইবার আশঙ্কার সম্মুখীন হইয়াও, সে যে তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া দাঁড়াইয়াছে—শিশিরের অভিনীত জীবানন্দকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা আমাদের নিকট সূর্যালোকবৎ স্পষ্ট হইয়া উঠে।"

নাট্যমন্দিরের যুগ শিশিরকুমারের গৌরবময় যুগ। এই যুগে শিশিরকুমার হয়ে উঠেছিলেন Demi-God. তাঁকে পথ দিয়ে যেতে দেখলে লোকে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করত। বিস্ময়কর প্রতিভা ও অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের জোরে

শিশিরকুমার নাট্যমন্দিরে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছিলেন বাংলার তাবৎ জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীদের। এই কথা স্মরণ করে উত্তরকালে শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখেছেন : "কিন্তু কলকাতার, সারা বাংলার শিক্ষিত সমাজে কেউ কি ছিলেন শিশিরকুমারের অভিনয় বিষয়ে উচ্ছ্বসিত নন ? মনীষীদের মধ্যে এমন কেউ, যাঁর অন্যতম গন্তব্য নয় নাট্যমন্দির ? ইতিমধ্যেই, মাত্র কয়েক বছরের মঞ্চ-জীবনের পরে, শিশিরকুমার প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছেন, প্রায় একটি রূপকথায়, আমরা তাঁকে তখনই প্রায় গল্পের মানুষের মত দেখেছি, যেন তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে, সাংসারিক আইন-কানুনের পরপারে। পণ্ডিত বলে যশস্বী তিনি, আলাপশিল্পে সুদক্ষ বলে ; আর তাঁর অভিনয়-প্রতিভা এমন স্পষ্ট, প্রোজ্জ্বল ও তর্কাতীত যে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অচিন্ত্য-কুমারকে কবিতা লিখতে হল। তাঁর কণ্ঠের 'সীতা' ডাক শুনে পুলকবেদনায় আপ্লুত হলো কলকাতা।

"যেমন তিনি অভিনয়ে অনন্য, তেমনি তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা অভিনেতা সৃষ্টি করে নেবার। তাঁকে কেন্দ্র করে আর যাঁরা বিকশিত হলেন : যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী কঙ্কাবতী—এই সব মৃত মানুষের নাম, আজকের তরুণদের কাছে যার কোন অর্থ নেই আর, সেই সব নাম কৃতজ্ঞ বেদনায় স্মরণ করা আমাদেরই কর্তব্য, আমরা যারা সেই সময়ে তরুণ ছিলাম। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রঙ্গমঞ্চে নতুন, কিন্তু শিশিরকুমারের এক-একটি প্রযোজনার প্রথম থেকে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কোথাও ছিল না আড়ষ্টতা বা ছন্দপতন ; আদ্যন্ত ছিল এক সুরে বাঁধা, একই সামঞ্জস্যের অন্তর্ভূত, এক পরিকল্পনার অগ্রগামী। 'সীতা', 'আলমগীর', 'ষোড়শী'—এই তিনটি নাটক অভিনীত হবার পরেই এই সত্যটি অনুভূত হল যে নাট্যমন্দির একটি রঙ্গমঞ্চমাত্র নয়, নয় কোন প্রমোদভবন যা থেকে বেরিয়ে এলে তার কথা আর বেশিক্ষণ মনে রাখতে হয় না ; তা আমাদের জীবনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে, হয়ে উঠেছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা বুদ্ধিজীবী প্রতি বাঙালীর অবশ্যকৃত্য।"

১৪ই সেপ্টেম্বর।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' মঞ্চস্থ হল।

শিশিরকুমারের জন্য কবি 'গোড়ায় গলদ' নাটকটিকে সংস্কার করে 'শেষরক্ষা'য় পরিণত করেন।

ভূমিকালিপি ঃ—চন্দ্রকান্ত—শিশিরকুমার, বিনোদ—রবি রায়, গদাই—শৈলেন চৌধুরী, নিবারণ—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শিবচরণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ললিত—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ক্ষান্তমণি—চারুশীলা, কমলমণি—কৃষ্ণভামিনী, ইন্দুমতী—প্রভা।

'শেষরক্ষা'র অভিনব বিজ্ঞাপন ঃ—

প্রজাপতয়ে নমঃ

সবিনয় নিবেদনমেতৎ,

ভদ্রমহোদয়গণ, আগামী ২৮শে ভাদ্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর, বুধবার সন্ধ্যা ৭॥০টায় গোধূলি লগ্নে আমার বন্ধু, বাংলা সাহিত্যের উদীয়মান তরুণ কবি-সম্রাট শ্রীমান বিনোদবিহারী বাবুর সহিত স্বর্গীয় আদিত্যবাবুর কন্যা শ্রীমতী কমলমুখী দেবীর পরিণয় মদীয় নাট্যমন্দির ভবনে সুসম্পন্ন হইবে। ঐ রজনীতে ঐ বিবাহের পরে মধ্যরাত্রে সুতহিবুকযোগে সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিবচরণ বাবুর পুত্র মেডিক্যাল স্টুডেন্ট আমার অন্যতম বন্ধু ধীমান গদাইচরণের সহিত নিবারণবাবুর কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতীর মহাসমারোহে শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রথমোক্ত বিবাহের ফুলশর শব্দভেদী বাণের দ্বারা পরিণয় সূচনা করিবেন এবং শেষোক্ত বিবাহে বাসরঘরের দ্বারের অর্গল পুরুষ-সাধারণের পক্ষ হইতে আমি নিজেই উন্মুক্ত করিব। নিমন্ত্রিত বন্ধুবর্গকে ভরসা দিতেছি বাসরঘরের গোপন সঙ্গীত শুনিবার চিরন্তন বাধা দূর করিয়া সেই অমৃত-লোকে প্রবেশাধিকার তাঁহাদিগকে প্রদান করিব।

মহাশয়গণ, সবান্ধবে মদীয় নাট্যমন্দির ভবনে শুভাগমন করিয়া মহাসমারোহে শুভকার্য সুসম্পন্ন করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ইতি ১০ই ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল—

বিনীত

'চন্দর দা'

দলের চাঁই

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ লৌকিকতা গ্রহণে আদৌ অক্ষম নহি।

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখেছেন ঃ " 'শেষরক্ষা'য় চন্দ্রবাবু শিশির কুমারের এক সৃষ্টি ; এর অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের

ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেন। অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রীত হলেন। শিশির-কুমার তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন।"

শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান কি ভাবে ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন তার বিবরণ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "শেষরক্ষার একটি দৃশ্যের একটি অভিনব পরিকল্পনার কথা একদিন শিশিরকুমার আমাকে বললেন। তাঁর অনুরোধ মত আমি পাঁচ-ছয়জন গায়ক বন্ধু সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারে গেলাম। শেষরক্ষার গানের রিহার্স্যাল চলছে তখন। শিক্ষক স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিশিরকুমারের নির্দেশ মত দীনুবাবু আমাদের এই নবাগত গায়কের দলকে রবীন্দ্রনাথের 'ওগো তোমরা সবাই ভালো' গানটি শিখিয়ে দিলেন। শেষরক্ষার প্রথম অভিনয়-রজনীতে রঙ্গমঞ্চের মাঝখান থেকে একটি সুপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি দিয়ে প্রেক্ষামণ্ডপের সঙ্গে সংযোগ সাধন করা হয়েছে। সিঁড়িটা লাল সালু দিয়ে মোড়া এবং প্রেক্ষামণ্ডপের মধ্যপথটিতেও আগাগোড়া লাল সালু পাতা হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন কোন সম্মাননীয় অতিথি বাইরে থেকে এই লাল সালু-পথের ওপর দিয়ে এসে রঙ্গমঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু তা নয়। অভিনয় আরম্ভ হল। শিশিরবাবুর পরামর্শ মত আমরা গায়কের এক একজন বিচ্ছিন্ন ভাবে সমস্ত প্রেক্ষামণ্ডপটির নানা স্থানে এক-একটি আসনে বসে গেলাম। শেষ দৃশ্য। গদাই-এর বিবাহ-রজনী। শিশিরকুমার চন্দ্রবাবুরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। এই দৃশ্যে চন্দ্রদারূপী শিশিরকুমার একগাদা কাগজ হাতে নিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে সেই সালু-মোড়া সিঁড়ি বেয়ে প্রেক্ষামণ্ডপে নেমে গিয়ে দর্শকদের সঙ্গে সামাজিক সৌজন্যমূলক আদর আপ্যায়ন করতে লাগলেন। দর্শকরা যেন এই শুভ বিবাহের নিমন্ত্রিত অতিথি। সেই আপ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের বাণ্ডিল থেকে প্রীতি-উপহার বিতরণ করলেন দর্শকদের। প্রীতি-উপহারে ছাপা রয়েছে ঐ 'ওগো তোমরা সবাই ভালো' গানটি। রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আপন-আপন অংশ অভিনয় করে চলেছেন। ক্রমে গানটি গাইবার সময় এলো। রঙ্গমঞ্চের নট-নটীরা গানের প্রথম লাইনটি একটিবার গাইবার পর দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তির সময় চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন আমরা সমস্বরে প্রেক্ষামণ্ডপ থেকেই যোগ দিলাম রঙ্গমঞ্চের গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে। কেবল আমরাই নই—দর্শক সাধারণের ভিতর থেকেও বহুলোক কণ্ঠসংযোগ করলেন আমাদের সঙ্গে। সমবেত কণ্ঠে

সে এক অপূর্ব কোরাস গান। শিশিরকুমার আবার নেমে এলেন প্রেক্ষামণ্ডপে। এসেই 'আসুন আসুন উপরে আসুন' বলে বেছে বেছে আমাদের এই গায়কের দলটিকে মঞ্চের উপরে হাত ধরে নিয়ে গেলেন। আবার আরম্ভ হোল সমবেত কণ্ঠের গান।"

'নাচঘর' পত্রিকার মন্তব্য: "স্বয়ং শিশিরকুমার এই ভূমিকাতে সম্পূর্ণ নূতনভাবে অভিনয় করে দেখিয়েছেন, হাস্যাভিনয়ে তাঁর কতখানি ক্ষমতা এতদিন প্রচ্ছন্ন হয়েছিল। 'আলমগীর' ও 'চাণক্য' যে 'নিমচাঁদ' ও 'চন্দ্রবাবু'-রূপে এতটা অপরিচিত মূর্তিতে দেখা দিতে পারেন, সত্যই তা কল্পনাতীত।"

'শেষরক্ষা'র অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে বেড়া তুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন শিশিরকুমার। তাঁর প্রয়োগ নৈপুণ্যের এই কলাকৌশল প্রসঙ্গে জনৈক নাট্যরসজ্ঞ লিখেছেন: 'Fuchs, Littman, Copeau প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রয়োগকর্তারা এবং Meierhold ও Reinhardt যে চেষ্টা সফল করেছেন—'শেষরক্ষা'র অভিনয়ে বাংলা দেশে সর্বপ্রথমে এই উপভোগ্য আধুনিকতার সূচনা হয়েছে।

'শেষরক্ষা'র শেষ দৃশ্যের অভিনয়কালে দর্শকরা রঙ্গমঞ্চের উপরে গিয়ে অভিনেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং অভিনেতারা প্রেক্ষাগৃহে নেমে এসে দর্শকদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। ব্যাপারটা এমন নূতন যে অনেক দর্শকই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এই নূতনত্বের আসল কারণ বুঝতে পারেন নি।

"এই যে 'Theatrical intimacy', এর আর এক নাম হচ্ছে unity of action এবং এজন্যে মায়ারহোল্ড প্রভৃতিকে সমগ্র রঙ্গালয়ের গড়ন বদলাতে হয়েছে। নাট্যমন্দিরে আপাততঃ সে সুযোগ নেই, কাজেই রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত সোপান শ্রেণী স্থাপন করে শিশিরকুমার অন্তরঙ্গতার বাধা যতটা সম্ভব দূর করেছেন।"

এই কালেই শিশিরকুমার সর্বপ্রথম অভিনয়ের থিয়েটার-রূপকে বর্জন করে যাত্রা-রূপকে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করলেন; Picture frame stage তুলে দেবার কথা বললেন। তিনি লিখলেন: "বাঙলা দেশে রঙ্গমঞ্চের কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম মনে হয় এদেশে রঙ্গালয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। যে দেশের লোক দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না সে দেশের লোক দুটি তিনটি রঙ্গালয় চালাতে পারে বলে আমার

বিশ্বাস নেই। বিলাতী আদর্শে আমাদের রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা—বিলাতী বললে ভুল হয়,—ইংরেজী। কিন্তু ইংরাজ অভিনেতারা কোনদিনই অভিনেতা হিসাবে Continental Actor-দের সমকক্ষ নন। ইংলণ্ডে Drama-র উৎকর্ষ হয়েছিল Shakespeare-এর সময়, কিন্তু Shakespeare-এর যুগটা Robust Realism-এর যুগ ছিল না। দৃশ্যপট ও property-র বাহুল্য যেটা আজকাল অপরিহার্য বলে মনে হয় সেইটাই তো বড়ো জিনিষ নয়। তার চেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে অভিনয়। আমরা ভুল করেছি ইংরাজী আদর্শের অনুকরণ করতে গিয়ে—সত্য জিনিসটাকে বাদ দিয়ে মিথ্যাটাকে বড় করেছি। এ ভুল আমাদের শোধরাতে হবে।—ফিরে যেতে হবে পুরনো যাত্রার রাস্তায়, —রসসৃষ্টি করতে হবে। স্টেজটা painter-এর সম্পত্তি না হয়ে হওয়া উচিত অভিনেতার আসর।"

একটি অবিস্মরণীয় অভিনয়-বাসর যাপনের মধুর স্মৃতির কথা শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল-যুগ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যনিকেতনে একদা রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন 'শেষরক্ষা' দেখতে। সেটা 'কল্লোলের' পক্ষে একটা স্মরণীয় রাত, কেন না সে অভিনয় দেখবার জন্যে 'কল্লোলের' দলেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। আমরা অনেকেই সেদিন গিয়েছিলাম। অভিনয় দেখবার ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছি তাতে কখন ও কতটুকু হাসির রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। স্বভাবতই, অভিনয় সেদিন ভয়ানক জমেছিল, এবং 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে' গানের সময় অনেক দর্শকও সুর মিলিয়েছিল মুক্তকণ্ঠে। শেষটায় আনন্দের লহর পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে। শিশিরবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলেন কবির কাছে, অভিনয় কেমন লাগল তাঁর মতামত জানতে। সরলস্নিগ্ধ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কাল সকালে আমার বাড়িতে যেও, আলোচনা হবে।' আমাদের দিকেও নেত্রপাত করলেন: 'তোমরাও যেও।'

"দীনেশদা, নৃপেন, বুদ্ধদেব আর আমি—আর কেউ সঙ্গে ছিল কিনা মনে করতে পারছি না—গিয়েছিলাম পরদিন। শিশিরবাবুও গিয়েছিলেন ওদিক থেকে। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসবার ঘরে একত্র হলাম সকালে। স্নানশেষে রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকলেন।

"কি কি কথা হয়েছিল স্পষ্ট কিছু মনে নেই। ইংরিজি পাবলিক কথাটার

রসাত্মক অর্থ করেছিলেন—লোকলক্ষ্মী—এ শব্দটা গেঁথে আছে। সেদিনকার সকালবেলার সেই ছোট্ট ঘটনাটা উল্লেখ করছি, আর কিছুর জন্যে নয়, রবীন্দ্রনাথ যে কত মহিমাময় তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বলে। এমনিতে শিশিরকুমার আমাদের কাছে বিরাট বনস্পতি—অনেক উচ্চস্থ। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথের সামনে ক্ষণকালের জন্যে হলেও শিশিরকুমার ও আমাদের মধ্যে যেন কোনই প্রভেদ ছিল না। দেবতাত্মা নগাধিরাজের কাছে বৃক্ষ-তৃণ সবাই সমান।”

২৩শে নভেম্বর।

দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সাজাহান’।

শিশিরকুমার নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ৩১শে ডিসেম্বর নামলেন ‘ঔরংজেব’-এর ভূমিকায়।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট মিনার্ভা থিয়েটারে ‘সাজাহান’ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। নাম ভূমিকায় প্রিয়নাথ ঘোষ আর ঔরংজেবের ভূমিকায় ছিলেন দানীবাবু।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর আর্ট থিয়েটারে নব পর্যায়ে এই নাটকের পুনরভিনয় হয়। তখন সাজাহানের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী আর ঔরংজেবের ভূমিকায় দানীবাবু অভিনয় করেছিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটারে যোগদান করে সেখানেও সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

শিশিরকুমারের ‘সাজাহান’ সম্পর্কে ‘নাচঘর’-এর মন্তব্য ঃ

“নাটকের কেন্দ্র হচ্ছে সাজাহানের চরিত্র। সেখানে যুগপৎ বন্যা আর মরু-ঝটিকা এবং তারই মধ্যে অভাবিত ভাবে দেখা গেল রোগে দুঃখে পঙ্গু ভারত-সম্রাট সাজাহান; সম্মুখে তাঁর অমরপ্রেমের মর্মরস্মৃতির দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাজমহল। প্রাসাদচক্রান্ত সৃষ্টি করেছে এক দুঃসহ অসহায় অবস্থার। তাঁর পায়ের তলা দিয়ে এই যে মর্মভেদী বিপুল ট্র্যাজেডির লীলা বয়ে যাচ্ছে, তা সম্রাট সহ্য করছেন কেবলমাত্র তাঁর জীবন-মরণের চির-আরাধ্যা, অতুল স্নেহ ও প্রেমের মানসীপ্রতিমা মমতাজের মুখ স্মরণ করে। তাঁর করুণ দৃষ্টি দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে শুধু যেন এই মৌনবাণীই ফুটে উঠছে—‘যে-পৃথিবী আমার মমতাজের চরণস্পর্শ পেয়েছে, সে কি এই পৃথিবী; হা ঈশ্বর—সে কি এই পৃথিবী!’...তাঁর ঠোঁটের একটু-

খানি বাঁকা রেখা ও তাঁর চোখের ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিও কত বেশী ভাব প্রকাশ করে। একটু দেহের কাঁপন, সামান্য আঙুল নাড়ার ভিতরেও কী গভীর অর্থ নিহিত আছে।”

‘সাজাহান’-এর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী এবং শিশিরকুমারের অভিনয়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী। তিনি লিখেছেন:

“সাজাহান কীর্তিমান মুঘল সম্রাট। কিন্তু সাজাহান নাটকের চরিত্রে সাজাহানের বীরত্ব, প্রেমিকত্ব, সৌন্দর্য-প্রীতি, শিল্প-প্রীতি প্রভৃতি উল্লেখের অবসরই ঘটে নাই। কারণ সাজাহান নাটকের কাহিনীর যবনিকা এমন সময়ে উন্মোচিত হইয়াছে, যখন সাজাহান বৃদ্ধ এবং দিল্লীর সিংহাসনের জন্য তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব আসন্ন। সেই নৃশংস দ্বন্দ্বের প্রতি-ক্রিয়াই—‘সাজাহান’ নাটকের সাজাহান-চরিত্রে প্রতিফলিত। তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব বৃদ্ধ পিতাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করিয়া ছলে বলে কৌশলে জ্যেষ্ঠ দারাকে হত্যা করিলেন, কনিষ্ঠ মোরাদকেও হত্যা করিলেন, অপর ভ্রাতা সুজাকে দেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। এবং তাঁহার কৃত এক একটি কার্য স্নেহার্ত অক্ষম সাজাহানের বুকে যে ক্ষোভ আর হাহাকারের তরঙ্গ তুলিল সাজাহান চরিত্র তাহারই বেদনাময় উচ্ছ্বাস। অহীন্দ্রবাবুর সাজাহান অভিনয়ে সম্রাট সাজাহানের রুদ্ধ আক্রোশই নিষ্ফলতায় গর্জন করিয়া ওঠে। ‘আমি বৃদ্ধ, অসহায়, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে, কিন্তু আমি সাজাহান’ অথবা ‘এই সাজাহান ভারতবর্ষকে এতদিন এমন শাসন করে এসেছে যে, একবার যদি সে তার প্রজাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে পারে তো তাদের মিলিত ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে শত ঔরংজেব ভস্ম হয়ে পুড়ে যায়’—এইরূপ উক্তিই অহীন্দ্রবাবুর সাজাহান অভিনয়ের মূলসূত্র। তদুপরি ‘পক্ষাঘাতে পঙ্গু’ কথাটিকে তিনি বিশেষ কাজে লাগাইয়া থাকেন। সম্পূর্ণ দক্ষিণাঙ্গ অবশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত—এইরূপ ভাব দেখাইয়া মঞ্চে তিনি যে-ভাবে পা টানিয়া টানিয়া চলেন, সাধারণ দর্শকের নিকট সেই কসরৎ বা প্যাঁচটি অতি উপাদেয় বোধ হইয়া থাকে। শিশিরকুমার এসব কিছুই করেন না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলেই যে অবশাঙ্গ হইবে এমন কোন কথা নাই। চিকিৎসাশাস্ত্রে পারেসিস্ (Paraisis) বলিয়া একটা কথা আছে, যাহা পক্ষাঘাতেরই সমার্থক। উহাতে অঙ্গ অবশ হয় না,

দুর্বল হয় মাত্র। শিশিরকুমার পক্ষাঘাতের সমর্থনে 'dead nerves' নয় 'weak nerves'-এরই অনুসরণ করেন। তা ছাড়া 'সাজাহান' নাটকের সাজাহানও অন্ধ পুত্রস্নেহকাতর অক্ষম বৃদ্ধ মাত্র। দেহের দিক হইতে নয়, মনের দিক হইতেই তিনি সম্পূর্ণ পঙ্গু অসহায়। শিশিরকুমারের অভিনয়ে প্রধান হইয়া ফুটে এই মানসিক পক্ষাঘাত। উহাতে খাঁটি ট্র্যাজেডির কোন দ্বন্দ্ব নাই, কোন প্রবল সংঘাত নাই, আছে কেবল অসহায়ের অক্ষম আর্তনাদ। মূল নাটকে আছে প্রথম অঙ্ক সপ্তম দৃশ্যে মহম্মদ চলিয়া গেলে সাজাহান চীৎকার করিয়া ডাকেন—'মহম্মদ! মহম্মদ!' কিন্তু মহম্মদ সে ডাকে সাড়া না দিয়াই চলিয়া যায়। সাজাহান তখন যেন অর্ধস্বগত ভাবেই বলেন—'চলে গেল! চলে গেল!' অভিনয়কালে শিশির-কুমার এই সংলাপের পরিবর্তন সাধন করেন। শত অনুনয়ের পরেও মহম্মদ চলিয়া গেল দেখিয়া সাজাহানরূপী শিশিরকুমার অসহায়ভাবে ভাঙিয়া পড়েন, তাঁহার মর্মস্থল ভেদ করিয়া একটি আর্তনাদই বাহির হইয়া আসে—'এ্যায় খোদা! এ্যায় খোদা!' ঐ অরন্তুদ কণ্ঠস্বরেই সাজাহান চরিত্রের নিঃসহায়তা প্রমূর্ত হইয়া ওঠে। এক কথায় বলা চলে—অহীন্দ্র-বাবুর সাজাহান সম্রাট সাজাহান, আর শিশিরকুমারের সাজাহান দ্বিজেন্দ্র-লাল রচিত স্নেহার্ত অক্ষম সাজাহান। 'কিং লিয়র'-এর ভূমিকায় অভিনেতা ব্যারির সঙ্গে গ্যারিকের যে পার্থক্য সাজাহানের ভূমিকায় অহীন্দ্র-শিশির-কুমারেও সেই পার্থক্য—

'A king, aye, every inch a king
Such Barry doth appear,
But Garrick quite another thing,
He is every inch King Lear.'

"'King Lear'-এর অনুকরণে সৃষ্ট সাজাহান চরিত্রাভিনয়েও শিশির-কুমার 'is every inch' স্নেহার্ত পিতা সাজাহান।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর আর একটি প্রবন্ধ 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় (২২শে জুলাই ১৯৬২) প্রকাশিত হয়েছিল। সে-প্রবন্ধটির নাম—"সাহ্‌জাহান-এর অভিনয়"। প্রবন্ধটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি ঃ—

"রঙ্গমঞ্চে 'শাহ্‌জাহান'-চরিত্রের অভিনয়ের কথা উঠলে সর্বাগ্রে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর কথাই মনে পড়ে। কারণ আজো সাধারণ বাঙালী দর্শকের

কাছে তিনি উক্ত চরিত্রের শ্রেষ্ঠ রূপকার বলে গণ্য। আমিও সর্বপ্রথম যখন তাঁর শাহ্‌জাহান-চরিত্রের অভিনয় দেখি তখন জনখ্যাতিজনিত আশা নিয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, প্রথম দিনেই ফিরেছি আশা-ভঙ্গের বেদনা নিয়ে।

"অভিনেতার প্রথম শর্তই হোল উচ্চারণ-বিশুদ্ধি। কিন্তু প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে যখনই 'আমি বৃদ্ধ কিন্তু আমি শাহ্‌জাহান'-এর 'শাহ্‌জাহান' সংলাপের 'শাহজাহান' উচ্চারণে শুনলাম—'শাহজেহান', তখন চমকে উঠলাম। একারটি এল কোথা থেকে? শুধু তাই নয়,—'জাহান' কথাটি যেভাবে উচ্চারিত হল, 'পরশুরাম'-এর 'Zানতি পারনা'র অনুকরণে তার লিখিত রূপ হয় 'Zেহান'। কিন্তু ফারসী ভাষায় দুটি 'জ' (বর্গীয়-জ এবং Z-রূপে উচ্চারিত 'জ') থাকলেও 'জাহান'-এর 'জ'-এর উচ্চারণ বর্গীয়-'জ'-এর অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, 'শাহ্‌জাহান'-এর প্রকৃত উচ্চারণ (দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন 'সাজাহান'। তৎকালে বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানের নিয়ম এখনকার মত নির্দিষ্ট ও সুস্পস্ট হয়ে ওঠে নি।)—"শাহ্‌জহাঁ" ('ন্' চন্দ্রবিন্দু হয়ে পূর্ববর্ণে বসে।) 'জাহাঁপনা' (জহান্-পনাহ্=জগতের আশ্রয়) শব্দে 'জাহান'-এর প্রায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমরা করে থাকি। কেউ যদি কূট তর্ক (তাও কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য, সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে; এবং ব্যক্তি নামের উচ্চারণে অবিশুদ্ধি সম্পূর্ণ অসংগত) তোলেন বাংলায় তো বহু বিদেশী শব্দের উচ্চারণ কিছুটা বিকৃত হয়েছে, তাহলেও এ প্রশ্ন থেকে যায়,—'জাহান্' 'জেহান' হল কোন যুক্তিতে।

"কিন্তু এহ বাহ্য! চরম বিস্ময় জেগেছিল শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর আঙ্গিক অভিনয় দেখে। দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ পদকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু কল্পনা করে তদনুরূপ অঙ্গ সঞ্চালন করছিলেন তিনি। শাহ্‌জাহান চরিত্রের প্রথম এবং তৎকালীন খ্যাতিমান অভিনেতা ছিলেন প্রিয় ঘোষ। তাঁর অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি; সুতরাং বলতে পারিনে—শাহ্‌জাহানের আঙ্গিক রূপ তিনি কি দিয়েছিলেন। অহীন্দ্রবাবুর রূপটি নিঃসন্দেহে অভিনব এবং দর্শকের নয়নলোভন। কিন্তু আমি ভেবে পেলাম না, শাহ্‌জাহানের এই দক্ষিণাঙ্গ বিকারের ইঙ্গিত নাট্যকার কোথায় দিয়েছেন। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের গোড়াতেই নাট্যকারের নির্দেশ আছে—'সাজাহান শয্যার উপর

অর্ধশায়িত অবস্থায় কর্ণমূল করতলে ন্যস্ত করিয়া অধোমুখে ভাবিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে একটি আলবোলা টানিতেছিলেন।' স্বীকার করা গেল, শাহ্‌জাহান বাম কর্ণমূল বাম করতলে ন্যস্ত করে অর্ধশায়িত ছিলেন। নিশ্চয়ই সেই কর দ্বারা আলবোলার নল ধরেন নি, ধরেছিলেন অপর করে, অর্থাৎ ডান হাতে। অর্থাৎ ডান হাতটিও সঞ্চালনযোগ্য ছিল। তাহলে দক্ষিণাঙ্গের পঙ্গুত্ব আসে কোথা থেকে? সহসা স্মরণ হল প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে মহম্মদের প্রতি শাহ্‌জাহানের উক্তি—'আমি আজ শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে; কিন্তু সম্রাট সাজাহান এ ভারতবর্ষ…' ইত্যাদি। তাহলে এই সংলাপের 'পক্ষাঘাতে পঙ্গু' কথাটিই অহীন্দ্রবাবুর 'শাহ্‌জেহান'—এর চাবিকাঠি!

"ভালো কথা। কিন্তু ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে,—পদ ও বাহু সহ দক্ষিণাঙ্গ যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় তাহলে অত্যল্পকাল (দু'-তিন মাস) মধ্যেই মুখের দক্ষিণাংশও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে বাধ্য। শাহ্‌জাহান নাটকের ঘটনাকাল ১৬৫৭ খ্রীঃ (শাহ্‌জাহানের অসুস্থতা) থেকে ১৬৬০ খ্রীঃ (মুরাদ হত্যা; ৫ম অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য) পর্যন্ত ধরা চলে। যেখানে তিন মাসেই মুখের দক্ষিণাংশের পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবার কথা সেখানে তিন বছরেও তা না হওয়া বাস্তববিরোধী। এক্ষেত্রে কথা উচ্চারিত হবে অস্পষ্টভাবে। অথচ অহীন্দ্রবাবু গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যুচ্চ গ্রামে এবং সুস্পষ্টরূপে সুদীর্ঘ সংলাপসমূহ উচ্চারণ করে যান। অর্থাৎ, দ্বিজেন্দ্রলালেরই হাসির গান 'নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর'-র অনুসরণে শস্তা হাততালির লোভে নিজেই নিজের বিরোধী হয়ে ওঠেন। তবু এমন স্ববিরোধী অভিনয়-কলা (কলা-ই বটে!) ও Acrobatics দেখে বাঙালী দর্শক উচ্ছ্বসিত হয়ে করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহে ভূকম্পের সৃষ্টি করেন।

"এ থেকে প্রমাণিত হয়, বাঙালী দর্শক আজও বিচার বিশ্লেষণ করে রস-উপভোগে অভ্যস্ত হন নি। এই স্তর থেকে রুচিকে উন্নত করবার দায়িত্ব অভিনেতার। প্রকৃত শিল্পী কখনও দর্শক-মুখাপেক্ষী হন না। দর্শককেই তাঁর মুখাপেক্ষী করে তোলেন। বাংলা মঞ্চে তার নজির খুব বেশি না থাকলেও কিছু আছে, আর সেই নিদর্শনের উজ্জ্বলতম উদাহরণ হলেন নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার।

"শিশিরকুমারের 'শাহ্‌জাহান' সাধারণ দর্শকের প্রিয় না হলেও নাট্যরসিকের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছে। 'পক্ষাঘাতে পঙ্গু' কথাটির

বিশ্লেষণে যে আঙ্গিক অভিনয় তিনি করেছেন তা যেমন বস্তুনিষ্ঠ, তেমনি চরিত্রানুসারী। ডাক্তারী শাস্ত্রে পক্ষাঘাত আছে দু'রকমের—প্যারালিসিস ও প্যারেসিস। যখন নার্ভগুলো মরে যায় তখনই আসে সম্পূর্ণ অসাড়তা, আর সেই অবস্থাটাই প্যারালিসিস। কিন্তু যখন নার্ভগুলো খুব দুর্বল হয়ে যায়, তখনও এই রকম অসাড়তা আসে, কিন্তু মানবাঙ্গ তখন সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায় না, মানুষ তখন থপথপ করে হাঁটে এবং ধীরে ধীরে কথা বলে। শিশিরকুমারের আঙ্গিক অভিনয়ে প্যারেসিসের লক্ষণই দেখেছি। এ থেকেই বোঝা যায়, নাট্যাচার্য্য নাটকীয় চরিত্রের অভিনয়ে কত বিচার বিশ্লেষণ করতেন। সঙ্গত কারণেই তিনি শাহ্‌জাহানের অনেক সংলাপ বাদ দিতেন, কিন্তু কোথাও তা চরিত্রবিরোধী হয়ে উঠত না, বা চরিত্রের বিকৃতি ঘটাত না। বাইরের পঙ্গুতার চেয়ে শাহ্‌জাহানের মানসিক পঙ্গুতাকেই তিনি অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতেন।"

শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর (জন্ম ২১শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সাল) অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী তাঁর 'অভিনেতৃ আর অভিনয়' নামক প্রবন্ধে। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে অধুনালুপ্ত 'ভগ্নদূত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলা মঞ্চে যে সব খ্যাতিমান ও সামান্য খ্যাতিমান অভিনেতৃ জীবিত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশেরই অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে তিনি ঐ প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তেমন আলোচনা আজ পর্যন্ত কেউ করেন নি। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়-প্রতিভার বিচার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী তাঁর ওই প্রবন্ধের এক স্থলে যে-মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

"জানি না,—কে বা কাহারা স্বনামধন্য অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীকে, 'নটসূর্য' বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি বা যাঁহারাই উহা করিয়া থাকুন, উহাতে তাঁহার বা তাঁহাদের অন্ধ ভক্তি নি:সংশয়ে প্রমাণিত হইলেও রসবোধের কোনও পরিচয় উহাতে নাই। সামর্থ্য আছে বলিয়াই প্রিয়জনকে ভারি-ভারি অলংকার পরানো যায় বটে, কিন্তু তাঁহার দেহছাঁদের পক্ষে উহা বেমানান হইলে অলংকারে দাতার অহংকারই প্রকাশ পায়, অলংকৃতের দেহশ্রী এতটুকুও বাড়ে না। সৌন্দর্যের গোড়ার কথাই হইল সামঞ্জস্য। কালো মেয়ের গায়ে দামি শাদা রেশম বস্ত্র তুলিয়া

দিলে উহাতে রেশম বস্ত্রেরও মান বাড়ে না, আর সেই বস্ত্র যিনি পরিলেন তাঁহারও সৌন্দর্য বাড়ে না। বরং ঐ দুই রংএর অসংগতি তাঁহাকে অনুক্ষণ ব্যঙ্গই করিতে থাকে। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'নটসূর্য' বিশেষণটিও তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনাস্বরূপ। কারণ ঐ বিশেষণের সঙ্গে তাঁহার অভিনয়-প্রতিভার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। যদি বলেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, 'নটসূর্য' বলিতে যদি 'নটদের মধ্যে সূর্যস্বরূপ' এই অর্থ বোঝায় তবে বলিতে হইবে যে, অহীন্দ্র-প্রতিভার আলোক প্রখর বটে, কিন্তু সূর্যের মত ভাস্বর নয়, সূর্যের মত একক ও অদ্বিতীয়ও তিনি নন অভিনেতৃ-জ্যোতিষ্কের দলে। তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। সূর্যের সঙ্গে সৌরমণ্ডলের বিষয় অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু, অহীন্দ্র-প্রতিভা কোনদিন কোনও সৌরমণ্ডল গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, তাহার আলোকে অন্য কোনও অভিনেতা আলোকিত হয় নাই।

"...তথাপি অহীন্দ্র চৌধুরীর নামের আগে যদি কোন বিশেষণ বসাইতেই হয় তবে "নট বহুরূপী" কথাটিই আমার মতে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যমূলক বলিয়া বোধ হয়। কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। যাঁহারা বহুরূপী দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, একজনের পক্ষে বহুরূপ ধারণ করিতে পারা কতখানি কৃতিত্বের কর্ম। নিজের পরিচয় ছদ্মরূপের আবরণে আবৃত করিয়া দর্শককে বিভ্রান্ত করা অভিনেতার একটি প্রধান গুণ। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী এই গুণে বিশেষভাবে গুণবান। তিনি জানেন—চোখের কোনে কালির রেখাটি কেমন করিয়া টানিতে হয়, বলি-অঙ্কিত কপালে কালো রেখা কেমন ভাবে মিলাইয়া দিতে হয়, মুখের কোথায় কোন্ রঙ কতখানি কেমনভাবে মিশাইতে হয়, ছদ্ম দাড়িগোঁফ ধারণ করিতে হইলে কেমন দক্ষতার সঙ্গে উহা করিতে হয়, পরচুলাই বা কেমন যত্নে পরিতে হয়, কোন্ চরিত্রের সঙ্গে কোন্ বেশ কেমন মানায়। তাঁহার গোঁফদাড়ি দেখিয়া মনে হয় না উহা তিনি আলাদা পরিয়াছেন, শাদা পরচুল পরিলে কখনও তাহার নিচে মূল কাল চুল বাহির হইয়া দর্শকের হাস্যোদ্রেক করে না, তাঁহার রূপসজ্জা কখনও কোন চরিত্রবিরোধী বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', বাঙলা মঞ্চে তাঁহার জুড়ি কেহ নাই। তাঁহার রূপসজ্জা দেখিলে স্বতই মনে হয়—'মেকআপ' সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান অতি গভীর, উহা তাঁহার সাধনার বস্তু। তাঁহার দ্বারা জোবেয়ার, চন্দ্রবাবু, সাজাহান, সেক্সুকস্, কালকেতু, দশরথ, রাবণ, সব্যসাচী, চাঁদসদাগর, ভোলা মাস্টার, আবন,

মদনা, হুণরাজ (বিক্রমাদিত্য), গোলাম হোসেন, ডক্টর ভোস, মাইকেল প্রভৃতির ভূমিকায় অভিনয় যিনিই দেখিয়াছেন তিনিই আমার মন্তব্য সমর্থন করিবেন। এমন কি এ-কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহার নট-জীবনে অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সমস্ত শিক্ষা, সমগ্র নিষ্ঠা, একাগ্রতা রূপ-সজ্জা-ব্রতেই একাভিমুখী করিয়া দিয়াছেন এবং এ বিষয়ে তিনি অনন্যসাধারণ সাফল্যও অর্জন করিয়াছেন। তেমন সাফল্য দানীবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত কোনও নটের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আমার মনে হয়,—রূপসজ্জার প্রতি সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার জন্যই তিনি অন্যান্য অভিনয়াংশে, বিশেষত সাত্ত্বিক চরিত্র-বিশ্লেষণী অভিনয়াংশে তেমন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই।

"পেশাদারী মঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রথম মঞ্চাবতরণ 'স্টার থিয়েটার' রঙ্গমঞ্চে 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' প্রতিষ্ঠানের প্রথম নাটক অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকে অর্জুনের ভূমিকায়। উহা ইংরেজি ১৯২৩ (৩০শে জুন) সালের কথা। ১৯২১ সালে বাংলা রঙ্গমঞ্চে নূতনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল শিশিরকুমারের অভিনয়ে। প্রায় দেড় বছর পরে 'কর্ণার্জুনের' অভিনয়ে আবার এক নূতন অভিনেতৃ গোষ্ঠীর অভ্যুদয় দেখা গেল। এই গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই হিসাবে 'কর্ণার্জুন' নাটকের নাম বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয়। কিন্তু নূতন অভিনেতাদের মধ্যে সাজসজ্জার নূতনত্ব যতটা দেখা গিয়াছিল, অভিনয়ে ততটা নূতনত্ব দেখা গেলেও উন্নততর প্রতিভার লক্ষণ উহাতে কিছুই ছিল না। একটা বিশেষ ভঙ্গীতে চলা, বসা, হাত-পা নাড়া এবং সংলাপ আবৃত্তি করার মধ্যে নূতন রকম ঢং ছিল বটে, কিন্তু উহাতে নারীসুলভ লালিত্যই প্রকট হইয়া উঠিত বেশি, বলিষ্ঠতার অভাব ক্ষণে ক্ষণে রসিক দর্শকের মনকে পীড়া দিত। অহীন্দ্র চৌধুরীর মত বলিষ্ঠ গঠন যুবকও দ্যুতক্রীড়ার দৃশ্যে যখন কর্ণের উদ্দেশ্যে বলিতেন—

'শোন্ শোন্ দুরাচার—
বীরত্ব বৈভব সমর্পণ করিয়াছি জ্যেষ্ঠের চরণে।
হলে পূর্ণ কাল
ধূলি সম উড়াইব কৌরবের দলে,
নিজ হস্তে পশুবৎ বধিব রে তোরে।' ইত্যাদি

তখন তাঁহার বলার ভঙ্গীতে এবং হাত নাড়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞের দৃপ্তির চেয়েও কোমলতা এবং নমনীয়তার ধরনই ফুটিয়া উঠিত বেশী। নূতন দলের মধ্যে একমাত্র ননীগোপাল মল্লিকের 'ভীমে' এবং বিশেষ করিয়া দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক দৃশ্যের 'বিকর্ণে' পুরুষোচিত বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই কারণেই, অহীন্দ্র চৌধুরীর পেশাদারী নটজীবনে অর্জ্জুনের ভূমিকা সর্বপ্রথম হইলেও উহাতে তিনি ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি বিশেষ, কিছুই দিতে পারেন নাই। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়াছিলেন আর কিছুদিন পরে 'ইরাণের রাণী' নাটকের 'দারা জোবেয়ার' চরিত্রাভিনয়ে। ঐ অভিনয়েই প্রথমে তিনি নিজের শক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। দারা জোবেয়ারের অভিনয়ে আমরা পুরুষোচিত নিদর্শন দেখিয়াছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম —এই নব প্রতিভার সম্যক স্ফুরণে বাংলা মঞ্চ উপকৃত হইবে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহার অভিনয়-ধারা আমাদের সেই আশাকে দুরাশায় পরিণত করিয়াছে। কারণ চতুরঙ্গ অভিনয়ের মধ্যে তিনি শেষ পর্যন্ত একমাত্র 'আহার্য্যে'র সাধনাই করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠতম সাত্ত্বিক এবং শ্রেষ্ঠতর বাচিক অভিনয়ের প্রতি তিনি কোন নিষ্ঠা দেখান নাই। আর আঙ্গিক অভিনয়ের সাধনায় শিব গড়িতে বানর গড়ার মত মুখবিকৃতি এবং নানারূপ চমকপ্রদ প্যাঁচের কসরতেই দিন অতিবাহিত করাকে স্বধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 'সাজাহান' হইতে সেদিকার 'গোলামহোসেন' (সিরাজদ্দৌলা) পর্যন্ত প্রায় সকল চরিত্রাভিনয়েই ঐ প্যাঁচের খেলাই পাঁচির মার খেল্ দেখাইয়াছে, আর একই রূপ মুখবিকৃতি রসিক দর্শকের হাস্যোদ্রেক করিয়াছে। অবশ্য সাধারণ দর্শক উহাতেই মজিয়াছে, কারণ তাঁহাদের রসবোধ অতি স্থূল। আর সেই অতিস্থূলকে খুশি করিতে গিয়াই অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ও হইয়া উঠিয়াছে অতি স্থূল। উহা অসি-কোষের মত কারুকার্যশোভিত এবং চোখ ধাঁধানো বটে, কিন্তু বলা বাহুল্য উহার ভারই আছে, অসির ধার উহাতে নাই।

"প্যাঁচ দেখাইয়া আসর মাৎ করিবার ইচ্ছা যে অহীন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে কত প্রবল তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'সেলুকাস' একটি বিশিষ্ট চরিত্র। কিন্তু প্রথম যখন চন্দ্রগুপ্ত অভিনীত হয় তখন দানিবাবুর অনন্যসাধারণ অভিনয়ের গুণে 'চাণক্য' ভিন্ন অন্য কোন চরিত্রই বিশেষভাবে লোকের চোখে পড়িত না। তা ছাড়া অন্য চরিত্রের অভিনেতারা তেমন ভাল

অভিনয় করিতেন বলিয়া শুনি নাই। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ শিশিরযুগে, বাংলা মঞ্চে বহু নবীন অভিনেতার অভ্যুদয়ের কালে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অন্যান্য চরিত্রও অভিনয়ের গুণে বিশেষত্ব লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেলুকসের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর, এ্যান্টিগোনাসের ভূমিকায় রাধিকানন্দের, কাত্যায়নের ভূমিকায় নরেশ মিত্রের এবং চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যাইতে পারে। বস্তুত সেলুকস-চরিত্র অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়গুণে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় পরিণত হইয়াছে। এবং মনে হয়—সাজাহান, চাঁদসদাগর, আবন, ডক্টর ভোস, ভোলামাস্টার, সত্যানন্দ, সব্যসাচী প্রভৃতি যে সকল ভূমিকার অভিনয়ে সাধারণের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, সে সকল ভূমিকার অভিনয়ের তুলনায় তাঁহার সেলুকসের চরিত্রাভিনয় বহু গুণে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। উহাতে তাঁহার মুখবিকৃতির মাত্রা কম। এবং শেষ দৃশ্যের পূর্ব পর্যন্ত সকল দৃশ্যেই অহীন্দ্র চৌধুরী-সুলভ প্যাঁচের প্রচেষ্টা অতি বিরল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এমন সুন্দর অভিনয়ের ব্যাপারেও তিনি সাত সাগর পাড়ি দিয়া ঘাটে আসিয়া তরী ডোবান। শেষ দৃশ্যে তাঁহার ভিতরকার প্যাঁচদেবতা* (অপদেবতা বা ভূত বলিলে আরও যথার্থ হয়) আসিয়া কাঁধে ভর করেন এবং নাটকের নেপথ্যে সরিয়া পড়িবার পূর্ব মুহূর্তেই এমন একটি কুৎসিত কাণ্ড করিয়া বসেন যে তাঁহারই হাতে তিল তিল করিয়া গড়া একটি তিলোত্তম অভিনয় এমনভাবে নষ্ট হইতে দেখিয়া রসিক দর্শকের মন ক্ষোভে জ্বলিয়া ওঠে। আমি সেলুকসের সঙ্গে এ্যান্টিগোনাসের পরিচয় দৃশ্যের কথা বলিতেছি। সমগ্র দৃশ্যটি একটি করুণ শোকাবহ দৃশ্য। গ্রীক সেনাপতিকে বাধ্য হইয়াই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে অনেক খেসারত দিয়া সন্ধি করিতে হইয়াছে। এমন কি, সন্ধির সর্ত অনুযায়ী এক বিদেশী রাজার সঙ্গে নিজের মেয়ের

* এই প্রসঙ্গে যশস্বী চিত্র ও নাট্য পরিচালক স্বর্গত কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের অনুরূপ মন্তব্যটিও স্মরণীয়। তিনি তাঁর 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার' নামক প্রবন্ধের একস্থলে লিখেছেন: "মিনার্ভার অভিনেতারা পুরাতন-পন্থী বলিয়া পরিচিত হইয়াও, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর প্রচলিত স্বাভাবিক অভিনয়ধারার পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহাদের অভিনয়ে যথেষ্ট প্রাণ ও আবেগ ছিল। আঙ্গিক অভিনয় বা থিয়েটারি অভিনয়ে প্যাঁচ তাঁহাদের বিশেষ ছিল না,—(এ বিষয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ছিলেন প্যাঁচের রাজা)।"

—পাদটীকা গ্রন্থকার কর্তৃক উদ্ধৃত।

বিবাহ পর্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইতে হইয়াছে। সেলুকসের নিকট ইহার চেয়ে শোচনীয় পরাজয় আর কী হইতে পারে? এই পরাজয়ের দুঃখ বহন করিয়াই আলোচ্য দৃশ্যের উন্মোচন। পর মুহূর্তেই দেখি,—তাঁহার জীবনের শান্তি এবং সান্ত্বনার স্থল একমাত্র কন্যা হেলেন পিতার নিকট হইতে বিদায় লইতেছে। সেলুকস তাঁহাকে বলিতেছেন,—'যখন কথা ফোটে নি, তখন থেকে নিজের হাতে মানুষ করে তারপর তাকে চিরজন্মের মত বিদায় দেয়ার কি দুঃখ তা তুই কি বুঝবি মা?' এ-দুঃখ কন্যা-বিচ্ছেদ-কাতর সকল কালের সকল পিতার। হেলেন চলিয়া গেলে সেলুকস্ চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। কী করিবেন, সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। চারিদিক ঘিরিয়া বেশ একটা শোকাচ্ছন্ন থমথমে ভাব, ঠিক সেই মুহূর্তেই এ্যান্টিগোনস্ আঘাতের উপর চরম আঘাত হানিলেন, —'কি বলব? পরিচয় দিতে আমার উঁচু শির লজ্জায় নুয়ে পড়ছে। আমার পিতা—পত্নীত্যাগী সেলুকস।' এরূপ অভাব্য বিস্ময় আর মর্মান্তিক আঘাতে মানুষের, বিশেষতঃ সেলুকসের মত এক প্রবীণ গ্রীক সেনাপতির মন কীরূপ হইতে পারে এবং বাহিরে তাহার প্রতিক্রিয়াই বা কী হইতে পারে? দ্বিজেন্দ্রলালের 'সোরাব-রুস্তম' নাটকে নিজ হস্তে নিহত পুত্র সোরাবের পরিচয় পাইয়া পিতা রুস্তম প্রস্তরমূর্তির মত হইয়া গিয়াছিলেন, নাটকের অপর একটি চরিত্রের মুখে তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় অতুলনীয় ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল—'রুস্তম! রুস্তম! দেখছ না, শুনছ না, স্তব্ধ চেয়ে আছ!' সেলুকস যে করুণতম পরিবেশের মধ্যে পড়িয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষেও না দেখিয়া শুদ্ধ চাহিয়া থাকাই স্বাভাবিক এবং সত্য। কারণ চরমতম বেদনায় অদৃষ্টের শেলমুখ বিদ্রূপের মাঝখানে মুহূর্তের জন্যও মানুষ হতবাক হতভম্ব পাথর হইয়া যায়। কিন্তু অহীন্দ্রবাবু ঠিক এইখানেই একটি বীভৎস চীৎকারের সঙ্গে শুনিয়া মাপিয়া আড়াই পাক ঘুরিয়া নিকটস্থ একটি টেবিল বা তেপায়ার উপর কাৎ বা উপুড় হইয়া পড়েন। এযাবৎ যতদিন তিনি ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন ততদিনই ঐরূপ পতনের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এমন কি, আড়াই পাকের জায়গায় দুই কি তিন পাকও তিনি ঘোরেন নাই। (সত্য-মিথ্যা জানি না, শুনিয়াছি—একদিন নাকি জনৈক এ্যান্টিগোনস্, অভিনেতার নাম বলিব না, ইচ্ছা করিয়াই অহীন্দ্রবাবুকে বিপাকে ফেলিয়াছিলেন। অভিনয়-ছলে সেলুকস-রূপী অহীন্দ্রবাবুকেও উইংস পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া পিতৃ পরিচয়টুকু দিয়াই

এমনভাবে তিনি প্রস্থান করিলেন যে, অহীন্দ্রবাবু সেদিন আর হাতের নিকট আড়াই পাক ঘুরিবার টেবিলটি খুঁজিয়া পাইলেন না। অতএব সেদিন তাঁহাকে আরও দুইচারি পাক বেশীই ঘুরিতে হইল। কিন্তু টেবিলে পতন ব্যাহত হইল না।) অধিকাংশ বাঙালী দর্শকই অভিনয় বোঝেন না, তাই এইরূপ চমকপ্রদ পতনে তাঁহারা করতালি ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ প্রকম্পিত করিয়া তোলেন, কিন্তু রসিক দর্শক এরূপ পতনকে অভিনেতার পতন মনে করিয়া আন্তরিক দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন।

"কেবল সেলুকসের ভূমিকাই নয়, 'সাজাহান,' 'আবন', 'ডক্টর ভোস', 'সব্যসাচী', 'চাঁদসদাগর', 'ভোলা মাস্টার' প্রভৃতি যে সকল ভূমিকায় তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে সে সকল ভূমিকাতেও, একমাত্র দর্শককে খুশি করিবার জন্যই তিনি উক্তরূপ 'প্যাঁচের' আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। চরিত্রের রূপদান অহীন্দ্রবাবুর নিকট বড় কথা নয়, সস্তায় দর্শকের হাততালি কুড়ানই তাঁহার নট-জীবনের কাম্য। নহিলে 'মিশরকুমারী' নাটকে যে-দৃশ্যে আবন সামন্দেশের নিকট কাতর মিনতি জানাইতেছে,—'না, না, একের অপরাধে সমগ্র কাফ্রি জাতির উপর এমন অত্যাচার করো না। বরং বৃদ্ধ আবনের শনের মত পাকাচুল উপড়ে তুলে নিয়ে পাপোষ তৈরী কর' ইত্যাদি (বইটি হাতের কাছে নাই বলিয়া যথাযথ সংলাপটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কেবল উহার মর্ম উদ্ধৃত করিলাম) সেই দৃশ্যে মাথাটিকে দর্শকাভিমুখীকরত মাটির উপর রাখিয়া, পিঠটাকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া ঐ সংলাপটি বলিবার কী অর্থ হইতে পারে? ঐ ভঙ্গীটিতে কি কাতরতা বেশি প্রকাশ পায়? 'ভোলা মাস্টারে'-ও মাঝে মাঝে যে-ভাবে স্কুল বাড়িতে চিৎপাত হইয়া 'হে বিচারক, বিচার কর' ইত্যাদি বলিয়া থাকেন উহাও শুদ্ধমাত্র চমক দিবার চেষ্টা নয় কি? 'মাইকেল' নাটকে হেনরিয়েটা যখন বলেন, 'তুমি কি? নিজের ঘরের আলোটা পর্যন্ত বিলিয়ে দিলে?', তখন উহার উত্তরে মাইকেলরূপী অহীন্দ্রবাবু যখন বিকৃত ভঙ্গীতে উচ্চারণ করেন,—'হেনরিয়েটা, নিজের ঘরের আলো যারা পরকে বিলিয়ে দিতে পারে তাদের ঘর কখনও অন্ধকার থাকে না', তখন দর্শকেরা সপ্রশংস হাততালি দেন বটে, কিন্তু যদি হাততালির কোনও দাম থাকে তবে উহা 'মাইকেল' নাটকের নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তেরই প্রাপ্য; নচেৎ এইরূপ বিকৃত অঙ্গভঙ্গী এবং বাচনভঙ্গী যে 'মাইকেল' চরিত্রের উপযোগী নয়—একথা অন্তত রসিক দর্শকেরা জানেন।

"অহীন্দ্রবাবুর এই প্যাঁচ কষিবার মনোবৃত্তি হইতে একটা কথা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, abnormal বা অস্বাভাবিক ভূমিকায় অভিনয় করিতে তিনি অধিকতর আনন্দ পান। কারণ ঐরূপ ভূমিকায় প্যাঁচ কষিবার নানারূপ সুযোগ সুবিধা থাকে। এই কারণেই সাজাহান, ডক্টর ভোস, ভোলা মাস্টার, আবন প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি খ্যাতিমান। এমন কি সাধারণ সামাজিক নাটকের অতি পরিচিত সামাজিক চরিত্রাভিনয়ে পর্যন্ত তিনি প্যাঁচের কসরৎ দেখাইতে সমুৎসুক হইয়া উঠেন। 'রমেশ' (প্রফুল্ল), 'উপীন' (চরিত্রহীন) এর মত চরিত্রেও তাঁহার ঐরূপ প্রবৃত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

"অহীন্দ্রবাবুর নট-জীবনের আর একটি কলঙ্ক—সকল চরিত্রাভিনয়েই সংলাপ উচ্চারণে তাঁহার একপ্রকার বিশেষ মুখবিকৃতি। অধিকাংশ সংলাপ উচ্চারণকালেই তাঁহার নিচের ঠোঁটটি উপরের ঠোঁটটির অপেক্ষা অনেকখানি আগাইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দুই নাসারন্ধ্রের প্রান্ত হইতে ওষ্ঠাধরের দুই প্রান্তকে স্পর্শ করিয়া আরও খানিকটা নিচে পর্যন্ত দুইটি গভীর কুঞ্চনরেখা জাগিয়া উঠে। উহাতে মুখাকৃতিকে অতি কুৎসিত দেখায়। অথচ কুৎসিত বিকৃতি ভিন্ন অহীন্দ্রবাবুর সংলাপ উচ্চারণ কল্পনাও করা যায় না।

"গোঁফদাড়ি পরা বৃদ্ধের ভূমিকায় অনেক সময় ঐরূপ বিকৃতি ততটা চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু শাদা মুখে, বিশেষত অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের ভূমিকায় (যেমন অর্জুন, কর্ণ, মৃগাঙ্ক, অরবিন্দ, কেদার রায়, 'নরদেবতা'র রাজা, সোনার হরিণ, রমেশ, উপীন, দেবদাস-এর বসন্ত) ঐরূপ কদর্য ভঙ্গী অসহ্য মনে হয়। অথচ আশ্চর্য এই যে, প্যাঁচ মারিয়া আর বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়াই অহীন্দ্র চৌধুরী 'নটসূর্য'! বলিহারি এ দেশের দশের রুচিকে!

"অহীন্দ্রবাবুর সংলাপ বলিবার ভঙ্গীও অত্যন্ত দুর্বল। উহার কারণ তাঁহার কণ্ঠস্বরের দুর্বলতা। দুর্বল বলিতে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বলিতেছি না, বলিতেছি কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার অভাবের কথা। অহীন্দ্রবাবু নিজেই এ বিষয়ে অবহিত বলিয়া নানারূপ কৃত্রিমতা দ্বারা উহা আবৃত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। দীর্ঘ সংলাপ বলিতে স্বরকে কখনও উঁচু কখনও নিচু পর্দায় রাখিয়া মাঝখানের ফাঁকটা 'হিসিং'-এ ভরতি করিয়া দেন। তাঁহার উচ্চারণের একটি প্রধান আশ্রয়স্থল এই 'হিসিং'।

"চরিত্র বিশ্লেষণের প্রশ্ন যে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় সম্পর্কে উঠে না, এ-কথা বলাই বাহুল্য। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি—রূপসজ্জাতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত

নিষ্ঠা প্রযুক্ত, বাকিটুকু প্যাঁচের কসরতে। একটি সাধারণ তুলনামূলক উদাহরণ দিই। 'দেবদাস' নাটকে বসন্ত চরিত্র সম্পূর্ণ শচীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। উহা নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় কি অবান্তর, সে প্রশ্ন আলাদা। কিন্তু চরিত্রটি 'দেবদাসে'র মত মেলোড্রামার পক্ষে একটি 'রিলিফ', সন্দেহ নাই। বসন্ত মদ্যপ, সদাহাস্যময়ও বটে। গভীর কথাও হালকা করিয়া বলে। কিন্তু একথাও সত্য যে, ঐ আনন্দের পিছনে একটি গভীর বেদনাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে বেদনা ব্যর্থ প্রেমিকের। স্বর্গত নির্মলেন্দুর অভিনয়ে বসন্তের ঐ বেদনার আভাসই অপরূপ অভিব্যক্তির মাধ্যমে আমাদের চক্ষুকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিত। বস্তুত বসন্ত চরিত্রের উহাই স্বরূপ। কিন্তু সম্প্রতি অহীন্দ্রবাবুর বসন্ত চরিত্রাভিনয়ে অহীন্দ্রসুলভ প্যাঁচ এবং উচ্চারণভঙ্গীই দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, কিন্তু বসন্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই নাই। তিনি ঐ চরিত্রটিকে বুঝিতেই পারেন নাই, পারিলে তাঁহার অভিনয়ে ব্যর্থ প্রেমিকের ছাপ কিছুটা হইলেও থাকিত।

"হাসির এবং যাকে ইংরেজিতে Serio-comic ভূমিকা বলে সেরূপ ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় হাস্যকররূপে ব্যর্থ। তাঁহার 'সোনার হরিণ', 'উপানন্দ', 'ঘোড়পুরে' প্রভৃতির ভূমিকাভিনয়ে উহার প্রমাণ অতিশয় স্পষ্ট। 'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রবাবুর কথা আগেই বলিয়াছি।* 'চন্দ্রশেখর'-এর 'বিশ্বাস'-এর ভূমিকায় তিনি যেরূপ নিকৃষ্ট ভাঁড়ামি করেন তেমন ভাঁড়ামি যাত্রাদলের ভাঁড়ামিকেও লজ্জা দেয়। অথচ 'ঝাঁসীর রাণী' নামক নাটকের একটি চরিত্রাভিনয়ে দর্শক সমাজে অখ্যাত কিন্তু হাস্যরসের ভূমিকায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী নট শ্রীরাধারমণ পাল হাতেকলমে প্রমাণ করিয়াছেন,—'বিশ্বাস'-এর অনুরূপ ভূমিকা কেমন ভাবে অভিনয় করিতে হয়। আমার তো মনে হয়, প্রথম নটজীবনে অহীন্দ্রবাবু যে দুইটি Serio-comic ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন সে দুটি তুলনায় অনেক স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছিল। আমি 'লাখটাকা'র 'রক্তবীজ' এবং 'নবযৌবন'-এর 'দর্পনারায়ণ'-এর কথা বলিতেছি।

"...অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, যিনি এতগুলি প্রধান চরিত্রে গত আটাশ বছর ধরিয়া মঞ্চাবতরণ করিয়াছেন তিনি একটি ভূমিকাতেও ত্রুটিহীন অভিনয় করিতে পারেন নাই? ইহার উত্তরে বলিব, অহীন্দ্রবাবু তাঁহার সুদীর্ঘ নট-জীবনে একটি চরিত্রে এমন উচ্চাঙ্গের রূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহার কথা আজিকার দিনের অহীন্দ্র চৌধুরীকে দেখিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারে না।

* এই গ্রন্থের ত্রিশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

আমি রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের 'যতীন'-এর ভূমিকার কথা বলিতেছি। ইহা বোধ করি উনিশ শো পঁচিশ কি ছাব্বিশ সালের কথা।* তখন স্টারে আর্ট থিয়েটারের যুগ; অহীন্দ্রবাবুর নটজীবনেরও পূর্ণ যৌবনকাল। কোনরূপ মুখ বিকৃতি নাই, কোনোরূপ প্যাঁচ নাই, রোগশয্যায় শুইয়া যতীনের সেই ট্র্যাজিক অভিনয় যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা ধারণাও করিতে পারিবেন না। মণি-সৌধ তো বাহিরের ব্যাপার। যতীনের অন্তর-গৃহে তাহার প্রিয়তমা বধূ মণির প্রবেশ ঘটিয়া উঠিল না, প্রতীক্ষায়, কল্পনায় লগ্নই রহিয়া গেল—স্বামী-হৃদয়ের এই করুণতম বেদনাকে অহীন্দ্রবাবু সেদিন যে-রূপদান করিয়াছিলেন, রসিক দর্শক তাহাতে মুগ্ধ বিস্মিত, অভিভূত হইয়াছিল। নাটকের শেষ মুহূর্তে যতীনের মুখের 'পায়ের ওপর এই শালটা কেন—এই শালটা কেন' আজিও ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু সাধারণ দর্শকের নিকট গৃহপ্রবেশ খুব ভাল লাগে নাই। অথচ ঐ নাটকে রাধিকানন্দ, সুশীলাসুন্দরীর মত দক্ষ অভিনেতৃরাও অভিনয় করিতেন এবং হিমির ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালা অপূর্ব গান গাহিতেন। আমার মনে হয় অহীন্দ্রবাবু যে পরবর্তী-কালে প্যাঁচকেই তাঁহার অভিনয়ধারার প্রধান অবলম্বন করিয়াছিলেন উহা যতীন-এর অভিনয়ে দর্শকদের উদাসীনতারই প্রতিক্রিয়ামাত্র। তথাপি একটি চরিত্রাভিনয়েই দর্শকদের অবহেলার ফলে হাল ছাড়িয়া স্রোতমুখে গা ভাসাইয়া দেওয়া অহীন্দ্রবাবুর মত শক্তিমান নটের পক্ষে উচিত হয় নাই। কারণ সত্যকার শিল্পী কখনও দর্শকের রুচিকে অনুসরণ করেন না, দর্শকদিগকেই বাধ্য করেন তাঁহার উন্নত-রুচিকে গ্রহণ করিতে। যতীনকে লোকে গ্রহণ করে নাই, সাজাহান-আবন-ডক্টর ভোসকে গ্রহণ করিয়াছে…উহা কেবল অহীন্দ্র চৌধুরীর নট-জীবনের করুণ পরিহাসই নয়, উহা বাঙালী দর্শকের নিকৃষ্ট নাট্য এবং অভিনয়রসবোধেরও শোচনীয় পরিচয় বহন করিতেছে।

"…বলিতেছিলাম, 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে যতীনের ভূমিকায় তিনি যে নিখুঁত উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিয়াছিলেন, সেরূপ অভিনয় গ্রহণে অশক্ত রসবোধহীন দর্শকদের অবহেলাই তাঁহাকে শস্তায় দর্শক ভুলাইবার অভিনয়কৌশল গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।…

"কেবল 'যতীন' চরিত্রেই নয়, পরবর্তীকালে আরও বহু চরিত্রের অভিনয়ে মাঝে মাঝে অহীন্দ্র চৌধুরীর সেই অপূর্ব নটপ্রতিভার দীপ্ত আলোকচ্ছটা লক্ষ্য

* 'আর্ট থিয়েটার'-এ 'গৃহপ্রবেশ'-এর প্রথম অভিনয় হয় ৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৫।—লেখক

করিয়াছি। কিন্তু সে সামান্য ক্ষণের জন্য। পরমুহূর্তেই কালো মেঘ আসিয়া উহাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। সামান্য কিছু দিন আগে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকে শিবনারায়ণের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাঁহারই সংলাপের অনুকরণে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়াছিলাম, 'বলিহারী! বলিহারী!' 'চাঁদসদাগর' নাটকেও (আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত) বাসর দৃশ্যে তাঁহার অভিনয় হইত প্রথম শ্রেণীর নটের মতই। কিন্তু সপ্তডিঙ্গাহারা সন্তরণশ্রান্ত পিপাসু চাঁদসদাগরের 'তুমি বিষ দিয়েছিলে, খেলাম না' ইত্যাদি সংলাপ-সম্বলিত দৃশ্যে তাঁহার প্যাঁচমার্কা বিকৃত মুখভঙ্গিযুক্ত অভিনয় হইত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত, একেবারে যাত্রাভিনয়। বস্তুত যতীনের পর একেবারে নিখুঁত অভিনয় অহীন্দ্রবাবুর পক্ষে কোনো চরিত্রেই সম্ভবপর হয় নাই। অধিকাংশ চরিত্রাভিনয়ই হইয়াছে সস্তা শ্রেণীর।

"অবশ্য কোনো কোনো চরিত্রে ভাল অভিনয়ও তিনি করিয়াছেন। তবে উহা দোষে-গুণে মিশ্রিত। কোথাও বা দোষের মাত্রা অধিক, কোথাও বা গুণের। তবে গুণের মাত্রা কখনও, শিবনারায়ণ (দুই পুরুষ), সেলুকস (চন্দ্রগুপ্ত), মৃগাঙ্ক (মন্ত্রশক্তি), দর্পনারায়ণ (নবযৌবন), চন্দ্রবাবু (চিরকুমার সভা), দারা জোবেয়ার (ইরাণের রাণী) প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি চরিত্রাভিনয় ব্যতীত আট আনার উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। কিন্তু একথা সত্য যে, তাঁহার যে সকল অভিনয় দেখিয়া সাধারণ দর্শক 'আহা আহা' করিয়া থাকেন সে সকল অভিনয়ই নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

"অতএব শেষ পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, রূপসজ্জায় অহীন্দ্র চৌধুরী একজন অতি উচ্চশ্রেণীর নট, এবিষয়ে এদেশে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। কিন্তু বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে তিনি তেমন কোন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার নটপ্রতিভার অক্ষমতাও হইতে পারে, আবার স্বেচ্ছাকৃত আত্মপীড়নবিলাসও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সমালোচনায় ঐ দুইশ্রেণীর অভিনয়দৈন্যের উল্লেখ না করিলে সমালোচককে স্বধর্মভ্রষ্ট হইতে হয়। আর ধর্মভ্রষ্ট হওয়াকেই আমি ঘৃণ্যতম পাপ বলিয়া মনে করি।"

এই বৎসরের শেষে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের পরম সুহৃদ, নট-নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনা করে শিশিরকুমারকে অর্পণ করেছিলেন। শিশিরকুমার অত্যন্ত প্রীতিভরে সেটি সে সময় গ্রহণ করেছিলেন।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সেই শ্রদ্ধার্ঘ্যটি—

॥ নটরাজ শিশিরকুমারের প্রতি ॥

ওগো নটরাজ! স্পর্শে তোমার ভারতীর মধুবীণা,
ঝঙ্কারি ছুটে নির্ঝর সম বাধা-বন্ধন-হীনা।
তোমার কোমল পরশ লভিয়া রঙ্গমঞ্চে আজি,
ফুটিয়া উঠিল অপরূপ রূপে শত শতদল রাজি।
পেয়েছে তাহারা প্রাণ,
এ দীন পূজারী মুগ্ধ হিয়ায়
করে বন্দনা গান।

সীতার বিরহে তোমার আননে নেমেছে অশ্রুধারা,
তোমার করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া পাষাণও কাঁদিয়া সারা।
পঞ্চবটীর কুঞ্জ বিতানে তোমার ব্যথিত স্বর,
তোমারেই শুধু অমর করেছে, লভেছ দেবীর বর।
দীপ্ত মুকুট মাথে—
মিলেছিলে যেন অতীতের সেই
করুণ বিরহী সাথে।

দিল্লীপ্রাসাদে মোগল হারেমে আলমগীরের মনে
উঠেছিল ভেসে বিবেকের শিখা কোন্ সে ভীষণ ক্ষণে।
কবে সে কোথায় আরাবল্লীর গিরিকন্দর মাঝে
চেয়েছিল জল বন্দী-পিয়াসী মৌন মলিন সাঁঝে।
কেমনে ফুটালে তাহা,
বিস্ময় লাগে ওগো যাদুকর
দেখায়েছ তুমি যাহা।

জন্মের সাথে লাঞ্ছিত সেই কর্ণবীরের বেশে,
রঙ্গদীপের সান্ধ্য-আলোকে যখন দাঁড়ালে এসে,
যখন নিয়তি পরাজয় নিয়ে তাহারে দাঁড়াল ঘিরে
দেখাইলে তুমি কি যে চলে যায় অস্তাচলের তীরে।

তাহার ব্যথিত হিয়া
ফুটাইলে তুমি অপরূপ রূপে
মায়ার মন্ত্র দিয়া।

মাতালের প্রাণে কিসের বেদনা সুরার পাত্র ঢালি,
কিসের জ্বালায় উন্মাদ হয়ে চুমুক দিতেছ খালি,
মত্ত যোগেশ নিমচাঁদ বেশে দেখালে তাদের রূপ,
জীবানন্দের জীবন দিয়াছ জ্বালিয়া প্রাণের ধূপ।
তোমার মধ্য দিয়া
বন্দী বাদ্‌শা কাঁদিয়াছে ফিরি
লাগি মমতাজ প্রিয়া।

কখনো ধরেছ সংহার রূপ, কখনও শান্ত বেশ,
কখনো মাথায় স্বর্ণমুকুট, কখনও রুক্ষ কেশ।
তোমার মন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা বঙ্গরঙ্গভূমি,
হে নটেশ, আজি ভক্ত সবার প্রণাম লহগো তুমি।
মোহনমন্ত্র বলে
নিত্য নূতন আসন লভিয়া
বস গো চিত্তদলে।

আটাশ

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ।

২৫শে জানুয়ারী গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকে শিশিরকুমার 'করুণাময়' সাজলেন। পরে তিনি এই নাটকে 'দুলালচাঁদ'-এর এই ভূমিকাতেও অভিনয় করেছিলেন।

'করুণাময়'-এর ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন। সে অভিনয় দেখে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন, "স্যার হেনরি আর্ভিংকে দেখেছি, গিরিশবাবুর অভিনয় তাঁর চেয়েও অদ্ভুত। সামাজিক নাটকে এরূপ

বস্তুতন্ত্র-বিষয়ীভূত ব্যাপারে স্যার হেনরি গিরিশচন্দ্রের ন্যায় কিছুতেই পারতেন না।...যেখানে আত্মহত্যায় উদ্যত করুণাময় শূন্যে হাত বাড়িয়ে গলায় দেবার দড়ি খুঁজছে, গিরিশবাবুর সেখানকার অভিনয়ের তুলনা হয় না।"

২৯শে মে গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করলেন শিশিরকুমার। এ সম্পর্কে 'নাচঘর'-এর মন্তব্য: 'বাঙলা রঙ্গমঞ্চ যে যুগে ধর্মভাবের মর্ম প্রকাশের জন্য বিশেষরূপে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, 'বিল্বমঙ্গল' হচ্ছে সেই যুগের একখানি নাটক। আজ পর্যন্ত বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় বাংলার অধিকাংশ বিখ্যাত নটই অভিনয় করেছেন—তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল মিত্রের অভিনয়ই অতুলনীয় হয়ে আছে। শিশিরকুমার অদ্যাবধি প্রায় সকল শ্রেণীর ভূমিকাতেই কল্পনাতীত কৃতিত্ব দেখিয়ে তাঁর বিচিত্র প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে বিল্বমঙ্গল জাতীয় ধর্মভাবপ্রধান ভূমিকায় এই হোল তাঁর প্রথম রঙ্গাবতরণ। তাঁর অভিনয় সকলকেই মোহিত করল, তাঁর সাফল্য সকলকেই বিস্মিত করল।'

৩রা অক্টোবর গিরিশচন্দ্রের মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অর্থসংগ্রহের জন্য 'প্রফুল্ল' নাটকের সম্মিলিত অভিনয়-রজনীতে দানীবাবু ও শিশিরকুমার যথাক্রমে 'যোগেশ' ও 'রমেশ'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দানীবাবু ও শিশিরকুমারের সম্মিলিত অভিনয় সেই প্রথম। এই প্রসঙ্গে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন: 'সেদিন ১৯২৮—৩রা অক্টোবর, নাট্যইতিহাসের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। গিরিশ স্মৃতি সমিতির গিরিশ মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠার জন্য টাকার প্রয়োজন হইল। ইতিপূর্বে কলিকাতার মেয়র থাকাকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্পোরেশনের জমিতে বর্তমান গিরিশ পার্কটি মহাকবির নামানুসারে করিয়া দিয়া যান। সেখানেই মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। যুক্ত অভিনয়ে টাকা তোলা হইবে। এই অভিনয়েই প্রায় ৪০০০৲ সংগৃহীত হয়। টিকিটের মূল্য বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কত দর্শক দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিয়াছে। দানীবাবু ও শিশিরবাবু হন যথাক্রমে যোগেশ ও রমেশ, নির্মলেন্দু লাহিড়ী ভজহরি, তারাসুন্দরী—উমাসুন্দরী, জ্ঞানদা—কুসুমকুমারী, প্রফুল্ল—প্রভা। আমরা সে অভিনয়ে উপস্থিত ছিলাম।...সে রাত্রে দর্শক বিস্ময়ান্বিত হইয়া উভয়ের কৃতিত্ব পরীক্ষা করিল। দানীবাবু যেন সেদিন বাপির (গিরিশচন্দ্রের) ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সে রাত্রে দানীবাবু অভিনয়ে এমন প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন যে রমেশের ভূমিকায় শিশিরকুমারও অনিন্দ্য অভিনয় করিলেও

সকলে জয়মাল্য তাঁহার গলেই অর্পণ করিল। দুই এক স্থানে শিশিরকুমার করতালি লাভ করেন।'

১৪ই ডিসেম্বর।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটক মঞ্চস্থ হল।

ভূমিকালিপি :—নাদির শাহ্—শিশিরকুমার, সালেহ্ বেগ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, আলি আকবর—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, আহ্মেদ খাঁ আবদালি—জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, মৌলানা রহমৎ খাঁ—রবি রায়, রেজাকুলী খাঁ—শৈলেন চৌধুরী, মির্জা মেহেদী—অমলেন্দু লাহিড়ী, সাদৎ আলি—শীতল পাল, নেক্‌কদম—নৃপেন রায়, সিতারা ও ভারতনারী—কৃষ্ণভামিনী, সুলতানা বেগম—রাকী, সিরাজী বেগম—চারুশীলা।

পরে শ্রীমতী কঙ্কাবতী সাহু বি. এ. 'ভারতনারী' রূপে অভিনয় করলেন। সাধারণ মঞ্চে সেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ।

যোগেশচন্দ্র নাটকটির উৎসর্গ পত্রে লেখেন :—

'নাট্যজগতে দিগ্বিজয়ী বন্ধুবর
শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী
মহাশয়ের করকমলে

শিশিরবাবু,

এ নাটক আপনিই লিখতে বলেছিলেন, নামকরণেও আপনার ইঙ্গিত ছিল। আমি কোনো গতিকে নাটকখানিকে পাঠকসমাজে বার করলাম; কিন্তু শুধু পাঠেই তো নাটকের পরিপূর্ণ ও সমগ্র রূপটি ধরা পড়ে না। আপনি স্বেচ্ছায় এর পোষণ ও পালনের ভার নিয়ে একে স্বাস্থ্যবান, সতেজ ও জীবন-রসমণ্ডিত করে তুলেছেন। সুতরাং, নাটকখানির উপর আপনার অধিকার আমার চেয়ে একটুও কম নয়। মহাকবির উক্তি দিয়েই আমি আমার যুক্তি সমর্থন করলাম,—'স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ'। আপনাকে বেশী কিছু লেখা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ইতি—

গুণমুগ্ধ
যোগেশদা'

যোগেশচন্দ্র এই নাটক সম্পর্কে ভূমিকায় বলেছেন : "অভিনয়ের দিক দিয়া নাটকখানির—ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, জাতিগত ও ভাবগত—সমগ্র রূপই শিশিরবাবুর পরিকল্পনা। অবাস্তব ভাব, অর্থাৎ Airy Nothing-কে কি

করিয়া রূপে রসে রঙে মূর্ত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহা তাঁহার চেয়ে বেশী কে জানে ?…"

এই 'Airy Nothing'কে মঞ্চে 'রূপে রসে রঙে মূর্ত ও প্রাণবন্ত' করে তুলে শিশিরকুমার কী অভূতপূর্ব সৃষ্টি করেছিলেন তার বর্ণনা প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র তাঁর 'শিশিরকুমার' শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি : "…তিনিই এই বাংলাদেশের, আমার অনুমানে সমগ্র ভারতবর্ষের, প্রথম নির্দেশক যিনি মঞ্চের ছবি কল্পনা করেছেন। যিনি আলো দৃশ্যপট ও অভিনয় দিয়ে থিয়েটারের একটা সামগ্রিক রূপ প্রথম এই দেশে এনেছিলেন।

"আমি আন্দাজ ১৫।১৬ বছর বয়সে প্রথম ভাদুড়ীমশায়ের অভিনয় দেখি। সে নাট্যাভিনয়ের নাম—'দিগ্বিজয়ী'। তখনই পর পর দুবার এই নাট্য দেখেছিলুম, পরে আর দেখি নি। সে অভিনয় দেখার আগে মোটের মাথায় আমার নাটক কিছু পড়া ছিল। কিন্তু 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের বক্তব্যই মনে হল যেন ভিন্ন। অনেক গভীর, অনেক important। এ যেন 'সাজাহান' 'নুরজাহান' থেকে আরম্ভ করে 'কর্ণার্জুন' 'ইরানের রাণী' ইস্তক সকলের থেকে ভিন্ন জাতের। অপূর্ব অভিনয় হত যোগেশচন্দ্র ও অমলেন্দু লাহিড়ীর মধ্যে, চতুর্থ অঙ্কে। Co-acting কাকে বলে তার প্রথম হদিস আমি পাই তাঁদের সেই অভিনয়ে।

"সেই অভিনয়ে নাদিরের সাধারণ কণ্ঠস্বরের আদেশে অন্য সকলের যে সশ্রদ্ধ মনোযোগ, সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে যে সম্মানের তটস্থতা, এবং চলায় ফেরায় যে সামরিক ক্ষিপ্রতা, এ সমস্তই তখন আমার কাছে একেবারে অকল্পনীয়। বাংলা থিয়েটারের পৌরাণিক বীরদের যে গদাইলস্করি চালচলন তার সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্যই নেই। বরঞ্চ প্রধান চরিত্র নাদিরশাহের বীরত্ব ও বুদ্ধি তার শার্দুল-ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে যেন প্রতিভাসিত হয়। এই প্রথম বুঝলুম যে এমন একজন লোক দরকার হয় যাঁর চিন্তাটা এই রকম প্রত্যেকটা চরিত্রাভিনয়ের খুঁটিনাটি পর্যন্ত বিস্তৃত। তাতে যে সম্বদ্ধতা আসে, মুখে কিছু না বলেও বিচিত্র মানে প্রকাশ করা যায়, তা অন্যভাবে অসম্ভব। এরই আর এক উদাহরণ হচ্ছে প্রথম অঙ্কে যেখানে নাদিরশাহ সিতারার পরিচয় নিচ্ছে। সেইখানে সিতারা যখন বলে যে, সে তার সদ্যবিবাহিত স্বামীকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছে তখন—নাটকে যেটা লেখা নেই—নাদির 'শোভান আল্লা'

বলে উঠে হঠাৎ অতর্কিত ক্ষিপ্রহাতে সিতারার কোমরের কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা ছোরা তুলে নেয়, তারপরে সেটা নিজের কোমরবন্ধে গুঁজে রাখতে রাখতে বলে—'তোমায় ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।'

"তখন আমার যে বয়স তাতে মনে হোত যেটা অভিনয় হয় সেটা সবই নাটকে লেখা থাকে। কারণ, নাটমঞ্চের সঙ্গে কোনোরকম পরিচয় হবার অনেক আগে থেকেই নাটকের সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু সেই প্রথম অভিনয় দেখার পর 'দিগ্বিজয়ী' নাটক পড়তে গিয়ে দেখলুম যে যেটুকু লেখা থাকে সেটুকু অতি সামান্য, পুরো নাটকটাই প্রায় শর্টহ্যাণ্ড নোট্‌স্‌-এর মতো সংক্ষিপ্ত। আর যেটা চোখে দেখা যায় এবং কানে শোনা যায় তার প্রাচুর্য অসামান্য। এবং সেটা যখন চোখ, কান, বুদ্ধি ও হৃদয়কে, কখনও একটার পর একটাকে, কখনও বা একসঙ্গে সবগুলোকে তৃপ্ত করে তখন অনুভবে যে ঘটনাটা ঘটে তার তুলনা নেই।

"ধরা যাক ওই নাটকেরই তৃতীয় অঙ্ক। নাটকে লেখা আছে, দৃশ্য হচ্ছে একটা মসজিদের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণ। কিন্তু চোখে দেখেছিলুম একটা ছাত। ছাতটার পিছন দিকের অংশ বোধ হয় একটা ধাপের মত উঁচু ছিল। তারই শেষে হল ছাতের নীচু পাঁচিল। এবং তারও পরে পিছনে পটে আঁকা দূরের বাড়িগুলোর উপর অংশ ও আকাশ।

"এই দৃশ্য দেখা মাত্র মন ভরে গিয়েছিল। ছবিতে যেমন বেশির ভাগ জায়গাটা ফাঁকা রেখেই ভরাট করে তুলতে পারেন এক একজন শিল্পী, এ সেই রকম। এই দৃশ্য পরিকল্পনা দেবুবাবুর। তিনি 'সীতা' নাট্যের সময় শ্রীচারু রায়ের সহকারী ছিলেন।...

"'দিগ্বিজয়ী'র তৃতীয় অঙ্কে নাদির শাহ যখন দিল্লী ধ্বংসের আদেশ দেয় তখন নেপথ্যে বিউগল ড্রাম ইত্যাদি বেজে উঠতো, বিস্ফোরণের শব্দ হোত মুহুর্মুহু, আর তার মধ্যে সৈনিকদের চীৎকার ও আক্রান্তদের আর্তনাদ শোনা যেত। পিছনের পট লাল আলোয় রক্তিম হয়ে যেত, আর পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতো সেই লালের মধ্যে।

"যতক্ষণ দিল্লী ধ্বংসের এই তাণ্ডব চলত নেপথ্যে, ততক্ষণ মঞ্চের সামনের দিকের আলো নিভে থাকত, আর একবারে পিছনে, ছাতের পাঁচিলের সামনে, নাদির শাহ দাঁড়িয়ে থাকতেন ছায়ার মত, দর্শকদের দিকে পিঠ করে। এইখানে নাদিরের কিন্তু বক্তৃতা আছে নাটকে। সেটা হয়তো আগে

বলা হত, কিন্তু আমি যখন দেখেছি তখন হোত না। তার চেয়ে এই ছবিটা ঢের বেশী বিচলিত করত।

"তারপর ক্রমশঃ যুদ্ধের আওয়াজ মরে যেত। সৈন্যদের মার্চ করে যাওয়ার kettledrum বাজত, আর দিল্লীর সাধারণ লোকের হাহাকার ও গোঙানি শোনা যেত। এই নাট্যাভিনয় যদি না দেখতুম, তাহলে 'নবান্ন'-র প্রথম দৃশ্যের কল্পনা করা যে সম্ভব হোত না, এ কথা অনস্বীকার্য।"

'দিগ্বিজয়ী' সম্পর্কে 'নাচঘর'-এর মন্তব্য ঃ—

"নাদিরের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়! কি করে তার পরিচয় দেব, অবর্ণনীয়কে কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়? তাজমহলের উপযোগী বর্ণনা আজও পাঠ করি নি—তাজমহলের স্রষ্টাও ভাষায় তাকে ফোটাতে পারতেন বলে বিশ্বাস করি না। 'দিগ্বিজয়ী'র অভিনয়ও ওই তাজমহলের মত। তা বর্ণনা করার সাধ্য আমাদের নেই এবং শিশিরকুমার নিজেও তা কথায় প্রকাশ করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে আমরা দু-চারটে ইঙ্গিত দিয়েই কাজ সারতে চেষ্টা করব।

"অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন, নাদির সাহের ভূমিকায় শিশির-কুমারের অভিনয় কি আলমগীরের মতই ভাল হয়েছে? এ সব জিজ্ঞাসার উত্তর নেই। কারণ যে-শিল্পীর এক সৃষ্টি আর এক সৃষ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবকাশ আছে যথেষ্ট। আসল কলাবিদের প্রত্যেক সৃষ্টিই হয় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; তারা পরস্পরের সঙ্গে তুলনাবিহীন এবং নূতনত্বের বিস্ময়ে অপূর্ব।...'নাদির শাহ' যে 'আলমগীরে'-র মত হয় নি, এইটেই তার শ্রেষ্ঠতার বড় নিদর্শন।

"কী সূক্ষ্ম এই 'নাদির শাহে'র অভিনয়! অসংখ্য স্থলেই শিশিরকুমার তাঁর মুহূর্তস্থায়ী অঙ্গভঙ্গি বা কণ্ঠের সামান্য অর্ধস্ফুট ধ্বনির ভিতরে এমন বৃহৎ ভাব বা অর্থকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, বাংলা দেশের আর কোন অভিনেতাকে তেমন চেষ্টা করতে দেখি নি। এবং তেমন চেষ্টা করবার মত মস্তিষ্ক তাঁদের আছে কি না, সেটাও ভাববার কথা।...

"প্রথম অঙ্কে নাদির শাহ যে-ভাবে সিতারার কাছে প্রেম-নিবেদন করেছে তেমন অদ্ভুত ও মৌলিক উপায়ে যে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ না করেও প্রেম জানান যায়, শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার আগে আমরা তা বিশ্বাস করতুম না। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! কৃত্রিম ও চেষ্টাকৃত দরদ দেখানো নেই, বিকৃত

থিয়েটারী কণ্ঠস্বর নেই, দৃশ্যকে জমকালো করবার জন্যে হরেক রকমের প্যাঁচ নেই, অথচ কত সহজে পৃথিবীর এই অতি-পুরাতন প্রেম নূতন রসের ধারায় দর্শকদের হৃদয়কে স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ করে তুলেছে।

"চতুর্থ অঙ্কের সর্বশেষে ভারতনারী (এই ভারতনারী হচ্ছে নাট্যকারের বিচিত্র সৃষ্টি—অপূর্ব মানসী প্রতিমা) করুণ আত্মনিবেদনের পরে নাদির শাহের সেই পা টানতে টানতে চলা যে কতখানি ভাবের সন্ধান দিয়েছে, রসিক দর্শক নিশ্চয়ই তা অনুভব করতে পারবে। তথাকথিত বিখ্যাত অভিনেতারা এখানে হয়তো প্রচণ্ড মুখভঙ্গি ও খানিকক্ষণ ধরে ছুটোছুটি আর হস্তপদ সঞ্চালনের দ্বারা সমস্ত দৃশ্যটিকে 'মেলো-ড্রামাটিক' করে না তুলে ছাড়তেন না।

"আমরা দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলুম, কিন্তু নাদির-ভূমিকায় সর্বত্রই এমনি সৌন্দর্যের কণা ছড়ান আছে। একটি নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য শিশিরকুমার যে রীতিমত মস্তিষ্ক চালনা করেন, তার মধ্যে যতটুকু সম্ভাব্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি থাকে, তাঁর ভাবগ্রাহী চিত্ত যে সমস্তের কিছুই ত্যাগ করে না, 'দিগ্বিজয়ী' তার অন্যতম উদাহরণ।

"শিশিরকুমারের মত ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর যে এখন আর কোনো বাঙালী অভিনেতার নেই, তা এতদিনে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং তা নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু তবু এটা উল্লেখ না করে পারছি না যে, নাদির-ভূমিকায় তাঁর এই বহু প্রশংসিত কণ্ঠস্বরের লীলা হয়ে উঠেছে অধিকতর অভাবনীয় ও বিচিত্রগতিমধুর। সে যেন এক ধ্বনি-তরবারি-নিপুণ ওস্তাদের শাসনে লীলায়িত হচ্ছে অকল্পিত কৌশলে, বিদ্যুতের মত। ও-কণ্ঠ রহস্যের ভাণ্ডার, ওর ভিতরে কি না সঞ্চিত আছে—বজ্রের নির্ঘোষ, বসন্ত বায়ুর উচ্ছ্বাস, তপ্ত মরুর আর্তনাদ, কুঞ্জকাননের অস্ফুট মর্মর গীতি।

"কে নাদির, কে শিশিরকুমার জানি না। ভূমিকার ভিতরে অভিনেতা ডুবে গেছেন, না অভিনেতার ভিতরে ভূমিকা লুপ্ত হয়ে গেছে? নাদিরশাহের ভূমিকায় আমরা নটের অভিনয় দেখি নি, শতাব্দীর অন্ধকার ঠেলে ঐতিহাসিক নাদিরশাহ চোখের উপরে জ্যান্ত হয়ে জেগে উঠেছে—তার রক্তের স্রোত, মাংসের তপ্ততা, হৃৎপিণ্ডের নৃত্য আমরা নিজেদের জাগ্রত অনুভূতির ভিতরে লাভ করেছি। বিস্মিত হয়েছি, শঙ্কিত হয়েছি, চমৎকৃত হয়েছি। নাদির চরিত্রের আর একটি বড় কথা শিশিরকুমার ভুলে যান নি। রাজপোশাকের হীরা-জহরতের ভিতর থেকে নাদিরের চাষাড়ে ভাব, বিদ্যাহীন মন, ভদ্রতাহীন

রুক্ষ প্রকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি বাইরে বেরিয়ে এসেছে সর্বদাই। অথচ তার মধ্য থেকেই নাদিরের ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা ও বুদ্ধির চাতুর্য যতটা প্রকাশ পাবার তা পেয়েছে। শিশিরকুমারের আর্টের একটা মস্ত বিশেষত্ব হচ্ছে, একাধারে তা অভিনয় ও চরিত্র-বিশ্লেষণ।

"...'দিগ্বিজয়ী' নাটকের অভিনয় দেখার পর দর্শকদের এই ধারণা বদ্ধমূল হোল যে নটনটীদের ব্যক্তিগত শক্তির দ্বারা নয়, তাঁদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা নাট্যমন্দিরের ভিতরে এমন একটি সুরুচিসঙ্গত ও কলাসম্মত পারিপার্শ্বিক সৃষ্ট হয় যার তুলনা অন্য কোনো রঙ্গালয়ে পাওয়া অসম্ভব। ...নাট্যমন্দিরের প্রকৃত গৌরব বিশেষত্ব ও অতুলনীয়তাই হচ্ছে এইখানে এবং এই গুণেই সে শিক্ষিত সমাজকে এত বেশি আকৃষ্ট করে। একমাত্র প্রথম শ্রেণীর প্রয়োগকর্তা ভিন্ন—যাঁর রুচি, রসবোধ আছে, culture আছে—এই জিনিস সৃষ্টি করা আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। 'দিগ্বিজয়ী' মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার আর একবার প্রমাণ করলেন যে বাংলা থিয়েটারে প্রয়োগকর্তা হিসেবে তিনি অতুলনীয়।"

উনত্রিশ

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ।

এ বছরের ২রা জুলাই নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু (জন্ম: ১৭ই এপ্রিল, ১৮৫৩) বঙ্গরঙ্গমঞ্চ থেকে মহাপ্রস্থান করলেন। এর পূর্বে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও মহাপ্রয়াণ করেছেন।

শিশিরকুমার অমৃতলালের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করলেন: "অমৃতলাল খুব বড়লোক ছিলেন। তিনি একজন খুব বড় প্রতিভা, বড় বাগ্মী, বড় লেখক, বড় নাট্যকার, বড় নট। কিন্তু তাঁর একটা রূপ আমার কাছে সবচেয়ে বেশি নিকট, বেশি অন্তরতম—সে হচ্ছে তাঁর নটরূপ। তিনি নটশ্রেষ্ঠ ছিলেন, নটনায়ক ছিলেন, তাই তিনি নটজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন, সমাজের কাছ থেকে তাঁর আসন আদায় করে নিয়েছিলেন। নটের জাত নেই; আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, নট হয়ে হয়তো পতিত হয়েছি। কিন্তু এই পতিত নটসম্প্রদায়কে তিনি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন—তাই তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিই। তিনি নট হতে লজ্জিত হন নি। সমাজ নটকে গ্রহণ করে নি; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিয়েছিলেন। একাজ আর কারুর দ্বারা সম্ভব হয় নি—স্বয়ং গিরিশচন্দ্র

পারেন নি। তিনি সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি থিয়েটার করতেন, বাড়িতে বসে থাকতেন। তাঁর লজ্জা ছিল না—তিনি ছিলেন ভৈরব। পাঁচজন লোক দেখা করতে গিয়ে দেখতো তিনি দিগম্বর হয়ে আছেন। কিন্তু অমৃতলাল সমাজের সঙ্গে মিশে নটের সম্মান আদায় করেছিলেন। অমৃতলাল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে নটকে জাতির মধ্যে বসিয়েছিলেন, সেইজন্য তাঁকে স্মরণ করি।"

এই বছরেই শিশিরকুমার পরিচালিত ও অভিনীত চতুর্থ নির্বাক চিত্র রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' মুক্তিলাভ করে।

৮ই জুন গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করলেন।

এর পর শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রমা' মঞ্চস্থ হল। আর্ট থিয়েটারে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়েছিল। 'রমেশ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু অসার্থক অভিনয়ের দরুণ নাটক জমে নি। আর্ট থিয়েটার এ নাটকখানি 'অচল' বলে শরৎচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন নাকি শিশিরকুমারকে বলেছিলেন,—'ভায়া, ওরা বোঁদে তৈরী করতে জানে, সন্দেশ নয়। তুমি সন্দেশ তৈরী করে একবার দেখিয়ে দাও যে, এটা 'অচল' নয়।' শিশিরকুমার মঞ্চে 'রমা'কে সার্থক করে তুললেন এবং স্বয়ং 'রমেশ'-এর ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: "শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যেন এক রহস্যময় আত্মিক যোগ আছে তাঁর; কী জীবানন্দ, কী রমেশ, কী বিরাজের স্বামী—প্রত্যেক চরিত্রকে তিনি যেন ঠিক সেইভাবেই মূর্ত ও সজীব করে তোলেন, যে-ভাবে বাংলাদেশের পাঠকরা তাদের বহুকাল ধরে কল্পনা করে এসেছে।" এই নাটকে আর একজনও অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন। তিনি শিশির-ভ্রাতা তারাকুমার—'আকবর সর্দ্দার'-এর ভূমিকায়।

২রা নভেম্বর মঞ্চস্থ হল বিখ্যাত 'অভিনয়-শিক্ষা' গ্রন্থের রচয়িতা ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্খধ্বনি'।

এ নাটকটি লিওপোল্ড লুইসের 'The Bells' নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। 'The Bells' নাটকের ম্যাথিয়াস চরিত্রটি অভিনয় করেই স্যার হেনরি আরভিং জগদ্বিখ্যাত হন। একই নাটকে একই ভূমিকায় (কেতনলাল) শিশিরকুমারও অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দেন।

ভূপেন্দ্রনাথ নাটকটির উৎসর্গ পত্রে লেখেন:

"যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে-চেষ্টায়-যত্নে ও প্রযোজনায়
এবং
অনন্যসাধ্য অভূতপূর্ব কৃতিত্বে
'শঙ্খধ্বনি'
নাট্যজগতে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছে,
যিনি ভিন্ন নাট্যজগৎকে অন্য কোন শক্তিমান অভিনেতা যথোচিতভাবে
এই
'শঙ্খধ্বনি'
শুনাইতে সক্ষম হইতেন না বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস,
সেই বর্তমান নাট্যযুগপ্রবর্তক আদর্শ অভিনেতা
শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর
করে
আমার এই নাটক
শঙ্খধ্বনি
প্রীতি উপহার
দিলাম !"

শিশিরকুমারের 'কেতনলাল' সম্পর্কে 'নাচঘর'-এর (২২শে কার্তিক, ১৩৩৬,) মন্তব্য ঃ—

"নাট্যমন্দিরে 'শঙ্খধ্বনি' শুনলুম না—দেখলুম। বিখ্যাত বিলাতী নাটক "The Bells" অবলম্বনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শঙ্খধ্বনি' রচনা করেছেন। গত-পূর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ নট সার্ হেনরি আরভিং ওই নাটকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয়-কৌশল দেখিয়ে অমর হয়ে আছেন। জানি না আরভিং কেমন অভিনয় করতেন। কিন্তু 'শঙ্খধ্বনি'র কেতনলালের ভূমিকায় শিশিরকুমার অতুলনীয় অভিনয়-প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। আরভিং তাঁর চেয়েও বেশি শক্তি দেখিয়েছিলেন শুনলে বিস্মিত হব। শিশিরকুমারের কেতনলাল এক বিরাট সৃষ্টি।"

২৫শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটক মঞ্চস্থ হোল।

নাট্যমন্দিরে 'তপতী' মঞ্চস্থ হবার আগে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবি স্বয়ং এই নাটক প্রযোজনা করেছিলেন এবং 'বিক্রমদেব'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অভিনয় হয়েছিল ২৬, ২৭, ২৮ আর ২৯শে সেপ্টেম্বর।

নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারও বিক্রমদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়ে শিশিরকুমার 'তপতী' নাটক অভিনয় করেছিলেন। এ নাটকেও তিনি তাঁর অতুলনীয় প্রয়োগ ও অভিনয়-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন—তবুও সাধারণ দর্শক এ নাটক নেয় নি। এ নাটক খুলে তাঁর প্রচণ্ড আর্থিক লোকসান হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যে-বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :—"শিশিরকুমারের অত্যন্ত ঝোঁক হল—রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকের অভিনয় করবেন। অনেকে আপত্তি তুললেন…বললেন—যে-সব দর্শকের পয়সায় বাঙলা রঙ্গমঞ্চ চলছে, তারা "তপতী" বুঝবে না—উঁচু শীটে ভিড় হবে,—তাতে শুভার্থী বন্ধু-বান্ধব বেশী—যাঁরা টিকিট কিনে থিয়েটার দেখেন না—তাঁরা এসে খুব তারিফ জানাবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে হবে লোকসান—বিশেষ স্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের "মন্ত্রশক্তি" যে রকম জমেছে, তার সঙ্গে পাল্লা রাখতে হলে 'শস্তা সেন্টিমেন্টের' কোনও ট্র্যাজেডি চাই! না হলে বিপদ ঘটবে! শিশিরকুমার তাতে জবাব দিয়েছিলেন—ব্যবসা করছি সত্য, তা বলে ব্যবসাদারীর খাতিরে 'তপতী' নাটকের অভিনয় করব না! গতানুগতিক রীতিতে শুধু গ্যালারি-মাতানো…তা আমি পারব না। লোকসান হয়, দুঃখ থাকবে না—'তপতীর অভিনয় আমি করবোই এবং এই জিদ বজায় রাখতে তিনি উদ্যোগী হলেন 'তপতী'র অভিনয় করতে। এ সময়ে যাঁরা নাট্যমন্দিরকে অর্থ সাহায্য করছিলেন, তাঁরাও আপত্তি তুলেছিলেন—কিন্তু শিশিরকুমার তাঁদের আপত্তিও গ্রহণ করেন নি। তপতী খোলা হল ১৯২৯ সালের বড়দিনে।…সাজসজ্জা অভিনয় খুবই চমৎকার হল। রাজার ভূমিকায় শিশিরকুমার যে অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, বাঙলা রঙ্গমঞ্চে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ—ঠাকুর-বাড়ির অনেকেই এসে সে অভিনয় দেখলেন। অবনীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখে আমাদের বললেন…রবিকাকাকে লিখব, শিশিরকুমারের অভিনয় হয়েছে চমৎকার—তিনি দেখলে খুশী হবেন খুব—তাঁকে লিখব একবার এসে যেন শিশিরকুমারের তপতী দেখে যান। রবিকাকার অভিনয়ের চেয়ে কোনও অংশে খাটো নয়! এ তারিফ বড় সহজ কথা নয়।

"তপতীতে রাজার ভূমিকায় নেমেছিলেন শিশিরকুমার—তাঁর সে প্রেম বিহ্বলতা,—নৈরাশ্যে ক্ষোভ—শেষে সে ক্ষোভ থেকে আক্রোশ—এসব কি

নিখুঁতই না হয়েছিল...আর কবিতাগুলির আবৃত্তি—যাকে বলে treat! রাজভ্রাতা নরেশের ভূমিকায় নেমেছিলেন জীবন গাঙ্গুলী, দেবদত্ত—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। ত্রিবেদী এবং চন্দ্র সেন—অমলেন্দু লাহিড়ী; কুমার সেন ও রত্নেশ্বর—রবি রায়। মন্ত্রী ও চর—শীতলচন্দ্র পাল; শঙ্কর—নৃপেশনাথ রায়; অনুচর ও প্রতিহার—শৈলেন্দ্র চৌধুরী। রাণী সুমিত্রা—প্রভা; বিপাশা—কঙ্কাবতী; গৌরী—সুশীলাবালা; কালিন্দী—সরলাবালা; মঞ্জরী—পদ্ম; শিখরিণী—তারা। গানগুলি দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে হুবহু শিখে কুমার কনকনারায়ণ সেগুলির শিক্ষা দান করেন, মঞ্চসজ্জার ভার ছিল রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (দেবু) উপরে।

"বিপাশার ভূমিকায় কঙ্কাবতীর গানগুলি—তার রেশ আজো কানে মনে বাজছে যেন। বিশেষ করে 'আলোকচোরা লুকিয়ে এল ঐ', 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' এবং 'তোমার আসন শূন্য আজি'—দর্শকের দল বিমুগ্ধচিত্তে সুর-সুধা উপভোগ করেছিল।

"তপতী আমার মনে হয়—শিশিরের বিরাট কীর্তি। এমন আর্টিষ্টিক ব্যঞ্জনা ...বাংলা রঙ্গমঞ্চে আমি আর কখনো দেখি নি। আলমগীর ষোড়শী...পরে বিজয়া...যোগাযোগ...এসব অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আরো দেখেছি...কিন্তু নাট্যমন্দিরে 'তপতী'র অভিনয় তুলনাহীন। চিরকুমার সভা, শোধবোধ শেষরক্ষা—এসবের অভিনয়ও ভালোই হয়েছিল...কিন্তু তপতীর অভিনয়... এসবের চেয়ে অনেক ভাল। কিন্তু দুর্ভাগ্য...তপতীর অভিনয়ে অর্থাগম হলো না। শেষ দৃশ্যে আগুনের আভা এবং আবহাওয়ার মধ্যে পটক্ষেপ...দর্শকদের মধ্যে শতকরা নব্বইজন কিছুই বোঝেন নি...পটক্ষেপের পরেও বহু দর্শক আসন ছেড়ে ওঠেন নি। প্রথম অভিনয় রাত্রির কথা বলছি, তাঁরা তার পরও আসনে বসেছিলেন...যেন পট আবার উঠবে...আরো কিছু—তাঁরা দেখবেন—নাটক যেন শেষ হয় নি...প্রতীক্ষা সে সমাপ্তির প্রত্যাশায়। শিশিরকুমারকে অবশেষে পটের সামনে এসে দর্শকদের জানাতে হয়েছিল...নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।" ..."তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখে চমৎকৃত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তুমি নতুন থিয়েটার নাও—তোমার জন্য আমি নতুন নাটক লিখে দেবো।"

এখন দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি

লিখেছেন, "আমার কাছে শিশিরবাবুই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা থাকবেন, অভিনয় কলা, অভিনয়ের অভিব্যক্তি ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের দিক থেকে। অথচ শিশিরবাবু একাধিকবার বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথই তাঁর মতে দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। 'ষ্টেজের ওপর হাত ও আঙুল নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। হাত ও আঙুলের ব্যবহারই সবচেয়ে শক্ত কাজ, এবং সে কাজে পূর্ণ দক্ষতা ছিল কবির।' তা হোক শিশিরকুমার আমার কাছে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। সময় পেলে তাঁর সম্বন্ধে দুএকটা কথা লিখতে ইচ্ছে করে। এই ধরণের খানিকটা :

১। তাঁর উচ্চারণ পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের ব্যবহার ; তাকে দীর্ঘ করার ফলে প্রথমত যুক্তাক্ষরের মুক্তি, দ্বিতীয়ত, ব্যঞ্জনবর্ণের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা। চোদ্দমাত্রার পয়ারভাঙ্গার সমগোত্রের। তাই টানা সুর নেই, যা রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিতে ছিল। গদ্য হোল ফলে, কিন্তু একটা ছন্দ রইল লুকিয়ে। ছন্দ সব সময়ে যে ধরা পড়ত না, তার জন্য দায়ী বাংলা ভাষা।

২। আমাদের ভাষায় ক্রিয়া পদ দরিদ্র। তার অভাবে শিশিরকুমারের রঙ্গমঞ্চে গতিবিধি ঐ নতুন ধরণের গদ্য-ছন্দের অনুগামী হল। প্রবেশ, নিষ্ক্রমণ, খুব শক্ত কাজ নিশ্চয়, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে হাঁটা, স্থান (stance আরো কঠিন। ক্লাসিকাল অভিনয়ে ওর জ্যামিতি সহজ। ভাব প্রকাশের অনুযায়ী তার একটা ছক থাকে। শিশিরবাবু সেই ছক বদলেছিলেন। তিনি ভাবের গতিকে অগ্রাহ্য করেন নি ; ভেঙেপড়া গদ্যের ছন্দকে দেহের গতির সাহায্যে ফুটিয়ে ভাবকে সম্পন্নশালী করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতারাই এ-কটি কাজ একত্রে করতে পারেন। সমন্বয়টাই চোখে পড়ে।

৩। অথচ সাহিত্যিক অভিনয় নয়, পুরো অভিনয়। এই জন্যই দর্শক ভুল করতো (এবং সমালোচক ভুল করতেন) যে সর্বত্রই শিশিরবাবু। অর্থাৎ তাঁরা ভাবতেন জীবানন্দ, যোগেশ, ও নিমচাঁদের মাতলামির অভিনয়ে কোন পার্থক্য নেই। তাঁদের মনে হতো শিশিরবাবুই মাতলামি করছেন। বস্তুত তা মোটেই নয় ; জীবানন্দ, যোগেশ ও নিমচাঁদের মধ্যে পার্থক্যটুকু চরিত্রগত ; সে পার্থক্য ব্যবহারেই প্রকাশ ; কিন্তু প্রতি ব্যবহারের সারাংশ, ক্ষীরটুকুই হোল অভিনয়ের বস্তু। বিশেষ হলো ম্যানার, যার অপব্যবহার ম্যানারিজম, তোৎলামি, হাঁচা, ঘাড়নাড়া, একটা কথার অনবরত প্রয়োগ ইত্যাদি। সর্বত্রই শিশিরবাবু নয়, সর্বত্রই অভিনয়। অথচ ষ্টাইলাইজড নয়। (জাপানী,

কি বলী, কি কথাকলি অভিনয়ের মত নয়) ষ্টাইলাইজেসনের ভাষা আমরা হারিয়েছি, যেদিন অভিনয় নৃত্য থেকে পৃথক হয়েছে।

৪। তবু শিশিরকুমারের কল্পনা সার্থক হয় নি। রঙ্গমঞ্চের মঞ্চত্ব তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। যাত্রা—মার্জিত যাত্রা সৃষ্টি করাই তাঁর ইচ্ছা ছিল। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যেকার দূরত্ব তিনি বজায় রাখতে চান নি। ইচ্ছাটা মূলতঃ বিপ্লবী, কিন্তু নানা কারণে হয়ে উঠল না। যতটুকু নিজের দোষ তার চেয়ে অনেক বেশী দোষ দেশের।"

শিশিরকুমারের 'বিক্রমদেব' সম্পর্কে 'নাচঘর' পত্রিকার মন্তব্য: "শিশিরকুমারের বিক্রমদেব শিশিরকুমারেরই উপযোগী হয়েছে। তাঁর আবৃত্তি আর রবীন্দ্রনাথের বাণী—এ এক অপূর্ব মণিকাঞ্চন সংযোগ। কেবল ভঙ্গির ভিতর দিয়ে নয়—তাঁর ভাবানুসারে পরিবর্তনশীল কণ্ঠস্বর এবং অনাহত আবৃত্তির ভিতর দিয়েও বিক্রমদেবের প্রেম, অভিমান, ক্রোধ, অনুতাপ প্রভৃতি ভাব এমন চমৎকার ফুটে উঠেছে, যার বিশেষ বর্ণনা করতে গেলে 'নাচঘরে' স্থান সঙ্কুলান হবে না। তাঁর বিক্রমদেবের ভিতরে কোনরকম অপূর্ণতা নেই।"

শিশিরকুমারের হিতৈষিদের কথাই সত্য হল। তপতী চলল না। আর্টিষ্টিক সাফল্য হল সত্য কিন্তু আর্থিক সাফল্য মোটেই হল না। শিশিরকুমার লোকসানের ধাক্কা সামলাতে পারলেন না। কয়েক রাত্রি প্রায়-শূন্য প্রেক্ষাগৃহেই অভিনয় করলেন। এক অভিনয়-রাত্রে শ্রীমতী প্রভাদেবী কেঁদে ফেলে শিশিরকুমারকে বল্লেন—'বাবা, খালি হলে কেমন করে অভিনয় করি?' শিশিরকুমার বল্লেন—'ওই খালি চেয়ারগুলোকে দর্শক ভেবে চুটিয়ে অভিনয় করে যা।' একটি পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য প্রকাশ করলেন:

"রবীন্দ্রনাথের নাটকের মর্মগ্রহণ করবার মতো শিক্ষার উৎকর্ষ ও রসবোধ এদেশের দর্শক সাধারণের নেই, তাই 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' এদেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আজও অভিনীত হয় নি। 'তপতী'র অভিনয়ে দর্শকের অভাব একথা সপ্রমাণ করছে।"

ত্রিশ

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

অতঃপর কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারের লীজ ফুরোলো। ম্যাডান কোম্পানী শিশিরকুমারকে আর লীজ দিতে সম্মত হল না। বাঙলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এটা মর্মান্তিক ঘটনা। শিশিরকুমার মঞ্চহারা হলেন।

২৫শে মার্চ নাট্যমন্দিরের শেষ অভিনয় হল—'সীতা' আর 'ষোড়শী'। 'সীতা'র অভিনয় শেষ হল। 'ষোড়শী' অভিনয় শুরু হবার আগে শিশিরকুমার দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়ে জানালেন ঃ—

"আজকের অভিনয়ই আমাদের এখানে শেষ অভিনয়; আর আমরা এখানে অভিনয় করব না। কেউ যেন না মনে করেন, নাট্যমন্দির উঠে গেল; নাট্যমন্দির রইল ঠিকই; মাত্র আমরা এই স্টেজটি ছেড়ে দিচ্ছি। এবং যতদিন না সুযোগ সুবিধে হবে, ততদিন পর্যন্ত কলকাতায় অভিনয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এখন আমরা কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াব। ভবিতব্য জানেন, আবার কবে আমরা আপনাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করব। এইখানে এই স্থানটি ছেড়ে দিচ্ছি কেন, তা জানানো দরকার। কলকাতায় landlordism বলে বস্তুটি প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের এই বাড়িটির জন্যে মাসের মাস তিন হাজার দুশো পঞ্চাশটি করে টাকা গুণতে হয়। এত বাড়ি-ভাড়ার সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ চালানো দুষ্কর আমাদের দেশে। থিয়েটারে যে হারে টিকিটের দাম করা হয়েছে, তা এ দেশের পক্ষে খুব বেশী।

"থিয়েটার জিনিসটা 'exotic'—এই যে set-scene, এই যে আলোর প্যাঁচ—এ হচ্ছে বিলাতীর কতকটা অনুকরণ। আমাদের জাতি যদি বেঁচে থাকত, তার মধ্যে যদি জীবনীশক্তি থাকত, তাহলে আমাদের যে নিজস্ব যাত্রাভিনয়, তাই আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছুতে পারত, যাকে জগতের সামনে দাঁড় করাতে পারতুম। তার জন্যে যে ধরনের নাটক লেখা হত, তাই হত আমাদের—বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাটক; যেমন আমাদের বাংলার কীর্তন, বাউল, কালীঘাটের পট প্রভৃতি। জাপানের লোক যে-নাট্যাভিনয় করে, সে তাদের নিজের মত; আমাদের তেমন জিনিস নেই।

"নানা রকম কল্পনা মাথায় নিয়ে নাট্যমন্দির খোলা হয়। নাট্যমন্দির একা শিশির ভাদুড়ী গড়েন নি; অনেক বন্ধু-বান্ধব মিলে এটির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়; এই রকম আরও অনেক আছেন। আমাদের বাসনার এক অংশও পূর্ণ হয় নি। বিলাতীর অনুকরণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে experiment-এর দরকার এবং তার জন্যে টাকা চাই; কিন্তু তা পাই নি। আগে বড়লোকদের কাছ থেকে অনেক ভরসা পেয়েছিলুম; ওই পর্যন্ত। নাট্যমন্দির লিমিটেড করা হল, অথচ শেয়ার বিক্রি হল মাত্র সাতাশ হাজার টাকা।...এই অবস্থায় থিয়েটার চালাতে গেলে যা হয় তাই হয়েছে—ঋণের সুদ ও বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা বাড়ি-ভাড়া দিতে প্রাণ বেরুচ্ছে, অথচ লাভ—অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি—হচ্ছে না একটুও। তাই ঠিক করা গেছে, দেনার অঙ্ক বাড়িয়ে আর কাজ নেই। এ সদভিপ্রায় এর আগেও বার দুয়েক হয়েছিল, কিন্তু কাজে তা পরিণত হয় নি। অনেকের ধারণা টিকিট বিক্রী বাড়াবার জন্যে ও একটা চাল, তা নয়। আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল কতকটা Charles Dickens-এর নভেলের সেই ঘোড়াটার মত—'The horse is going to go, but not going.' আমি থিয়েটারই করতে শিখেছি, ব্যবসা করতে শিখি নি।

"যা হোক, আমি এখনও হতাশ হয়ে পড়ি নি। আমার অন্তরে নাট্য-ভারতীর যে-মূর্তি সাধনার দ্বারা গড়ে তুলেছি, তাকে আমি দেখাবই দেখাব। আমার যথেষ্ট আশা আছে, আমার দেহপাতের পূর্বে আমি আপনাদের satisfaction-এর জন্যে একটা না একটা কিছু করব। যাঁরা আমাদের থিয়েটার দেখেন, টিকিট কেনেন, অনুগ্রহ করেন, ভালবাসেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।"

এই সময়ে প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী আর্ট থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন। অপরেশচন্দ্র শিশিরকুমারকে আর্ট থিয়েটারে সাদরে বরণ করে নিলেন।

আর্ট থিয়েটারে শিশিরকুমারের প্রথম মঞ্চাবতরণ রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' নাটকে 'চন্দ্রমাধববাবু'র ভূমিকায়।

শিশিরকুমারের 'চন্দ্র' সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন, "চন্দ্রবাবুকে তিনি প্রথম জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তুললেন—চিন্তাশীল দার্শনিক, ছোট বড়

নানা বিষয়ে তিনি . গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং ভয়ানক আত্মভোলা মানুষ অর্থাৎ রীতিমত cultured, যেক আগে তাঁকে দেখতে হয়েছিল—দার্শনিক ব্রজেন্দ্র শীল টাইপের মতো। চন্দ্রবাবুর সে অভিনয় দেখে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির অবনীন্দ্রনাথ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শিশির-কুমারকে আলিঙ্গন করেছিলেন।"

একই চরিত্র 'চন্দ্র'—অভিনয় করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী ও শিশিরকুমার। কিন্তু উভয়ের রসসৃষ্টিতে, ভাব-পরিবেশনে এবং রূপায়ণে বিশেষভাবে পার্থক্য দেখা যায়। দুই অভিনেতার 'চন্দ্র' চরিত্রাভিনয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী। তিনি লিখেছেন :—

"রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র 'চন্দ্রবাবু' চরিত্রাভিনয়েও অহীন্দ্রবাবুর খ্যাতি আছে। অথচ ঐ চরিত্রে তিনি অনেকখানি ভাঁড়ামি করিয়া থাকেন। এবং যেহেতু সাধারণ দর্শক স্থূল হাস্যরসই ভালোবাসেন, সেইহেতু অহীন্দ্রবাবুও চন্দ্রবাবুরূপে খ্যাতিমান। চন্দ্রবাবু চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, নিজের কথায় নিজের আদর্শের চিন্তায় সর্বদাই তিনি এমনই তন্ময় থাকেন যে, বাহিরের জগতের প্রতি চোখের সুমুখের ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসরও তাঁহার থাকে না। এক কথায় তিনি আত্মভোলা ব্যক্তি। কিন্তু অহীন্দ্রবাবুর 'চন্দ্রবাবু'তে এই আত্মভোলা ভাব ব্যক্তিটিরই বার্ধক্যেরই ফলস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উহা যে বার্ধক্যের ভ্রান্তি নয়, তাহা বলা বাহুল্য। উহা ব্যক্তিটিরই চারিত্রিক লক্ষণ। শিশিরকুমারের অভিনয়ে এই আত্মভোলা ভাবটি চন্দ্রবাবুর স্বাভাবিক প্রতিফলনরূপেই প্রদর্শিত হয়। চন্দ্রবাবুর আহারের ব্যাপারেও অহীন্দ্র শিশিরকুমারের প্রভেদ বিশেষভাবে চোখে না পড়িয়া পারে না। চন্দ্রবাবুরূপী অহীন্দ্রবাবু একটি রসগোল্লা মুখে দিয়া দক্ষিহস্তের তর্জনী দ্বারা উহা মুখবিবরে প্রবেশ করাইবার যাত্রাসুলভ চেষ্টায় লোক হাসাইয়া থাকেন, কিন্তু চরিত্রটি যে হাস্যকররূপে মাটি হইল সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন না।* শিশিরকুমার কিন্তু ঐ খাওয়ার ব্যাপারেই চন্দ্রবাবুর চরিত্রটিকে দক্ষ

---

* এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্র তাঁর 'নাট্য-সংস্কৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন : "আমি সাধারণ রঙ্গালয়ে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় দেখেছি। শ্রীশ কিংবা বিপিন লাফিয়ে রসিকের কোলে চড়ে বসলো, চন্দ্রবাবু রসগোল্লা খেয়ে আঙুলগুলো আমূল চাটতে লাগলেন। আমার সেই অল্পবয়সেই এগুলোকে অত্যন্ত স্থূল ও অ-রাবীন্দ্রিক বলে মনে হয়েছিল।"

পাদটীকা গ্রন্থকার কর্তৃক উদ্ধৃত।

শিল্পীর মত দু একটি রেখায় ফুটাইয়া তোলেন। তাঁহাকে দু তিনবার খাইতে অনুরোধ করিলেও তিনি স্বভাববশত 'হুঁ হাঁ' করিয়া নিজের কথাই বলিতে থাকেন। পরে আবার অনুরুদ্ধ হইলে খাদ্যদ্রব্যের অতি সামান্য একটুকরা ভাঙিয়া অন্যমনস্কের মতই মুখে দেন, পরমুহূর্তে আবার নিজের কথায় ডুবিয়া যান। ইহাই চন্দ্রবাবুর স্বরূপ।"

এর পর শিশিরকুমার অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কৃত নাট্যরূপ) নাটকে 'মৃগাঙ্ক'র ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর 'মৃগাঙ্ক' সম্পর্কে স্বর্গত সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন: 'এ ভূমিকাতেও তিনি নূতন রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন—অহীন্দ্র চৌধুরীর মৃগাঙ্কর এতটুকু ছায়া পড়ে নি শিশিরকুমারের এ অভিনয়ে।'

স্বর্গীয় সুধীরেন্দ্র সান্যাল লিখেছেন: "মন্ত্রশক্তি নাটকে মৃগাঙ্কর ভূমিকায় শিশিরকুমারকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবেন এই ভূমিকায় প্রচুর প্রশংসালব্ধ অপর অভিনেতার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কোথায় এবং কতখানি। কারণ শিশির প্রতিভায় মৃগাঙ্ক হয়ে উঠেছিল তাঁর একক ও অবিনশ্বর সৃষ্টি।"

আর্ট থিয়েটারে 'মন্ত্রশক্তি' নাটকের একটি অভিনয় বাসরের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "একদিনের কথা কানে এখনও বাজিতেছে। মন্ত্রশক্তি অভিনীত হইতেছে। আমরা অপরেশচন্দ্রের নিকটে ষ্টার থিয়েটারের উপরের ঘরে বসিয়া আছি। শিশিরকুমার মৃগাঙ্ক। দুর্গাদাস ও অহীন্দ্র চৌধুরী এই ভূমিকায় অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। শিশিরকুমারের অভিনয়ে কিন্তু কাহারো কোন ছাপ নাই। তিনি আপন নিজস্ব ভঙ্গীতে অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। সেদিন অভিনয়ের অবসরে উপরে উঠিয়া অপরেশচন্দ্রের উদ্দেশে কথা কয়টি বলিতে বলিতে শিশিরকুমার ঘরে ঢুকিলেন। 'মশায়, এমনই কোরে আমাদের মাথাটা খাচ্ছেন। আপনার লেখা কথাগুলো একটু জোরে বললেই হাততালি পাওয়া যায়।' আমরা শিশিরকুমারের উদারতায় মুগ্ধ হইলাম। অপরেশচন্দ্র বলিলেন, 'যাক মশায়, তবু কথাটা বললেন। আমাকে তো কেউ আমলই দিতে চায় না।"

আর্ট থিয়েটারে শিশিরকুমার 'সাজাহান', 'চাণক্য', আর অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকে 'কর্ণ'র ভূমিকাতেও অভিনয় করেছিলেন। শিশিরকুমারকে পেয়ে আর্ট থিয়েটার প্রচুর অর্থ আমানত করেছিল।

একত্রিশ

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার জনৈক পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে স্কচ অভিনেতা এরিক এলিয়ট এক সন্ধ্যায় 'নাট্যমন্দির'-এ 'সীতা' দেখতে এলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি শিশিরকুমারের অভিনয় দেখলেন। বুঝলেন দুরন্ত প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী। সাজঘরে গিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানালেন। তারপর আরও অনেকগুলি নাটকে অসীম আগ্রহ নিয়ে তিনি শিশিরকুমারের অভিনয় দেখলেন।

এরিক এলিয়ট চলে গেলেন নিউইয়র্কে। সেখানকার বিখ্যাত ইম্‌প্রেসারিও মিস মার্বেরীর কানে তুললেন ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শিশিরকুমারের অনন্যসাধারণ অভিনয় ক্ষমতার কথা। মিস্ মার্বেরী পৃথিবীর সেরা সেরা নাট্যসম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন 'ব্রডওয়ে'তে অভিনয় করার জন্য। এঁরই আমন্ত্রণে বিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় আমেরিকায় অভিনয়-সফরে এসেছিলেন।

এরিক এলিয়টের যোগাযোগে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিস মার্বেরী 'ব্রডওয়ে'তে 'সীতা' অভিনয় করার জন্য শিশিরকুমারকে আমন্ত্রণ জানালেন। মিস্ মার্বেরীর প্রয়োগ-শিল্পী কার্ল রীড আর এরিকের চেষ্টায় রুজভেল্ট কোম্পানী শিশিরসম্প্রদায়ের আমেরিকা সফরের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়েছেন। রুজভেল্ট কোম্পানীর উকিল আইডা ক্যাম্বেল।

শিশির সম্প্রদায়কে নিউইয়র্কে নিয়ে যেতে এরিক এলিয়ট ভারতে এলেন।

শিশিরকুমার শক্তিশালী ক'রে তাঁর দল গঠন করতে পারলেন না। "ক'জন কৃতী নটনটী যাঁরা তাঁর শিক্ষায় মঞ্চজগতে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁরা যেতে রাজী হলেন না"—এ কথা লিখেছেন স্বর্গত সৌরীন্দ্রমোহন। বাধ্য হয়ে দলে নিতে হোল ক'জন 'এ্যামেচার'কে। এঁরা হলেন শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, বেচা চন্দ্র, পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ বসু প্রভৃতি।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর শিশিরকুমার ট্রেণে করাচী হয়ে নিউইয়র্ক রওনা হবেন। তাঁর সঙ্গে যাবেন প্রভা দেবী, কঙ্কাবতী, পরিমল দেবী, বেলারানী, ঊষা (পটল) ও সরলা (বেঁকি)। ১০ই সেপ্টেম্বর খিদিরপুর ডক থেকে আর একটি জাহাজে রওনা হবেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন

ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরী, অমলেন্দু লাহিড়ী, শীতল পাল, রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধাচরণ ভট্টাচার্য, মণি চট্টোপাধ্যায়, বেচা চন্দ্র, অরবিন্দ বসু, পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, কমলা, হেনা, কালিদাসী প্রভৃতি।

রুজভেল্ট কোম্পানীর এই দুখানি জাহাজ শুধু শিশিরসম্প্রদায়ের জন্যই নিয়োজিত হয়েছিল।

যাবার আগের দিন অর্থাৎ ৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আর্ট থিয়েটার স্টার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। সেদিন সন্ধ্যায় সেই সম্বর্ধনা সভায় বাংলার বহু সাহিত্যিক ও কলারসিক উপস্থিত ছিলেন। সম্বর্ধনা সভার সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। আর্ট থিয়েটারের পক্ষ থেকে শিশিরকুমারকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। অপরেশচন্দ্রের অনুরোধে বিখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গত সৌরীন্দ্রমোহন সেই অভিনন্দন পত্রখানি রচনা করেছিলেন। অভিনন্দন পত্রে লেখা ছিল—"তোমার প্রতিভা অপরূপ মহিমায় নবনব সৃষ্টির সুষমাবৈচিত্র্যে শোভাসৌন্দর্যে বঙ্গীয় নাট্যশালাকে রূপোজ্জ্বল করিয়াছে, গৌরবান্বিত করিয়াছে…তোমার প্রতিভায় বঙ্গীয় রঙ্গপীঠ আজ ভারতীয় সুরবৈশিষ্ট্যে মহিমাময়…কলালক্ষ্মীর প্রসাদকিরণে অপরূপ…অভিনয় শিক্ষাদানে তোমার একাগ্র নিষ্ঠা…প্রয়োগ-বিজ্ঞানে তোমার জ্ঞানকুশল কৃতিত্ব…রঙ্গপীঠে দেশকালপাত্র তোমার সুনিপুণ কলাচাতুর্যে প্রাণ পরিগ্রহ করিয়াছে…তুমি নটবীর, নাট্যাচার্য ইত্যাদি।" শিশিরকুমারকে প্রশস্তি জানিয়ে একটি গানও রচনা করেন সৌরীন্দ্রমোহন। সুর সংযোগ ক'রে সেই গানটি গেয়েছিলেন শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক। সেই গানটি ঃ—

"বাংলার নাটমন্দিরে তুমি করিলে মহিমা-উজ্জ্বল—
আরতির দীপশিখার পরশে নাশিলে তিমির-কজ্জল।
অমৃতমন্ত্রে দিলে প্রাণ-রূপ আশা—
বিমল হাসি-ভাতি, নব সুর ভাষা—
অতীত-ভারত-জীবন-সাগরে করিলে মুক্ত উচ্ছল।
ধূপে-গন্ধে শুভ শোচন-পুণ্য
নাট্য বেদীরে করিলে ধন্য—
জ্যোতির রাগে গরব-গণ্য শুভ্ররুচির নির্মল।

তোমার পূজার কুসুম-গন্ধ, তোমার মন্ত্রবাণী
সিন্ধুপারের জনগণমন মুগ্ধ আনিলে টানি।
চাহে তারা আজি তোমারে নিকটে,
বরণ পিয়াসী হৃদয়ের তটে—
মানস-বিজয়ে হও হে যাত্রী গাহি তব জয়-মঙ্গল।"

পরের দিন শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করলেন। মহা ভুল করলেন তিনি। এরিক এলিয়টের কথায় বিশ্বাস ক'রে ভালো মত চুক্তি না করেই তিনি সুদূর আমেরিকা পাড়ি দিতে যাচ্ছেন। আরও একটি ভুল ক'রেছেন শিশিরকুমার—সম্প্রদায়ে ক'জন 'এ্যামেচার'কে স্থান দিয়ে।

শিশির-সূর্য রাহুগ্রস্ত হল। সে-রাহু এরিক এলিয়ট।

২৫শে অক্টোবর শিশিরকুমার নিউইয়র্কে পৌঁছুলেন। তাঁকে নিউইয়র্ক সিটি হলে যে-বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তার বিবরণ একটি সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃত করা হল :—

"As they lay outside the harbour at night, watching the myriad lights of the twinkling skyscraper skyline, a page boy came down the deck with a message to say that S. K. Bhadury had been granted a Mayor's reception on his arrival at the point of landing. With the coming of the day-break, any doubts of the party had as to the meaning of this were soon dispelled. The Mayor's reception committee, headed by the Grand Duchess Marie of Russia and Princess Rospigliosi came abroad and shortly afterwards the whole company, in dhoties and saris just as they had left Calcutta, were being driven down Broadway at break-neck speed in six Rolls Royce motor cars preceded by motor cycle police with screaming sirens.

"During the whirlwind weeks that followed, rehearsals were interposed by visits to the Broadway theatres. Wherever the company went special police were on duty to hold back the crowds of excited peoples, anxious to catch a glimpse of the celebrated Bengalis."

নিউইয়র্কে তখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন আমেরিকায় পদার্পণ করেন তখন তাঁকেও এতটা বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা জানানো হয় নি।

সারা নিউইয়র্ক শহরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল—'The wizard of the Indian stage with a band of nautch girls at Broadway.'

কিন্তু নিউইয়র্কে এসে শিশিরকুমার একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। অতঃপর সেই কাহিনীটিই তুলে ধরব।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে সাধারণ মঞ্চে শিশিরকুমারের নটজীবনের ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়। সেই উপলক্ষে সেদিন 'শ্রীরঙ্গম'-এ 'শিশির-কুমার তাঁর সহকর্মী, সুহৃদ ও অনুরাগীদের আমন্ত্রণ করে আলমগীর নাটকাভিনয়ের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।' অভিনয়ের আগে এক ভাষণে তিনি তাঁর মঞ্চজীবনের সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত করেন। সেই ভাষণে শিশিরকুমার বলেছিলেন, "তার পর এলো আমেরিকা যাবার নিমন্ত্রণ। সেখানে গিয়ে হল আমার নতুন অভিজ্ঞতা। গিয়ে দেখি, আমি যাবার দুমাস আগে থেকেই সেখানে প্রচার* করা হয়েছে ভারতের লোক অসভ্য, অশিক্ষিত, সেখানে শিল্পসাহিত্য বলে কিছু নেই, মেয়েদের সেদেশে তালাচাবি বন্ধ করে ঘরে আটকে রাখা হয়—একদল নাচওয়ালি নিয়ে শিশির ভাদুড়ী এখানে নাচতে আসছেন—তিনি রাজপুত মেয়ে বিয়ে করেছেন—নাটক হবে রাজা সাড়শী (ষোড়শী) ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এ ধরণের প্রচারের প্রতিবাদ করলাম। আমন্ত্রণকারীরা ত্রুটি স্বীকার করে বললেন যে তাঁরা এরপর ঠিকভাবে প্রচারকার্য চালাবেন। কিন্তু কোম্পানীর প্রচার-সচিব† কিছুদিন ভারতে ছিলেন, তিনি

* সেখানকার একটি সংবাদপত্রে কি ধরণের প্রচার হয়েছিল তার নিদর্শন উদ্ধৃত করছি : 'He has secured a company of beautiful nautch girls, maidens trained in the service of religion whose homes have been in the temples of India, and who, save for some specieal dispensation which Bhadury must have arranged, would inevitably sufier loss of caste for leaving their Gods behind....Many of these wonderful Nautch girls whom Bhadury is bringing to America come from Benares, where it has been their task to perform twice daily before their idols, for the atonement of their own souls and then in their intercessions through the rythem of religions dancing for the sins of others."

† এরিক এলিয়ট।

ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কথা বলতে পারতেন। তিনি আমাকে 'তুম' 'তুম' বলে সম্বোধন করে কথা বলতেন। তাতে আপত্তি করায় তাঁর সঙ্গে আমার বচসা হয়ে যায় এবং কোম্পানী বেঁকে বসে বলেন যে, তাঁরা আর কোন দায়িত্ব নেবেন না।"

আগেই বলেছি, ২৫শে অক্টোবর শিশিরকুমার আমেরিকা পৌঁছুলেন আর ঘোষিত হল বিল্টমোর থিয়েটারে ২৮শে অক্টোবর 'সীতা'-র প্রথম অভিনয় হবে। প্রথম সপ্তাহের জন্য 'হাউস ফুল' হয়ে গেল। সীটের সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য হয়েছিল বারো ডলার অর্থাৎ প্রায় ছত্রিশ টাকা। ২৭শে অক্টোবর ড্রেস রিহার্স্যাল। সেইদিন থেকেই দুর্দশার আরম্ভ হোল।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী শিশির-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। তিনি এই সফরের বিস্তারিত বিবরণ তাঁর 'ডায়েরী'-তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই ডায়েরী 'রূপমঞ্চ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। যোগেশচন্দ্রের সেই 'ডায়েরী'র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। যোগেশচন্দ্র তাঁর 'ডায়েরী'তে ড্রেস রিহার্স্যাল সম্বন্ধে লিখছেন ঃ

"২৭শে অক্টোবর আমাদের ড্রেস-রিহার্স্যাল হয় ; আর, আটাশে অভিনয় হইবার কথা ছিল। আমাদের সঙ্গে তম্পা জাহাজে দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদ আসিলেও অনেক কিছুই কলিকাতা হইতে আনা সম্ভবপর হয় নাই। সেগুলি এখানে প্রস্তুত করিয়া দিবার কথা ছিল। নিউইয়র্কে নামিয়াই আমরা শুনিলাম, আগামী মঙ্গলবার অভিনয়। মাঝে আছে আর চারদিন। যদি আমাদের লোকজন সঙ্গে থাকিত, একদিনেই স্টেজ সাজানো সম্ভব হইত। কিন্তু বিদেশী লোক,—এ কাজে তাহারা অনভ্যস্ত। তার উপর, পুরা দুইটি দিন লাগিয়া গেল কাস্টমসের নিকট হইতে জিনিসপত্র ফিরিয়া পাইতে। ড্রেস-রিহার্স্যাল দিতে গিয়া দেখি, 'সিন'গুলি সাজানো হইয়াছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্ম নাই, সিঁড়ি নাই, পিছনের পর্দা নাই। এরিক কলিকাতায় বলিয়াছিলেন যে, এখানে আসিয়া ওগুলি সংগ্রহ করা হইবে, কিন্তু হয় নাই।

"তারপর রিহার্সাল আরম্ভ হইল—Dress-rehearsal, which is as good as play. আলোর যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকিলেও আলোকসম্পাতের কোন লোক নাই। ইলেকৃট্রিসিয়ানকে নির্দেশ দিতে পারেন, এমন কেহ ছিল না। Indian

Orchestra, যাহার একান্ত আবশ্যক ছিল, সেটি একেবারেই নাই। এদেশে হার্মোনিয়ম লোকের দু'-চোখের বিষ। আবার, বাঁশী বাজাইবার লোকও আমাদের ছিল না। এক, বাঁয়া-তবলা—তাও শীতলবাবু মেয়েদের পায়ের তাল দেখাইবার জন্য জোরে দুমদাম পিটিতেছিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত সবরকমের অসুবিধাসত্ত্বেও রিহার্সাল আরম্ভ হইল। শ্রীশবাবু 'দুর্মুখ', ভদ্রলোক পার্ট পর্যন্ত মুখস্ত করেন নাই। প্রথম হইতেই তিনি 'তো-তো' আরম্ভ করিলেন। শিশিরবাবু মৃদুস্বরে তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। প্রেক্ষা-গৃহ হইতে তাহা শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। পরে শুনিয়াছিলাম, কার্ল রীড নাকি শ্রীশবাবু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'My God ! The man does not know his role. And I hear the play has run there three hundred nights.'

"যা হোক, কোন রকমে ভালয় ভালয় প্রথম অঙ্কের অভিনয় হইয়া গেল, আর কোন গণ্ডগোল ঘটে নাই। গোলযোগ বাধিল 'দ্বিতীয় অঙ্কে'। মূল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে শম্বুকবধ। সময়-সংক্ষেপের জন্য উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্ক হইয়াছে বাল্মীকির তপোবনের দৃশ্য। অথচ, এই আঠার বৎসর সময় যে চলিয়া গেল, তার কোন ইঙ্গিত মধ্যে কোথাও দেওয়া হইল না। বরং, অঙ্কের প্রথমে নাচ-গানের জন্য "মঞ্জুল মঞ্জরী নবসাজে" গাওয়া হইল। তাও আবার মোট সাতজন নর্তকীর মধ্যে যে দুইজন নাচ জানে, সে দুজনেই কালো। একজন মোটা, একজন রোগা! এইবার মিস মার্বেরী জ্বলিয়া উঠিলেন এবং এরিককে গালিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এরিক নিজের দোষ শিশিরবাবুর ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিল। তারপর বাল্মীকি মহাশয় প্রবেশ করিলেন, পরে লব-কুশ। শুধু লোকই যাওয়া আসা করে। তারপর আসিলেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ শত্রুঘ্ন—শ্রীমান বেচা চন্দর। তার আসিবার ও কথা কহিবার ভঙ্গী দেখিয়াই মিস মার্বেরীর পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন,—'Look at the man, has he ever been on the Stage ?'—ইহার পরই তাঁরা চলিয়া যান। বাকি দুই অঙ্ক অভিনয় হইল বটে, কিন্তু নাটক কোথাও জমিল না। শ্রীশবাবু আবার পার্ট ভুলিলেন। 'লক্ষ্মণ, ভরত,—ফিরাও বালকে' বলিতে আলো নিভিল না। শিশিরবাবুকে অত্যন্ত সজ্ঞানে মূর্চ্ছা যাইতে হইল। কোনগতিকে রিহার্স্যাল শেষ হইল।"

মিস মার্বেরী আর রুজভেল্ট কোম্পানীর উকিল আইডা ক্যাম্বেল অভিনয়

অচল বলে সমস্ত চুক্তি ভেঙে দিলেন। পরদিন 'The New York Sun' কাগজে খবর বেরোল, কলকাতা থেকে একটা bogus কোম্পানী এসেছে। এরিকের সঙ্গে শিশিরকুমারের বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

শ্রীসতু সেন তখন নিউইয়র্কে 'নিউইয়র্ক ল্যাবরেটরি থিয়েটার'-এর 'টেকনিক্যাল ডাইরেকটর'-এর পদে আসীন। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন বিখ্যাত নাট্য-বিশেষজ্ঞ বলিস্লাভস্কির কাছে স্টেজ পরিচালনার টেকনিক শিখতে। সেই দুঃসময়ে শিশিরকুমারের সহায় হলেন শ্রীসতু সেন। এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের পূর্বোক্ত ভাষণের পরবর্তী অংশ উদ্ধৃত করি: "চুক্তি ভঙ্গের দায়ে মামলা করা যায় কিনা আমি ভাবলাম। শ্রীসতু সেন তখন আমেরিকায় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে পরামর্শ করলাম। সতুবাবু বললেন, 'মামলা করলে তিন বছরের আগে শুনানী শেষ হবে না। কোম্পানী বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য নোটিশ দেবে, টাকাও অনেক লাগবে, বিদেশে থেকে এসব করা সম্ভব হবে কি?' আমি তখন হাল ছেড়ে দিলাম। এই সময়ে একজন ইহুদী এগিয়ে এলেন আমাকে সাহায্য করতে। তাঁর সহায়তায় আমি আমার নাটক আমেরিকায় মঞ্চস্থ করতে পারলাম।"

পুনরায় নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করতে প্রায় মাস তিনেক সময় অযথা নষ্ট হল। নিউইয়র্ক থেকেই ব্যালে গার্ল সংগ্রহ করে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হল। এদিকে জাহাজে সমস্ত দৃশ্যপট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো আবার অঙ্কন করিয়ে নিতে হল।

এই সব দুর্বিপাক, অসুবিধা ও অব্যবস্থার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত কি ভাবে নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হল তার বিবরণ যোগেশচন্দ্রের সেই 'ডায়েরী' থেকে পুনরায় উদ্ধৃত করছি। যোগেশচন্দ্র লিখছেন:

"আটাশে, মঙ্গলবার—স্থির হইল, অভিনয় কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, তিনটা রিহার্সালে সমস্ত ত্রুটি সারা যাইতে পারিবে।

"ঊনত্রিশে, বুধবার—মন বড় দমিয়া গেল, অভিনয়টা নির্দিষ্ট দিনে হইয়া উঠিল না।

"পনেরই নভেম্বর, শনিবার—আজ আবার একটা পাকা কথাবার্তার দিন। আমরা যে কোথায় দাঁড়াইয়া আছি, ঠিক বুঝিতেছি না। আমাদের 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' পার করিয়া কেন বা আনিল, আর কেনই বা এইভাবে বসাইয়া রাখিয়াছে? যদি বলিত—'না, তোমাদের দ্বারা হইবে না,' তাহা

হইলেও বাঁচিতাম। পঁচিশজনে মিলিয়া চেঁচাইয়া লোকদের বলিতাম—'এই লোকগুলো আমাদের আশা-ভরসা দিয়া এখানে আনিয়া এইভাবে বিপদে ফেলিয়াছে।' আমরা কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছি না। এখানে অর্থ ও যশ উপার্জনের এত পথ খোলা আছে যে, শিশিরবাবুকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা অনেক কিছুই করিতে পারি, ভীত হইবার কারণ নাই। কিন্তু, এই চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, বড় অসহ্য!

"উনিশে, বুধবার—ভরসার মধ্যে এই যে, কাল সন্ধ্যায় 'ওয়ার্ল্ড' কাগজে আমাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছে। শহরে গুজব রটিয়াছিল যে, আমরা অভিনয় না করিয়াই ফিরিব। মিস মার্বেরি ও কার্ল রীড প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমরা ডিসেম্বর মাসে 'ব্রডওয়ে'তে অভিনয় করিব।

"বিশে, বৃহস্পতিবার—কিন্তু কই? মিস মার্বেরি ও মিস্টার রীড শুধু কাগজেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, আমাদের সঙ্গে আজও কোনো কথা পাকা হইল না। যে আমেরিকায় প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান, সেখানে আসিয়া আমরা একটি মাস চুপ করিয়া বসিয়া আছি। দেশের কাগজপত্রে আমাদের এই নীরবতা সম্বন্ধে কি লিখিতেছে, কে-ই বা তা জানে!

"বাইশে, শনিবার—মনে বড়ই অশান্তি। কোন কাজ করা একেবারেই অসম্ভব। ভগবান রক্ষা না করিলে এ অবস্থায় মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না। আজ তিন সপ্তাহ ধরিয়া রীড কেবল আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, রবি নয় সোম—এইভাবে শিশির-বাবুর কাছে সময় লইতেছে।

"পঁচিশে, মঙ্গলবার—আজিকার দিনও গেল। কাল সতু সেন বলিয়াছিলেন, 'You will know everything by sixteen hour.' সে ষোল ঘণ্টা গত হইয়াছে, নূতন জ্ঞানলাভ কিছুই হয় নাই। বেলা বারটায় শিশিরবাবু বলিয়াছিলেন, 'Good news'! কিন্তু, সেটি যে কি, তাহা বুঝি নাই। অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, 'Good news'!

"একত্রিশে, বুধবার—এতদিন পরে শিশিরবাবু গতকাল নূতন চুক্তিপত্রে সহি করিলেন। মনে হইতেছে, জানুয়ারী মাসের মধ্যে অভিনয় হইবে।

"সাতাশে ডিসেম্বর, বুধবার—সকালে কাগজে বাহির হইয়াছে, আগামী সোমবার, বারই জানুয়ারী, ভ্যাণ্ডার্বিল্ট থিয়েটারে আমাদের অভিনয় হইবে। কাল বৈকাল পর্যন্ত ঠিক ছিল, থিয়েটার হইবে ওয়ালডাফ থিয়েটারে। আজ

সকালে রিহার্সাল দিতে গিয়া দেখিলাম, অন্য নাটকের দৃশ্যপট বিন্যস্ত করা আছে। মাঝে একবার কার্ল রীড আসিলেন, তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত বোধ হইল। আমাদিগকে লইয়া তিনি আমাদিগের মতই বিব্রত হইয়াছেন। তবে এ রকম হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপারে ইঁহারা অভ্যস্ত।

"সকালবেলা থিয়েটারে শ্রীশবাবু হঠাৎ মূর্চ্ছা যান। সেইখানেই ডাক্তার ডাকা হয়। তারপর এম্বুলেন্সে তাঁহাকে বাসায় আনা।

"তেরই, মঙ্গলবার—গত রাত্রে বহু শঙ্কিত অপেক্ষার পর অভিনয় হইল। ভাল অভিনয় হইয়াছে। দর্শক সহানুভূতির সহিত আমাদের গ্রহণ করিয়াছেন। সকালে প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্রেই আমাদের কথা বাহির হইয়াছে। "নিউইয়র্ক আমেরিকান" কাগজে খুব বেশী প্রশংসা করিয়াছে। কোন কাগজে অভিনয়ের নিন্দা করে নাই। আমাদের অভিনয়ে যে পাশ্চাত্যপ্রভাব আছে, কোন কোন কাগজে তাহারও ইঙ্গিত আছে। 'But even the meanest player last night can boast of an enunciation and intonation far excelling that of most American stars.' শিশিরবাবু ও শ্রীমতী প্রভার খুব সুখ্যাতি করিয়াছে।

"চৌদ্দই—আরও অনেক কাগজে আমাদের সমালোচনা দেখিলাম। "Sun", "Evening World", "Daily News", "Evening Graphic" প্রভৃতি পত্রিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছে। ওই সমস্ত সমালোচকের এ দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে।

"পনেরই, বৃহস্পতিবার—দেশের ও নিজেদের সম্মান রক্ষা হইয়াছে। বিদেশী ভাষা, বিদেশী আদর্শ,—লোকের ভাল লাগিবার সম্ভাবনা অল্প। তবু অনেকের ভাল লাগিয়াছে।

"সতেরই, শনিবার—আজ এই সপ্তাহের শেষ অভিনয়, আর অভিনয় হইবে কি না ঠিক নাই। মিস মার্বেরী ও কার্ল রীড আমাদের বর্ত্তমান মুরুব্বী মিস্টার গ্রীসবনের উপর আমাদিগকে চাপাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। আমাদের অভিনয় তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

'These men have been mishandled indeed. They deserve better luck.' নিউইয়র্কে যদি অন্ততপক্ষে তিন সপ্তাহ চলে, তাহা হইলে মফঃস্বলে অনেক বেশি চলিবে।...

"...এই ডায়েরির প্রথম দিকে জাহাজে থাকিবার সময় একদিন লিখিয়াছিলাম—'নিউইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার প্রবল বাসনা আমার আছে।' আমাদের প্রথম নাট্যাভিনয়ে তিনি উপস্থিত থাকিবেন, এ ব্যবস্থাও পূর্বে ছিল। তারপর আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইলেন। আমাদেরও অভিনয় হইল না। এখন তিনি সুস্থ হইয়া বক্তৃতা দিয়াছেন, লোকজনের সঙ্গে দেখাও করিয়াছেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু, তাহাতে এখানে তেমন কোন সাড়া পড়ে নাই। আজ আমার শিশিরবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকট যাইবার কথা আছে। যাওয়া হইবে কি না, জানি না।... 'Variety Fair' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আমাদের ভারতবাসী সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছে, তাহাতে আমাদের কাহারও এখানে আর কিছুই প্রত্যাশা করিবার নাই। সকলেই বলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথই নাকি ইহার জন্য দায়ী; মাইকেল ইয়োরোপে পদার্পণ করিয়াই যে-কথা বুঝিয়াছিলেন, 'পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'—রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমবাসী প্রতি ভারতবাসীর সে-কথা বুঝা উচিত। ভারতীয় শিল্পকলা, নাট্যকলা, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, ইতিহাস, ইয়োরোপে কি আমেরিকায় বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। নিজেরা অর্থ-ব্যয় করিয়া যদি উহা বুঝাইতে পারি, ভাল, নতুবা, এ দেশের অর্থে ভারতীয় সভ্যতা প্রচার, এ দেশের বিত্তশালী লোকের চোখে যে কতদূর হীনতার কার্য, এই লেখাই তাহার প্রমাণ।

"Variety Fair লিখিয়াছে—

'We nominate oblivion for Sir Rabindranath Tagore because his 'mystical' poems have been acclaimed chiefly by the Pseudo-cultured, because in all his portraits he takes care to look as much like a holyman and a saint as possible, because he is the chief of all the Mahatmas and Swamis who swarm over here to spread their informations about India and finally because they visit the United States every few years, collect a comfortable sum in lecture fees and depart, giving out interviews in which they denounce America for her 'Materialism.' ইহার পরে ভারতবর্ষ

হইতে যাঁহারা এখানে বক্তৃতা দিতে আসেন, তাঁহাদের এখানে আসিবার কি কোন অধিকার ও প্রয়োজন আছে ?

"এই কথা লইয়াই কাল শিশিরবাবু, সত্তু সেন ও মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার আলোচনা হইতেছিল। সত্তু সেন বলিলেন যে, তিনি একবার মহাত্মাজীকে আমেরিকায় আসিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। উহাতে উল্লেখ ছিল—'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে'র জন্য এই উপায়ে আমেরিকা হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যাইতে পারে। উত্তরে মহাত্মা লিখিয়াছিলেন—

'I am very thankful to you for your proposal. But at present I can't leave India. India ought not to take American money for her national movement and must raise her own money. I shall go to America, only when India is independent and speak of India and Indian culture without taking money for my lectures.'

"এখন দেখিতেছি, এখানে শুধু ছাত্র ও পর্যটক হিসাবেই আসা চলে। ভারতসভ্যতা বিদেশে প্রচার করিতে হইলে মহারাজ অশোকের মত রাজশক্তির আবশ্যক।"

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে 'সীতা'র প্রথম অভিনয় হয়েছিল। এই অভিনয় সম্পর্কে নিউইয়র্কের বিভিন্ন সংবাদ পত্রের প্রশংসাসূচক মন্তব্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

THE NEW YORK SUN লিখেছিলেন :—

"The Hindu players made a very good impression. Their acting compares favourably with the acting of any foreign troupe I can think of, excepting, of course, the Moscow Art Theatre players, who, to me at least, are the best actors in the world The Hindu players are so graceful in their movements that their many gestures are never awkward. They speak their lines clearly and distinctly, even if one does not know what they are saying. And the star, Mr. Bhadury, who plays Rama, is an emotionel actor of considerable power...There is a certain

nobility inherent in this play, and this nobility even pervaded the acting. Doubtless this was because the love theme is on such a high plane. One had the feeling that the love of RAMA and SITA would persist through all eternity."

THE NEW YORK AMERICAN উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে লিখলেন :—

"Novelty came to the current theatrical season at the Vanderbilt theatre last night in perhaps the most ancient play that has ever been shown on Broadway...This company of Hindu actors, speaking in language so distinctly foreign to American ears, succeeded in vitalising this story to such an extent that scarcely a person left before the final curtain. After all, beauty and anguish know no tongue. There is a universal language, and art their sole medium of expression. The beauty of poetry, the anguish of the King Rama and his Queen were too real to escape transmission over the footlights on the wings of an artistry rare to this country.

"Sisir Kumar Bhadury is an actor of the finest rank. Last night play kept him in too contrasting moods—lyric and emotion. He seemed to excel in the latter, investing some of his scenes with a poignancy that strongly moved his audience. The supporting cast was almost equally strong, the women particularly."

THE EVENING WORLD-এর সমালোচক অভিমত প্রকাশ করলেন :—

"Of course there were few in the audience who understood the language of the visitors. But that mattered little. So superb was their pantomime, so illustrative was a shrug of the shoulders, a flash of the eye, and a lifting of the hands or arms, that one could follow the story with little trouble..."

"It was a treat to watch Sisir Kumar Bhadury as Rama. His voice was bell-like, his pantomime, which told the story

as clearly to the audience which understood not a single word, was so perfect that the words any way would have been unnecessary. Excellent too, was Sreemati Prava as Sita, the queen. All the others in the cast were interesting...

"It may not harm many who take the stage as their profession to drop into the Vanderbilt to see how strangers in a strange land, speaking a strange language to their patrons, can through their pantomime, interpret a story so that, as pointed out, the verbal picture is unnecessary.

"You 'll enjoy Sita as something unique."

THE DAILY NEWS NEWYORK-এর সমালোচক মন্তব্য প্রকাশ করলেন :—

"The players reveal themselves as handsome and graceful in their bright robes and spangles, and their language as a mellifluous one. Spoken as it was last night, it often has the quality of a song—a melody of more variety and depth than, for instance, the sing song of China's Me-Lan-Fang.

"As actors Bhaduri and his company are more easily understood than were the Chineese and Japaneese last season. Their gestures and vocal inflections are readily divined and the performances are generally emotional."

THE EVENING GRAPHIC-এর মন্তব্যটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সমালোচক লিখলেন 'সীতা'র অভিনয় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের কৌতূহলী করে তুলেছে। সেই মন্তব্যটি উদ্ধৃত হল :—

"The star of this company is undoubtedly an actor of great ability and his supporting company seem to take their work very seriously, portraying each role, large or small, with great emphasis, conviction and many gestures. Then too there is something quite musical and pleasant about the sound of the language. The native songs and dances were particularly interesting.

"Sita further arouses one's curiosity about India and at least presents a picture of what goes on in Sisir Bhadury's Theatre in Calcutta."

আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে শিশিরকুমার তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে দিল্লী এলেন এবং সেখানে তৎকালীন ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রকুমার লাহিড়ী চৌধুরীর সঙ্গে যোগস্থাপন করে ভাইসরয় লর্ড আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। প্রথমে বড়লাটের মিলিটারি সেক্রেটারি শিশিরকুমারকে কোন আমলই দিলেন না। তারপর 'দি সান' পত্রিকার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা দেখে তিনি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিলেন। বড়লাটের নির্দেশে ২০শে মার্চ 'ভাইসরয় হাউস'-এ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হিসেবে 'সীতার' অভিনয় হোল। অভিনয় দেখে বড়লাট খুশি হলেন এবং শিশিরকুমারের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বড়লাট শিশিরকুমারকে ইংলণ্ড যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। 'কিন্তু আমেরিকা থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন তাতে ইংলণ্ড যাবার জন্য বড়লাটের এই আমন্ত্রণের পেছনে একটা অভিসন্ধি ছিল বলে পরবর্তীকালে শিশিরকুমারের মনে হয়েছে। তখন বিলেতে গোল টেবিল বৈঠক হচ্ছিল। শিশির সম্প্রদায় ইংলণ্ডে গিয়ে যদি অভিনয় ব্যাপারে কোন কারণে অসফল হতেন তবে রয়টারের মারফৎ সারা বিশ্বে সেই খবর ছড়িয়ে দিয়ে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করা চলত। তিনি মনে করেন, তাঁকে ইংলণ্ডে আমন্ত্রণ করার আসল উদ্দেশ্য ছিল এই।' যাই হোক, পরের দিন শিশিরকুমার মিলিটারি সেক্রেটারির কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। সেই চিঠিতে বড়লাট তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। সে চিঠিটি এই :—

D. O. No 1882.

The Viceroy's House.
New Delhi
The 21st. March, 1931.

Military Secretary,
to the Viceroy,

Dear Mr. Bhadury,

I am desired by their Excellencies to tell you how much they enjoyed your performance last night. It was a consummate piece

of acting and the greatest praise is due not only to you yourself who took the principal part, but also to all the rest of your cast.

The fact that we were able to follow the play although we could not understand a word of the language, in itself says much for the acting. Their excellencies were quite thrilled with it and desire me to offer you their warm congratulations.

Yours faithfully
Sd/Lt. Col. C. O. Hurvey
M. S. V.

শিশিরকুমার কলকাতায় ফিরলেন।
মঞ্চ নেই, অর্থ নেই, ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

বত্রিশ

অন্ধকারে একটু আলোর রেখা দেখতে পাওয়া গেল। একটি নতুন নাট্যশালা খোলার জন্যে অভিনেতা রবি রায় ও অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে একটা লিমিটেড কোম্পানী গঠন করেছেন। কোম্পানীর ডিরেকটর বোর্ডে রয়েছেন রবি রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ষষ্ঠীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, এন. সি. চন্দ্র, ডি. এন. ধর, হেমচন্দ্র দে ও এস. আমেদ। ম্যানেজিং ডিরেকটর অমর ঘোষ। ৬৫।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে নতুন থিয়েটার বাড়ির জন্ম হল—নাম 'রঙমহল'।

ইতিমধ্যে আর একটি নতুন নাট্যশালা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ রাজা রাজকিষণ স্ট্রীটে খোলা হয়েছে। নাম 'নাট্যনিকেতন'। খুলেছেন প্রবোধচন্দ্র গুহ। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে শিশিরকুমার কয়েকরাত্রি নাট্যনিকেতন মঞ্চে অভিনয় করেছেন।

উদ্যোক্তাদের আহ্বানে শিশিরকুমার রঙমহলে প্রধান অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষকরূপে যোগদান করলেন। বছরে দশ হাজার টাকা বোনাস। আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত সতু সেনের ওপর প্রযোজনার ভার ন্যস্ত করা হল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক দিয়ে 'রঙমহল'-এর উদ্বোধন হল।

ভূমিকালিপি :—নিমাই—শিশিরকুমার, অদ্বৈত—যোগেশ চৌধুরী, শ্রীবাস—শীতল পাল, নিতাই—নৃপেশ রায়, পাগল—কৃষ্ণচন্দ্র দে, আচার্য—অমলেন্দু, রামরূপ—কার্তিক দে, বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভা, শচীমাতা—কঙ্কাবতী, মালিনী—রাজলক্ষ্মী, নারায়ণী—সরযূবালা।

শিশিরকুমারের অনুরোধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রঙমহল' উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে অপরেশচন্দ্র বলেন—

"সহৃদয় সুধীবৃন্দ!

"আজ একটি নূতন থিয়েটার খোলা হচ্ছে। এই নূতনের উদ্বোধনের ভার পড়েছে আমার ওপর। আমি সানন্দে এই ভার গ্রহণ করেছি। যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার করিনি। যাঁরা এ কার্যের ভার আমার উপর দিয়েছেন, তাঁরাও বোধহয় ঠিক যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার করে ভার আমায় দেন নি। সে বিচার করলে থিয়েটারের বাইরে থেকে অনেক গুণবান যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁরা এ সম্মানজনক গুরুভার দিতে পারতেন এবং সেইটেই সবচেয়ে শোভন হত। তাঁরা কিন্তু তা করেন নি। কেন করেন নি?

"আমার মনে হয় শিশিরবাবু এবং এই নূতন থিয়েটারের কর্মকর্তা যাঁরা, তাঁরা আমার চেয়ে বয়সে তরুণ হলেও এখনও অনেকটা প্রাচীনপন্থী, পুরাতনের অনুরাগী। যুগের হাওয়া আজও তাঁদের জাত মারতে পারে নি। ভগবান করুন যেন কখনও না মারতে পারে। তাই তাঁরা সমব্যবসায়ী ও স্বজাতির মধ্য থেকেই এই শুভ উদ্বোধন কার্যে পৌরোহিত্য করবার লোক খুঁজেছেন এবং এই নটজাতির মধ্যে আমার বয়স বেশী মনে করেই আমাকে পৌরোহিত্যের ভার দিয়ে শুধু আমার গৌরব বাড়ান নি, বাংলার নটজাতির সম্মান রক্ষা করেছেন। আর এইজন্যেই অযোগ্য হলেও আমি এই ভার নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হই নি, বরং আনন্দিতই হয়েছি।

"আনন্দিত হবারই কথা। নূতন থিয়েটার খোলা হচ্ছে, এতে আমাদের চেয়ে আনন্দ আর কার বেশী? আনন্দের কারণ একটা নূতন থিয়েটার জন্মাচ্ছে বলে, গোত্রবৃদ্ধি হচ্ছে বলে। গোত্রবৃদ্ধি হলে বাড়ির মধ্যে সবচয়ে আনন্দ বেশী হয় বাড়িতে যারা বুড়ো আছে তাদের। তার কারণ বুড়োদের দিন সংক্ষেপ, তাদের চোখের উপর যত গোষ্ঠী বৃদ্ধি হয়, ততই আনন্দ বাড়ে, ধারা বজায় থাকবে এই আশায়। তাই এই শুভ উদ্বোধন কার্যে, এই আনন্দোৎসবে সর্বকল্যাণময় নটরাজের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি

এই যে, বাংলায় নূতন একটি রঙ্গালয় আজ জন্মালো, যার নামকরণ হয়েছে রঙমহল, এই রঙমহলের জীবন সুদীর্ঘ হোক, এ সবল হোক, সুস্থ ও সুন্দর হোক, বঙ্গনাট্যবাণীর মুখ উজ্জ্বল করুক। আমার বিশ্বাস এ তা করবেই। কারণ এর লালনপালনের ভার যিনি নিয়েছেন, তিনি স্বনামধন্য নট আমার স্নেহের ও শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীমান শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

"শুধু নট বললেই শিশিরবাবুর সম্বন্ধে সবটা বলা হয় না। তিনি বর্তমান যুগে বাংলা রঙ্গালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ রূপ ও রসস্রষ্টা। কর্তৃপক্ষগণ শিশিরবাবুর মত গুণীকে এই নূতন থিয়েটারের কর্ণধার নির্বাচন করে তাঁদের সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।...

"সহৃদয় দর্শকবৃন্দ, আপনারাই আমাদের উৎসাহদাতা, আপনারাই আমাদের পৃষ্ঠপোষক। আপনাদের কাছে রসের নিবেদন করেই আমাদের আনন্দ। আপনাদিগকে অভিবাদন করে আমি এই শুভ উদ্বোধন কার্য শেষ করলাম। আপমারাও আমার সঙ্গে এই নব রঙ্গালয়ের শুভ কামনা করে বলুন শুভ হোক, শুভ হোক, শুভ হোক।"

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি শিশিরকুমারের সঙ্গে রঙমহলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। আগস্ট মাসে তাঁকে নাট্যনিকেতন মঞ্চে সম্মিলিত অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেল। 'চন্দ্রশেখর' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করলেন আর 'প্রতাপ' সাজলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' নাটকে 'শিবাজী' এবং গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে দক্ষের ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

১লা এপ্রিল শিশিরকুমার পরিচালিত ও অভিনীত সবাক চিত্র শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' (নিউ থিয়েটার্স) 'চিত্রা' সিনেমাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সবাক চিত্রে শিশিরকুমারের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ।

২৮শে নভেম্বর দানীবাবু পরলোকগমন করলেন। তাঁর মৃত্যুতে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখলেন : "নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র, নটচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সর্বজনপরিচিত দানীবাবু পরলোকগমন করিয়াছেন। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বিভিন্ন নাটকের নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া তিনি যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা খুব কম নটের ভাগ্যেই হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর তিনি রঙ্গমঞ্চের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই স্বদেশী যুগে যখন জাতীয়ভাবের দ্যোতনা রঙ্গমঞ্চে প্রভাব

বিস্তার করিয়াছিল এবং গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল প্রভৃতির নাটকের ভিতর দিয়া নবযুগের নবভাব শতধারায় প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময়ে দানীবাবু তাঁহার খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয়ে ছিল পৈত্রিক আভিজাত্য।"

২৫ ডিসেম্বর 'নাট্যনিকেতন'-এ নতুন নাটক খোলা হল—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত-রচিত 'মহাপ্রস্থান'।

ভূমিকালিপি :—শ্রীকৃষ্ণ—শিশিরকুমার, অর্জুন—শৈলেন চৌধুরী, বসুদেব—যোগেশ চৌধুরী, জরাসন্ধ—ভূমেন রায়, গান্ধারী ও রুক্মিণী—কঙ্কাবতী, লক্ষণা—নীহারবালা, মায়াবতী—শেফালিকা (পুতুল)।

'শ্রীকৃষ্ণ'র ভূমিকায় শিশিরকুমারের অনুপম অভিনয় সম্পর্কে প্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন : "কীন ওথেলোর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে প্রথমে যেমন সন্দেহ জেগেছিল, ঐ চরিত্রে তাঁকে মানাবে কিনা, মহাপ্রস্থান নাটকে শিশিরকুমার শ্রীকৃষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন শুনেও দর্শকচিত্ত ওই রকম সংশয়াকুল হয়েছিল। দু-একখানি পত্রপত্রিকা এ নিয়ে বক্রোক্তি করতেও কসুর করে নি। কিন্তু অভিনয়-রাত্রে সকলের সকল সন্দেহ ও আশঙ্কা অপনোদন করে শিশিরকুমার প্রমাণ করেছিলেন, যে-কোনও ভূমিকাভিনয়ে তিনি অপরাজেয়। আমার তখন ছাত্রজীবন। থিয়েটার সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসুক ছিলুম, নাটক উদ্বোধনের পূর্বে অপপ্রচারও কিছু কিছু কানে এসেছিল। কিন্তু অভিনয় দেখতে বসে মনে হল দেহ যেন পশ্চাৎ-পটে মিলিয়ে গেছে। বায়রণ বর্ণিত সেই জাগ্রত আত্মাকেই সামনে দেখতে পাচ্ছি। মায়াময় কণ্ঠের অনুপম বাচনভঙ্গীতে সারা প্রেক্ষাগার সম্মোহিত, অশ্রু ছলছল চোখে সবাই দেখতে থাকে—দ্বাপরের পরম পুরুষ ভূভার হরণ মানসে প্রাণপ্রিয় পুত্র, পৌত্রসহ সারা যদুবংশ ধ্বংস করে নিজেও কেমন করে মহাপ্রস্থান করেন।"

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

স্টার মঞ্চে শিশিরকুমার 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় কেদার, 'রমা' নাটকে গোবিন্দ গাঙ্গুলী এবং মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া' নাটকে বক্তিয়ার ও ঘাতকের ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

'ঘাতক'-এর ভূমিকায় তাঁর ব্যক্তিত্ব-নিমজ্জিত অভিনয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী লিখেছেন : "...আরও দু'একটি চরিত্রের

উল্লেখ করা যায় যার অভিনয়ে শিশিরকুমারের কোনো ব্যক্তিত্বই প্রকাশ পায় নাই। তন্মধ্যে 'রিজিয়া' নাটকের 'ঘাতক' চরিত্রটির কথা আমি সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে চাই। ঐ অতি ক্ষুদ্র এবং স্বল্প সংলাপ-সম্বলিত ভূমিকাটির অভিনয় দেখিতে দেখিতে স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইতে হয়। ঘাতকের ভীত ত্রস্ত দৃষ্টি, স্খলিত বাক্য শিশিরকুমারের সকল ম্যানারিজম্‌কেই সেখানে আচ্ছন্ন-আবৃত করিয়া রাখে।"

'ঘাতক' সম্পর্কে শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের মন্তব্যটিও অনুরূপ। তিনি লিখেছেন: "কীন্ অভিনীত 'স্যর গিল্‌স্' চরিত্র যে ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, স্মরণ করুন শিশিরকুমার অভিনীত 'দিগ্বিজয়ী'র নাদির শা, 'রিজিয়া' নাটকের ক্ষুদ্র ঘাতকের ভূমিকা। যাঁরা এই অভিনয় দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে একজনও কি আছেন যিনি বলতে পারেন একটিবারও আত্মবিস্মৃত হয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠেন নি?"

এই বছরে জুন মাসের মাঝামাঝি আর্ট থিয়েটার লিকুইডেসনে চলে গেল। স্টার মঞ্চ খালি। হাইকোর্ট কর্তৃক রিসিভার রূপে নিযুক্ত হলেন শিশিরকুমারের সহপাঠী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কান্তিবাবুর সহায়তায় শিশিরকুমার স্টার থিয়েটারের লীজ পেলেন। থিয়েটার বাড়ির অবস্থা জীর্ণ। অর্থাভাবে গৃহটিকে ভালো করে সংস্কার করা গেল না। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু শিশিরকুমারকে ঋণস্বরূপ কিছু অর্থ সাহায্য করলেন বটে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা স্বল্প। এই জীর্ণ ভগ্নাবস্থ থিয়েটার বাড়িতেই শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর 'নব নাট্যমন্দির'।

তেত্রিশ

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

১৯শে জানুয়ারী 'নব নাট্যমন্দির'-এর দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল যদুনাথ খাস্তগীর রচিত 'অভিমানিনী' নাটক দিয়ে। রাজা বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকায় শিশিরকুমার অবতীর্ণ হলেন। নাটকখানি চলে নি।

ফেব্রুয়ারী মাসে কবি নরেন্দ্র দেব রচিত শিশুনাট্য 'ফুলের আয়না' মঞ্চস্থ করলেন। আমাদের দেশে শিশিরকুমারই প্রথম সাধারণ মঞ্চে শিশুদের জন্য নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন।

১৫ই মে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান হল। তাঁর মৃত্যুতে 'নাচঘর' পত্রিকা লিখলেন : "নানা কারণে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অপরেশচন্দ্রের নাম অমর হয়ে থাকবে। নানা কারণে বাংলা নাট্যজগতে তাঁর সমকক্ষ আর কারুর নাম আমাদের মনে পড়ছে না। একে একে সেই কারণগুলির কথা বলব।

"অপরেশচন্দ্র ছিলেন বাংলা নাট্যজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নাট্যকার। ষোল বৎসর আগে অপরেশচন্দ্র স্টার থিয়েটারে অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেই সময় থেকে গত বৎসর পর্যন্ত স্টারের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল তাঁরই লেখনী। ...তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ভিতরে অপরেশচন্দ্রের শক্তি ঐ নাটকগুলিকে সফল করে আমাদের নাট্যজগতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেছিল :—'অযোধ্যার বেগম', 'কর্ণার্জুন', 'ইরাণের রাণী', 'চণ্ডীদাস', 'মন্ত্রশক্তি', 'পোষ্যপুত্র' ও 'মা'।...

"অভিনেতারূপেও অপরেশচন্দ্র বাংলা নাট্যজগতে একটি বিশিষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছেন। অভিনেতারূপে বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিন যুগেরও বেশী। এবং এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় হাস্য ও করুণরস সৃষ্টিতে তিনি যে বিচিত্র শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন তা অপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না। অভিনয়শিক্ষায় তাঁর প্রধান গুরু ছিলেন স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর। তাঁর মতন শিষ্য পাওয়া যে কোন গুরুর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। এবং ধরতে গেলে অর্ধেন্দুশেখরের ছাত্রদের মধ্যে প্রধান আসনের দাবি করতে পারেন একমাত্র অপরেশচন্দ্রই।...উচ্চশ্রেণীর কলাবিদের উপরে যুগধর্মের পরিবর্তন বিশেষ কাজ করতে পারে না। সেখানে প্রবীণ কলাবিদ প্রাচীন হলেও নবীনরূপে বিচরণ করেন। গিরিশ-অর্ধেন্দুর যুগে যে অভিনয় ভঙ্গি ছিল এখন আর তা নেই, একথা সকলেই জানে। কিন্তু নবযুগের নূতন ভঙ্গি ধাতস্থ করতে না পেরে গতযুগের অনেক বড় অভিনেতাও ক্রমেই এখন পিছিয়ে পড়ছেন। এ-দলের ভিতরে অপরেশচন্দ্রকে আমরা দেখতে পাই নি কোনোদিনই। গতযুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে অপরেশচন্দ্র 'সীতারাম', 'শঙ্কর', 'কিশোর', 'মালজী', 'হীরু ঘোষাল', ও 'ইয়াগো' প্রভৃতি ভূমিকায় প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর পাশে যে-সব বিখ্যাত সহ-অভিনেতা ছিলেন বিশ্বনাট্যশালায় আজও তাঁদের

অনেকেই বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু রঙ্গালয়ে আর্টের আসরে আজ আর তাঁদের মধ্যে জীবনের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নবযুগের শক্তিধর অভিনেতাদের মধ্যে তাঁদের দেখলে মনে হয় দলভ্রষ্ট জীব বলে। কিন্তু অপরেশচন্দ্র সম্বন্ধে এমন অভিযোগ করার উপায় নেই। এই সেদিনও তিনকড়ি চক্রবর্তী, শিশিরকুমার, রাধিকানন্দ, অহীন্দ্র চৌধুরীর মতন শক্তিমান অভিনেতাদের মাঝে বৃদ্ধবয়সে ব্যাধি-জীর্ণ দেহে দাঁড়িয়েও রসিকের ভূমিকায় তিনি যে অতুলনীয় নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশ করে গিয়েছেন, তার অনুপম স্মৃতি কেউ কোনদিন ভুলবে না। নবযুগের প্রধান পুরোহিত স্বয়ং শিশিরকুমার পর্যন্ত রসিকের ভূমিকায় অপরেশচন্দ্রের গৌরব এতটুকু ম্লান করতে পারেন নি। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই, গতযুগের অন্যান্য অনেক অভিনেতাদের মতন তিনিও 'মেলোড্রামাটিক' বা কৃত্রিম অতি-অভিনয় ভঙ্গীকে অবলম্বন করেন নি। সাধারণতঃ সহজ স্বরে ও স্বাভাবিকভাবে তিনি অভিনয় করতেন এবং তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কণ্ঠস্বর। এমন গম্ভীর অথচ মধুর গীতিপূর্ণ স্বর খুব অল্প অভিনেতার কণ্ঠেই শ্রবণ করেছি। হায়, সেই মোহনীয় কণ্ঠস্বর আজ চিতাভস্মে পরিণত, তার কলধ্বনি আর কেউ শুনবে না।...

"অভিনয়-শিক্ষক-রূপেও অপরেশচন্দ্রের অদ্ভুত শক্তির সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত আছি। তাঁর হাতে নূতন ও পুরাতন যুগের অনেক নট-নটীই তৈরী ও মানুষ হয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদান-পদ্ধতির এক বিশেষত্ব ছিল এই, প্রত্যেককেই তিনি প্রত্যেকের মতন করে শেখাতে পারতেন, নিজের ভঙ্গীকে (এখনকার অধিকাংশ অভিনয়-শিক্ষক যা করে থাকেন) কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না। যার কোন গুণই নেই, সেও তাঁর শিক্ষার গুণে চলনসই হয়ে এসে রঙ্গমঞ্চের উপর দেখা দিতে পারত।

"তারপর আসে তাঁর অধ্যক্ষতার কথা। নিজের নটজীবনের অধিকাংশ ভাগই তিনি অধ্যক্ষতা করে কাটিয়ে গেছেন। আগেকার গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর থেকে এখনকার শিশিরকুমার পর্যন্ত বাংলার সকল শ্রেণীর নট-নটীই কোন-না-কোন সময়ে তাঁর অধ্যক্ষতা স্বীকার করেছেন। এর মধ্যে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ বাংলার নাট্যজগতের এমন সব মহারথ নিয়ে সুচারুভাবে অধ্যক্ষতার কর্তব্য পালন করা ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেবল অধ্যক্ষরূপেই বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। কোন্ সময়ে কেমনভাবে কাজ চালালে

রঙ্গালয়ের উন্নতি হয়, এ জ্ঞান তাঁর যথেষ্টই ছিল, 'কর্ণার্জুন' অভিনয় কালে 'স্টারের' পতাকার তলায় নব নব অভিনেতাকে আহ্বান করে তিনি তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়ে গেছেন।"

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'বিরাজ বৌ'-কে নাটকে রূপান্তরিত করলেন স্বয়ং শিশিরকুমার। ২৮শে জুলাই মঞ্চস্থ হল 'বিরাজ বৌ'। ভূমিকালিপি :—নীলাম্বর—শিশিরকুমার, পীতাম্বর—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজেন—শৈলেন চৌধুরী, ভুলু মুখুজ্যে—ইন্দ্র চক্রবর্তী, গাজন সন্ন্যাসী—শান্তশীল গোস্বামী, নিতাই গাঙ্গুলী—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরাজ—কঙ্কাবতী, মোহিনী—রাণীবালা, সুন্দরী—রাধারাণী।

শিশিরকুমারের 'নীলাম্বর' চরিত্রাভিনয় প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "যাঁহারা শিশিরকুমারের আলমগীর, রামচন্দ্র, চাণক্য প্রভৃতি দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বিরাজ বৌ-এ নীলাম্বরের ভূমিকায় শিশিরকুমারকে দেখিয়া থ' হইয়া গেলেন। কোথায় আলমগীর, কোথায় চাণক্য, আর কোথায় এই একটা পল্লীবাসী আকাট মূর্খ গাঁজাখোর নীলাম্বর। ইহাকেই তো বলে প্রতিভা। সর্বত্রই প্রতিভার অবারিত দ্বার। সম্রাট-প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুঁড়েঘর, সামাজ্য প্রতিষ্ঠাতা কূটবুদ্ধি বর্ষীয়ান নীতিবিদের মস্তিষ্ক হইতে নিরক্ষর গ্রাম্য নিঃস্ব কৃষকের মন, সমস্তই যে তাহার নখদর্পণে।"

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক 'শিলালি'র মন্তব্যটিও ('রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে'—সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৯/১২/৬৬) স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন: "অদ্ভুত সংযমপূর্ণ অভিনয় করেছিলেন নীলাম্বররূপী শিশিরকুমার। কঙ্কাবতীর বিরাজ চরিত্র রূপায়ণও নিখুঁত হয়েছিল। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, The greatness of art lies in concealing art—এ কথার যথার্থতাই যেন প্রমাণ করে দিয়েছিলেন নাট্যাচার্য তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। অভিনয় করছেন বোঝাই যাচ্ছিল না—অথচ সত্যিকার শিল্পরসিক উপলব্ধি করতে পারছিল অভিনয়কলার কতটা পারদর্শিতা ছিল এ অভিনয়ের পেছনে।

"শিশিরকুমার এবং কঙ্কাবতীর অভিনয়ে এ নাটকের পেইথস যে কতটা রসঘন হয়ে উঠেছিল তা ঠিক বলে বোঝানো যায় না।"

২৭শে সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন নাটক 'সরমা' অভিনীত হল। ভূমিকালিপি :—রাবণ—শিশিরকুমার, রাম—বিশ্বনাথ, বিভীষণ—

শৈলেন চৌধুরী, তরণীসেন—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দোদরী—কঙ্কাবতী, সীতা—প্রভা, সরমা—রাণীবালা, ত্রিজটা—রাধারাণী।

৭ই নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে 'রডা' চরিত্রটির নূতন রূপ দেখালেন। এর আগে প্রতাপাদিত্যের ভূমিকাতেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। 'রডা' প্রসঙ্গে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার' নামক প্রবন্ধে শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "আর একবার নবনাট্য-মন্দিরে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য অভিনীত হচ্ছে। এ অভিনয়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নাট্যাচার্য রডার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ক্ষীরোদ-প্রসাদের নাটকে রডার সংলাপ হিন্দিতে। কিন্তু নাট্যাচার্য কয়েকদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ঘোরাঘুরি করে প্রচুর বই সংগ্রহ করে পড়ে নিলেন। নব-নাট্যমন্দিরের প্রধান কর্মী এবং সুহৃদ ৺সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় একদিন বল্লেন—করবে তো রডা? তা এত কি পড়া-শুনা করছ?

"উত্তরে নাট্যাচার্য বল্লেন—'এখনও তোমরা বালক। অভিনয়ের দিন বুঝতে পারবে।'

"যথাসময়ে প্রতাপাদিত্য আরম্ভ হল। দেখা গেল রডা হিন্দি না বলে চাটগেঁয়ে ভাষায় কথা বলছে। অভিনয় চলার পর ২/১টি দৃশ্যের পর প্রেক্ষাগৃহ থেকে কয়েকজন মন্তব্য করলেন—রডা আবার চাটগেঁয়ে ভাষা শিখল কবে? কথাটা নাট্যাচার্যের কানে গেল। যবনিকা পড়ল। একটা সাদা চাদরে রূপসজ্জা ঢেকে হাতে কয়েকখানি বই নিয়ে দর্শকদের সামনে এগিয়ে এলেন। পিছনে তাঁর থিয়েটারের ভৃত্য ভিখা—হাতে মানচিত্র।

—'আপনাদের ভিতর কে বললেন, রডা চাটগেঁয়ে ভাষা শিখল কবে?'

"কিন্তু কেউ আর উঠে দাঁড়িয়ে নাট্যাচার্যের ব্যক্তিত্বের সামনে আসতে ভরসা পেলেন না।

"তখন নাট্যাচার্য বললেন, 'দেখুন রডা আসে পর্তুগীজদের হয়ে এবং ধরা পড়ে চাটগাঁয়ের দিকে। তখন ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছিল না এবং রডা দিল্লী আগ্রাও যায় নি। ইংরেজের রাজধানী দিল্লী—তাই তাদের সংস্রবে এসে হিন্দি বলা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে রডার তার অবকাশ ছিল না। বরঞ্চ তার পূর্ববঙ্গীয় ভাষাতে কথা বলাই স্বাভাবিক। এই দেখুন ঐতিহাসিক কি বলেছেন'—বলে তিনি অনেকগুলি বই থেকে পড়ে বোঝাতে লাগলেন যে,

রতা চাটগেঁয়ে ভাষাতেই কথা বলছে। তারপর ম্যাপ দেখে বুঝিয়ে দিলেন কোন পথ দিয়ে জলপথে আসে।

"শেষ পর্যন্ত দর্শকরা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন হাততালি দিয়ে। কিন্তু যখন তিনি চলে যাচ্ছেন—কয়েকজন মন্তব্য করলেন টিটকিরি কেটে—রিমার্কসগুলো ওভারলুক করেন না কেন? এটা তো ক্লাসরুম নয়।

"তখন নাট্যাচার্য উত্তেজিত হলেন এবং ফেটে পড়লেন—'ওভারলুক করতে পারি না আপনাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা দেখে। আপনারা আসেন নাচ দেখতে। তাই আমাকে ক্লাস করতে হয়—শিক্ষা দিতে হয়।' "

২৪শে নভেম্বর শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'দশের দাবী' অভিনীত হল। ভূমিকালিপি :—দয়াল—শিশিরকুমার, নিশানাথ—বিশ্বনাথ, প্রফুল্ল—শৈলেন চৌধুরী, সর্দার—শীতল পাল, মহিম—কনকেন্দ্রনারায়ণ রায়, সুজাতা—কঙ্কাবতী, নলিনী—প্রভা।

২৪শে ডিসেম্বর শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিজয়া' মঞ্চস্থ হল। বিজ্ঞাপন দেওয়া হল এই ভাবে : "মঙ্গলঘট স্থাপিত। অভিনেতৃগণ শুদ্ধচিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে বিজয়ার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সাফল্য সুনিশ্চিত।"

ভূমিকালিপি :—রাসবিহারী—শিশিরকুমার, নরেন—বিশ্বনাথ, বিলাস—শৈলেন চৌধুরী, দয়াল—শীতল পাল, পরেশ—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়া—কঙ্কাবতী, নলিনী—রাণীবালা। নরেনের ভূমিকাতেও শিশিরকুমার অভিনয় করেছিলেন।

শিশিরকুমারের 'রাসবিহারী' চরিত্রাভিনয় সম্পর্কে 'নাচঘর' পত্রিকার মন্তব্য : "ঘটনা ও অবস্থাভেদে তাঁর চাহনি ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন এবং মধ্যে মধ্যে শ্মশ্রুতে হস্ত-সঞ্চালন ভণ্ড, কূটবুদ্ধি প্রতাপশালী ব্যক্তিটিকে দর্শকদের চোখের সামনে এমন পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়িয়ে দেয় যে, সমস্ত প্রেক্ষাগার শিশিরকুমারের অভিনয়কে সারাক্ষণ ধরে রীতিমত উপভোগ করে। তাঁর কথা বলবার ধরণ, বিলাসের প্রতি কপট দৃষ্টিনিক্ষেপ, মঙ্গলময়ের উদ্দেশ্যে প্রণামের ভাণ, দর্শকমহলে হাসির হররা ছুটিয়ে দেয়। রূপসজ্জারও প্রশংসা করি।"

অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন শিশিরকুমারের রূপায়ণে শরৎচন্দ্রের 'রাসবিহারী'র রূপটি ফুটে ওঠে নি। এঁদের মধ্যে স্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হেমেন্দ্রনাথের মন্তব্য: 'অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়। রাসবিহারীও ভাল, তবে ইনি শরৎবাবুর রাসবিহারী নহেন।' শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য: 'শুধু 'বিজয়া'তে তাঁর রাসবিহারী আমাদের ম্লান করে দিলে ; আমরা বইতে যার কথা পড়েছিলাম সে ব্যক্তি এক গৃধ্নু, কপট ও চক্রান্তকারী ব্রাহ্ম, আর রঙ্গমঞ্চে যাকে দেখলাম সে এক প্রহসনের স্থূল বিদূষক।'

কিন্তু স্বর্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের মত খণ্ডন করেছেন। তাঁর অভিমতটি উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি লিখেছেন: "রাসবিহারীকে কেহ কেহ অতিমাত্রায় স্থূল বলিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং চরিত্রের এবংবিধ রূপায়ণে শিশিরের অভিনয়-শক্তির আপেক্ষিক অভাবই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু হয়ত তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে তাহার বাহিরের মার্জিত রুচি ও সংস্কৃতি ধর্মবোধের নীচে তাহার এই স্থূলতা দেখানই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে ব্রাহ্মধর্মের নামে যতই সূক্ষ্ম ধর্মবোধ ও রুচি-বৈদগ্ধ্যের ভান করুক না কেন আসলে সে একজন অর্ধ-শিক্ষিত, গ্রাম্য পাটোয়ারির পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি। তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাহিরের আচরণের সমস্ত ভব্যতা ও ধোলাই-করা শুভ্রতার পিছন হইতে বর্বরত্বের কালিমা উঁকি মারিতেছে। দয়ালের প্রতি তাহার আচরণ, এমন কি বিলাসের প্রতি তাহার রূঢ় ভর্ৎসনাবাক্য ও নিজ জাতি সম্বন্ধে হীনম্মন্যতা—সে তো এই স্থূলত্বেরই পরিচয়। ভণ্ড মাত্রেই স্থূল; পেক্‌সনিভ, টারটাফ প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের আদর্শস্থানীয় ভণ্ড বাহ্যবুদ্ধিমত্তা ও কৌশলময়তার অন্তরালে এই প্রকৃতিগত ইতরতাকেই প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। এই গোপন সংরক্ষিত ইতরতার বহিঃপ্রকাশই হাস্যরস-সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। যদি কেহ অজ্ঞাতসারে ভণ্ডামি ও আত্মশ্রেষ্ঠ বোধের অভিমান পোষণ করে—যেমন মেরিডিথের ইগোইস্ট উপন্যাসে স্যার উইলেবি প্যাটার্ণ—তবে সেইরূপ চরিত্র আমাদের সমবেদনার উদ্রেক করিতে পারে ও তাহার চরিত্রে খানিকটা গৌরব লগ্ন হইয়া থাকে। শিশির তাহার অভিনয়ে এই স্থূলতাকেই সূক্ষ্মভাবে প্রকট করিয়াছে। হয়ত কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি না জানি না—তাহার চেয়ারে বসবার ভঙ্গী, তাহার দুগ্ধ-শুভ্র পরিচ্ছদের মাঝেমধ্যে যেন বিস্মৃতিবশে হাঁটুর উপরে উঠিবার অশালীন প্রবণতা—এই জাতীয় দুই একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে শিশির এই চরিত্রটির প্রকৃত রূপ ফুটাইয়াছে।"

'বিজয়া' নাটকের সামগ্রিক অভিনয় সম্পর্কে 'শিলালি'র মন্তব্যটি ('রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে'—সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৯৷১২৷৬৬) পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন: "রাসবিহারী হিসাবে শিশিরকুমার অদ্ভুত ভাবে নিজেকে প্রজেক্ট করতেন দর্শকদের মাঝে। এর ফলে অভিনেতা এবং দর্শকদের ভেতর যে একটা পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান হতো তার তুলনা হয় না। অর্থাৎ শিশিরকুমার নিজের চিন্তাধারাকে ইনসুলেটেড করে রাখতেন না—তাকে দর্শকদের মনে সঞ্চালিত করতেন।

"অভিনয়ের সময়ে তাঁর ভাব অনুভূতি ইত্যাদি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভসের মত ট্রান্সমিটেড হয়ে যেত দর্শকদের ভেতর। অভিনয়ের সময় এই ধরনের ভাব এবং অনুভূতির প্রক্ষেপণ করবার ক্ষমতা আমাদের দেশে এক শিশিরকুমারের ভেতরই ছিল। স্যার হেনরি আরভিংও নাকি এই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই প্রক্ষেপণ করবার ক্ষমতা শিশিরকুমার বিশেষভাবে দেখিয়েছেন রাম, আলমগীর, জীবানন্দ, চাণক্য, সাজাহান, কর্ণ (নরনারায়ণ), রাসবিহারী, নরেন, রমেশ (রমা) প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয়ের সময়। অভিনয়-শিল্পের চরমমার্গে উঠতে না পারলে এ ক্ষমতা আসে না। বিশ্বনাথবাবু একবার এই স্তরে উঠতে পেরেছিলেন—শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাসে যখন তিনি নামভূমিকায় অভিনয় করেন। বিজয়ার নরেন চরিত্রটিও অত্যন্ত সু-অভিনীত হয়েছিল। নরেনের আত্মভোলা উদার ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয়ে। শৈলেন চৌধুরী বিলাসকে একটি প্রাণবন্ত চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন অভিনয়গুণে। কঙ্কাবতী বিজয়া চরিত্রের প্রত্যেকটি দিককে সুপরিস্ফুট করতে সমর্থ হয়েছিলেন।...পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বালক—এই নবাগত অভিনেতাটিকে দিয়ে শিশিরবাবু যেভাবে পরেশের পার্ট করিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। শিশিরকুমারের শিক্ষাকৌশলে পরেশের চোখে, মুখে, কথায়, বার্তায় যে একটা অদ্ভুত সারল্য ও ছেলেমানুষীর ভাব ফুটে উঠেছিল তা যাঁরা সে পার্ট না দেখেছেন তাঁদের ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না।"

পরেশের পার্ট সম্পর্কে 'নাচঘর' পত্রিকার মন্তব্য: "একেবারে যেন জ্যান্ত পরেশকে পল্লীগ্রাম থেকে ধরে এনে কলকাতার রঙ্গমঞ্চের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ।

২৮শে সেপ্টেম্বর খোলা হল 'শ্যামা'। বৌদ্ধজাতকের কাহিনী অবলম্বন করে নাটকটি রচনা করেন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। ভূমিকালিপি : চন্দনক ও উত্তীয়—শিশিরকুমার, বীর্যসেন—বিশ্বনাথ, শ্যামা—প্রভা।

১১ই ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হল জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত-নাটক'। জলধরবাবুর লিখিত মূল পাণ্ডুলিপির নাম ছিল 'রঙ্গমঞ্চ'। 'রীতিমত-নাটক' নামটি শিশিরকুমারের দেওয়া। প্রাচীর পত্রে নাট্যকার হিসাবে জলধরবাবুর সঙ্গে শিশিরকুমারের নামও বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। নাটকটিতে সন্নিবেশিত শিশিরকুমারের 'নিবেদন'টি উদ্ধৃত হল :—

"এই নাটকের আখ্যায়িকা জলধরবাবু আমার কাছে এনেছিলেন। আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারপর অভিনয়ার্থে যতকিছু পরিবর্তন করতে চেয়েছি—অসীম ধৈর্যসহকারে সে বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।

"এই নাটকের নাট্যকার হিসাবে নামটা যে আমার দেওয়া হয়েছে সে শুধু তাঁরই অনুরোধে। নতুবা, এই নাটকের মধ্যে যা-কিছু নাট্য—তা জলধরবাবুর নিজের আমার নয়। তবে আমি নিজের নাম এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছি কেন? তার কারণ, আমার মনে হয়েছে—আমি যদি নিজে এই নাটকটি রচনা করতে পারতাম, তাহলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম।"

ভূমিকালিপি :—প্রফেসর দিগম্বর—শিশিরকুমার, সুহৃৎ ডাক্তার—বিশ্বনাথ, দিব্যেন্দু—শৈলেন চৌধুরী, বসন্ত—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গণপতি—কার্তিক দে, রঞ্জন—সত্যেন্দ্র গোস্বামী, নবকৃষ্ণ—শান্তশীল গোস্বামী, মধুময়—মীরা, সুবেশ—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, যেদো—দীনেন্দ্রনাথ রায়, জনক—জীবেন বসু, বিশ্বামিত্র—জ্যোৎস্না মিত্র, স্বাগতা—প্রভা, শান্তা—রাণীবালা, সান্ত্বনা—বেলারাণী, সুলেখা—প্রতিভা।

রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের অভিনয় দেখে প্রীত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন : "গুণীদের মধ্যে যিনি গুণী সেই রবীন্দ্রনাথের তিনি স্নেহ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মঞ্চে তাঁর নিজের লেখা অনেকগুলি নাটকের অভিনয় দেখেছেন, কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু শিশিরকুমারের প্রতি তাঁর একটু বিশেষ দরদ ছিল। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। শিশিরবাবুর রঙ্গালয়ে রীতিমত নাটকের অভিনয় হচ্ছে, শিশিরবাবু একদিন রবীন্দ্র-

নাথকে ওই নাটক দেখবার জন্য অনুরোধ করতে এলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্মত হলেন। শিশিরবাবু চলে যাবার পরে ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন, অপরের লেখা নাটক আপনি দেখতে যাবেন কেন ? রবীন্দ্রনাথ বললেন, না গেলে শিশির বড় দুঃখ পাবে। বিকেলে শিশিরবাবু নিতে এলেন, তিনি তাঁর সঙ্গে ওই নাটকের অভিনয় দেখতে চলে গেলেন…।"

(যুগান্তর, ৩রা অক্টোবর, ১৯৫০)

'দিগম্বর' চরিত্রাভিনয় শিশির-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে 'শিলালি' লিখেছেন: "দিগম্বরের ভূমিকায় শিশিরবাবুর অভিনয়ে যে বাবলিং পারসন্যালিটির (ক্রেগের মতে অভিনেতার শ্রেষ্ঠ গুণ) পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চে তা পূর্বে বা পরে কখনও দেখা যায় নি। অধ্যাপক শিশিরকুমারের পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্ব প্রতিক্ষণে মঞ্চ থেকে প্রজেক্টেড হত অডিটোরিয়ামে এই নাটকের অভিনয়ের সময়। শেষদৃশ্যে হাসিকান্না মেশানো যে ভাবের অভিব্যক্তি শিশিরকুমার দেখিয়েছিলেন তা শুধুমাত্র চার্লি চ্যাপলিনই করেছেন ছায়াছবিতে। সুহৃদ ডাক্তাররূপী বিশ্বনাথবাবুর অভিনয়ও হয়েছিল চমৎকার। ছবিতে যখন এ নাটকটি রূপায়িত হয় তখন অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এ চরিত্রের রূপায়ণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। শুনেছি রাধিকানন্দবাবু কয়েক রাত্রি সুহৃদ ডাক্তারের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। কঙ্কাবতীর স্বাগতা এবং শৈলেন চৌধুরীর দিব্যেন্দুও প্রশংসা অর্জন করেছিল। বাড়িওলা নবকৃষ্ণের ভূমিকায় শান্তশীল গোস্বামী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাণীবালার শান্তা হয়েছিল চলনসই। শীতলবাবুর দীননাথে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। আর চমৎকার অভিনয় করেছিলেন গণপতি গণের ভূমিকায় পূর্বযুগের বিখ্যাত অভিনেতা কার্তিকচন্দ্র দে।…স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। সে রাত্রের অভিনয়ের কথা এখনও আমার মনে আছে—'এই করেছ ভাল নিঠুর' কবিতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে শিশিরকুমার হঠাৎ লাইন ভুলে গিয়ে একটু থমকিয়ে যান—তারপরেই সামলে নেবার জন্য একের পর এক রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলেন—মনে হচ্ছিল কবিকে দর্শকের প্রথম সারিতে দেখে ইন্সপায়ারড হয়ে সেদিন কবির রচনা রিসাইট করেছিলেন।"

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।

২২শে অক্টোবর 'অচলা' মঞ্চস্থ হল। 'অচলা' শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ। স্বয়ং শিশিরকুমার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। এ নাটকে তিনি অভিনয় করেছিলেন দুটি ভূমিকায়—'সুরেশ' আর 'কেদার'।

২৬শে অক্টোবর 'চিত্রা' সিনেমা গৃহে নিউথিয়েটার্সের 'সীতা' মুক্তিলাভ করে। 'রাম' শিশিরকুমার ও 'সীতা' কঙ্কাবতী। এটি তাঁর পরিচালিত দ্বিতীয় সবাক ছবি।

২৪শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ হল। ভূমিকালিপি :— মধুসূদন ঘোষাল—শিশিরকুমার, বিপ্রদাস—শৈলেন চৌধুরী, নবীন—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদিনী—কঙ্কাবতী, শ্যামা—উষা (পটল), মতির মা—রাণীবালা।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের অভিনয় দেখে খুসী হয়ে লিখলেন : "নব নাট্যমন্দিরে যোগাযোগ দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন সুসম্পূর্ণকায় অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না—তৎসত্ত্বেও যদি শ্রোতাদের মনস্তুষ্টি না হয়ে থাকে তবে সে জন্যে নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ীকে দোষ দেওয়া যায় না।"

'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ 'কুমুদিনী'কে যখন আমাদের সামনে প্রথম আনলেন আমরা দেখলাম—'দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড…'

কঙ্কাবতী যখন 'কুমুদিনী' করেন তখন তিনি স্থূলাঙ্গিনী হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অদ্ভুত অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'তুমি যে মোটা তা একেবারে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলে।"

রবীন্দ্র-নাটকে নিজের অভিনয় প্রসঙ্গে শ্রীপরিমল গোস্বামীকে শিশিরকুমার উত্তরকালে বলেছিলেন "রবীন্দ্রনাথের যেসব নাটক অভিনয় করেছি, তার প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করেও আনন্দ পেয়েছি, সে আনন্দ একেবারে আমার সকল স্নায়ুর আনন্দ। তাঁর নাটক আমি তাঁর চেয়ে ভাল অভিনয় করেছি, এ আমি গর্ব করে বলতে পারি।"

শিশিরকুমারের আবৃত্তির কয়েকটি রেকর্ড আছে। রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা রেকর্ডিং করা আছে—একটি 'রাত্রে ও প্রভাতে', অপরটি 'আশা'। 'আশা' কবিতার একটি ছত্রে আছে—'গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া'—শিশিরকুমার

কিন্তু আবৃত্তি করেছেন—'তরুটির স্নিগ্ধ ছায়া।' 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'আলমগীর' নাটক দুটিও রেকর্ডিং করা আছে। শেষোক্ত নাটকটি নয় খণ্ডে রেকর্ডিং করেছিলেন মেগাফোন কোম্পানী—রেকর্ড নং J. N. G. 5719—J. N. G. 5727। সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমান লেখকের কাছে এই সেটটি আছে।

'যোগাযোগ'-এর পর নবনাট্যমন্দিরে আর কোন নূতন নাটক মঞ্চস্থ হয় নি।

'নাট্যমন্দির' ও 'নবনাট্যমন্দির' পর্যায়ে শিশিরকুমার আরও কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেগুলির তালিকা :—

'জনা' নাটকে 'নীলধ্বজ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে 'কীচক' আর 'বৃহন্নলা', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তার মুক্তি' গীতিনাট্যে 'রতনচাঁদ', 'ভ্রমর' নাটকে 'গোবিন্দলাল', বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'হাস নো হানা' নাটকে 'রুদ্রগিরি', অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকে 'মিঃ সিং', 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে 'ভীম' ও 'ভীষ্ম', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ' নাটকে 'অর্জুন' আর 'ভীষ্ম' নাটকে 'ভীষ্ম', 'বলিদান' নাটকে 'দুলালচাঁদ', 'রমা' নাটকে 'বেনী ঘোষাল', গিরিশচন্দ্রের 'অশোক' নাটকে নামভূমিকা ও 'চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে' প্রহসনে 'বাঁড়ুয্যে'।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী 'শ্রী' চিত্রগৃহে কালী ফিল্মসের 'দস্তুরমত টকী' মুক্তিলাভ করে। শিশিরকুমার ছবিখানি পরিচালনা করেন ও 'দিগম্বর' চরিত্রে অভিনয় করেন। 'স্বাগতা'র ভূমিকায় কঙ্কাবতী, 'শান্তা'র ভূমিকায় রাণীবালা, 'দিব্যেন্দু'র ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, 'বসন্ত'র ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী আর 'সুহৃৎডাক্তার' এর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয় করেছিলেন।

এর পর স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে শিশিরকুমারের মামলা-মোকদ্দমা আরম্ভ হল। তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ ফেঁসে যায় কিন্তু উচ্ছেদের মোকদ্দমায় বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস নাগাদ নবনাট্যমন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। শিশিরকুমার দ্বিতীয়বার মঞ্চহারা হলেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'যবনিকার অন্তরালে' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন : "...তাঁর জীবনের ব্যর্থতার মূলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, এই নিজস্ব রঙ্গমঞ্চের অভাব। শুধু তাঁর নয়, সে সময়কার বহু নাট্য-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার মূলে আছে এই অভাব।

যে থিয়েটারে তিনি অভিনয় করছেন, সে থিয়েটার-বাড়ির মালিক যিনি, তিনি মাসে মাসে ঠিক ভাড়া না পেলে, সে রঙ্গমঞ্চে তাঁকে তিনি অভিনয় করতে দিতে পারেন না। এবং থিয়েটার-বাড়ির যে ভাড়া তখন ছিল, তা এত বেশী যে কোন একখানা বই ভাল না চললেই থিয়েটার-বাড়ির ভাড়া আর উঠত না। সেইজন্যেই আমরা দেখতে পাই, এক একটি রঙ্গমঞ্চে কিছুদিন এক সম্প্রদায় অভিনয় করেছেন কয়েক মাস। পরেই সেখানে আর এক সম্প্রদায় এসে উপস্থিত। এবং নাট্য-শিল্প এমন একটা জিনিস যার জন্যে একটা রঙ্গমঞ্চ চাই, একটা প্রেক্ষাগৃহ চাই, প্রেক্ষাগৃহে আসন ও আলো চাই। শিশিরকুমার প্রথম ইডেন গার্ডেনে তাঁবু ফেলে পেশাদারী থিয়েটারের সূচনা করেন, তার পর থেকে বেদেদের মতন এক তাঁবু থেকে আর এক তাঁবুতেই তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। যে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা অভিনয় করেন, কিছুদিন সেখানে নিয়মিত অভিনয় করার ফলে সেই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর মনের একটা সাইকিক যোগ হয়ে যায়, অকস্মাৎ যদি সেই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যেতে হয় অভিনেতার মনে প্রিয়-বিচ্ছেদ ব্যথা জাগে। তার ওপর, এক রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে অন্য রঙ্গমঞ্চে যাওয়া শুধু স্থানান্তরে যাওয়ার ব্যাপার ছিল না, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার পেছনে থাকত আদালত, নালিশ, অপমান। থিয়েটার-বাড়ির মালিক আর সেই থিয়েটারের ভাড়াটে প্রযোজকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত এবং এই দ্বন্দ্বের শেষে ভাড়াটে প্রযোজককেই হারতে হত। টাকা না পাওয়ার রাগটা বাড়িওলা নিদারুণ অপমানে মেটাতে চেষ্টা করতেন। কোন্ সময়ে কিভাবে ভাড়াটে প্রযোজককে তাঁর বাড়ি থেকে হটাতে পারলে এই রাগের জ্বালা মিটবে, তা তাঁরা ভেবেচিন্তে সুকৌশলে নির্ধারণ করতেন। বলাবাহুল্য পুলিসের লোকের সাহায্যেই বিতাড়ন পর্ব পরিচালিত হত। '—' রঙ্গমঞ্চ থেকে যেদিন শিশিরকুমারকে চলে আসতে হয়, সেদিনকার দৃশ্য চোখের ওপর ভাসছে। ঘুম থেকে উঠে সকালবেলাই দেখলেন, বাড়িওলার লোক তাঁর জিনিস-পত্র সমস্ত বাইরে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। গায়ে জামাটা দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে শিশিরকুমার রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। তখন রাস্তা দিয়ে কাতারে কাতারে লোক চলেছে, তাঁর ভক্তের দল, ট্রাম-বাস থেকে তাঁরা উঁকি মেরে দেখেন, পায়ে হেঁটে যাঁরা চলছিলেন তাঁরা কাছে এসে ঘিরে দাঁড়ান। কোন কোন রসিক লোক মন্তব্য করে ওঠেন। বাধ্য হয়ে শিশিরকুমারকে সেখান থেকে সরে যেতে

হয়। এ-জাতীয় ঘটনার ব্যথা দেহের ভেতর হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকে। শিশিরকুমারের ছিল। তাই স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের আশা, তাঁর কাছে শুধু স্বপ্ন ছিল না, সেইটেই ছিল তাঁর অস্তিত্ব।"

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিশিরকুমারের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ ছিল না। সম্মিলিত অভিনয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে রঙ্গমঞ্চে দেখা যেত। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর 'উত্তরা' চিত্রগৃহে তাঁর পরিচালিত ও অভিনীত চতুর্থ চিত্র 'চাণক্য' মুক্তিলাভ করে। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। কঙ্কাবতী মুরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 'চাণক্য' ছবি তোলবার সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীমতী কঙ্কাবতী দেবী ও শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী—দুই সহোদরা। একজন ভারতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা মঞ্চাভিনেত্রী, অপরজন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী।

'নাট্যমন্দির' পর্বের শেষের দিকে ললিতকলার প্রিয়শিষ্যারূপে শ্রীমতী কঙ্কাবতীর আবির্ভাব ঘটে শিশিরকুমারের জীবনে। তিনি হলেন নটরাজের লীলাসঙ্গিনী। হলেন বধূ ও গৃহিণী। কিন্তু শিশিরকুমারের গৃহের আরাম কই? জীবনের উষালগ্নেই তাঁর গৃহ গেছে পুড়ে—প্রথমা স্ত্রীকে হারিয়ে। এই বিয়োগ-ব্যথাই তাঁর জীবনে এনে দিয়েছে অসঙ্গতি, উচ্ছৃঙ্খলতা, উদ্দামতা। সুরা হরণ করে নিচ্ছে তাঁর প্রাণশক্তি। শিশিরকুমারের জীবনের ট্র্যাজেডির মূল বোধ হয় এইখানেই। এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন: "বিবাহের স্বল্পকাল পরেই একটিমাত্র পুত্র রেখে প্রাণবন্তায় ভরপূর এই মহানটের জীবনের সংগিনী অমৃতলোকে চলে যান। তাঁকে হারিয়ে শিশিরকুমার তাঁর ইষ্ট স্বয়ং নটনাথের মতই যে সতীহারা হয়ে বিচলিত হন নি, এমন কথা কেমন করে বিশ্বাস করব? তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্দামতার মূলে কী ব্যথা ছিল, তা বাইরে থেকে দেখে কি বোঝবার উপায় ছিল? তাঁর আত্মাভিমান বড় প্রগাঢ় ছিল। তবুও স্টার থিয়েটারের খোলা ছাদে আলো আঁধারে বসে একটু একটু মদ্য পান করতে করতে তৃতীয় কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে এক এক রাতে, হয়তো তাঁর নিজেরও অজানায়, তাঁর হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা যক্ষ্মারোগীর রক্ত বমনের মত ঝলকে ঝলকে দু-চারবার বেরিয়ে পড়েছে, আমার মনে আছে।"

কঙ্কাবতী চেষ্টা করলেন নটরাজকে আত্মস্থ করতে। কিন্তু তাঁর সে

চেষ্টা ব্যর্থ হল। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা কঙ্কাবতী শিশিরকুমারের অনুজ বিশ্বনাথের কাছে বড় খেদ করে বলেছিলেন—তোমার দাদাকে মদ ছাড়াতে পারলাম না।

শিশিরকুমারের জীবনের ট্র্যাজেডির মূল কারণটি উত্তরকালে মর্মস্পর্শী ভাষায় আরও একজন ব্যক্ত করেছেন। তিনি স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন ঃ

"বাংলাদেশে একবার ঝড় আসে, সে-রকম দুরন্ত দীর্ঘ ঝড় বাংলার লিখিত ইতিহাসে আর কখন আসে নি।

ঝড়ের দুরন্ত দাপটে এক পলিমাটি উল্টে উড়ে গেল।

সে-ঝড় আসে ইংরেজের সঙ্গে। সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে সে-ঝড়ে উড়ে এল রেল ইঞ্জিন, টেলিগ্রাফের তার, মিল, বেন্থাম···

আর এল স্কচ হুইস্কি আর ইংরেজী সাহিত্য।

লাগাম-ছেঁড়া পাগলা ঘোড়ার মত সে-ঝড় কেশর ফুলিয়ে টগবগিয়ে মাঝরাস্তা দিয়ে ছুটল।

তার প্রচণ্ড গতিবেগে ছিল উন্মাদনার নেশা।

সেই নেশা পেয়ে বসল এক তরুণ বাঙালীকে। লাফিয়ে উঠে দুমুঠো দিয়ে তার ঘাড়ের কেশর চেপে ধরল। পাগলা ঝড়ে সওয়ার হল ক্ষ্যাপা বাঙালীর ছেলে।

ঝড়ে আর ঝড়ের সওয়ারীতে চলে সংগ্রাম।

ছিটকে পড়ে যায় সওয়ারী। ঝড় এগিয়ে চলে।

একশো বছর ধরে সমানে সে বয়ে চলে।

যে-কেউ তাকে সওয়ার করতে চেয়েছে, তাকেই সে আছড়ে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু প্রত্যেক দুরন্ত সওয়ারী নিজের অকাল মৃত্যু দিয়ে হরণ করেছে ঝড়ের শক্তিকে।

শেষ সওয়ারীকে আছড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে-ঝড়ও আজ নিস্তেজ হয়ে মিলিয়ে গেল।

আজকের বাংলায় আর সে-ঝড়ের চিহ্ন নেই।

সে-ঝড়ের প্রথম সওয়ারী যিনি ছিলেন, তাঁর নাম মাইকেল।

সে-ঝড়ের শেষ সওয়ারী যিনি, তাঁর নাম শিশিরকুমার।

এই দুটি নামের বেড়ার মধ্যে আছে এক প্রচণ্ড ঝড়ের সম্পূর্ণ ইতিহাস। মাইকেলে যার আরম্ভ, শিশিরকুমারে তার নিঃশেষ সমাপ্তি।

তাই মাইকেলকে শিশিরকুমার পরমাত্মীয়ের মতন ভালবাসতেন। একান্ত আপনার জন বলে চিনতেন।

জীবনের শেষ সৃজন-প্রয়াসে তাই মাইকেলকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত করে গেলেন। এটা তাঁর জীবনের অধিনায়ক ঝড়ের দেবতাকে তাঁর শেষ প্রণাম।...

মাইকেলের আবির্ভাবে যে-যুগের বৃত্ত গোল হয়ে ওঠে, শিশিরকুমারের তিরোধানে সে-বৃত্ত সম্পূর্ণ গোলাকার হয়ে গেল। একটা শতাব্দী সম্পূর্ণ হল।

বাংলার সবচেয়ে বিচিত্র শতাব্দীর শেষ প্রতিনিধি হলেন শিশিরকুমার।

বাংলার রঙ্গমঞ্চের নব-স্রষ্টা তিনি কিন্তু তাঁর জীবন বিগত শতাব্দীর। সে-শতাব্দী যেখানে থেমেছে, তাঁর মনও সেখানে থেমেছে। বিগত শতাব্দীর শেষ সীমারেখায় দাঁড়িয়ে, দেখেছি তাঁর প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাঁর শেষ জীবন এই নিঃসঙ্গ অন্তর্দ্বন্দ্বের এপিক ট্র্যাজেডী; এসকাইলাসের মতন নাট্যকারের বিষয়বস্তু।

শিশিরকুমার যখন শেষরক্ষা প্রযোজনা করেন তখন তাঁর মনে একটা তীব্র বাসনা জেগে ওঠে, দর্শক আর রঙ্গমঞ্চের মধ্যে যে-ব্যবধান, অভিনয়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবধান মুছে ফেলবেন...

অভিনয়ের মধ্যে এমন একটা জীবন্ত মুহূর্ত সৃষ্টি করবেন, যখন প্রেক্ষাগৃহ আর রঙ্গমঞ্চ এক হয়ে যাবে, দর্শকরা হয়ে উঠবেন অভিনয়ের মানসিক অংশীদার, অভিনেতা আর দর্শকে থাকবে না কোন ব্যবধান। বহু বার তিনি চেষ্টা করেছিলেন দর্শক আর অভিনেতাদের ব্যবধান দূর করে একটা দিব্য মুহূর্ত সৃষ্টি করতে।

জীবনেও চেয়েছিলেন অনুরূপ একটা বেদনাদায়ক ব্যবধানকে দূর করতে। সমাজ আর অভিনেতার জীবনের মাঝখানের ব্যবধান।

বিলেতে যে যুগে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জন্ম হয়, সেদিন ইংলণ্ডের সমাজ-নেতারা থিয়েটারকে শহর থেকে সরিয়ে বাইরে জায়গা করে দিয়েছিলেন। আমাদের দেশের পেশাদার থিয়েটার বাহ্যত শহরের ভেতর জায়গা পেলেও, দেশের লোকের মনে পেশাদার নটনটীর জায়গা সমাজের বাইরেই নির্দিষ্ট

ছিল। অসামাজিকতার অভিশাপ নিয়ে আমাদের নট-নটীদের মঞ্চ জীবনের সূচনা হয়। ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক তাঁর জীবনে চেয়েছিলেন সমাজ ও রঙ্গমঞ্চের এই মানসিক ব্যবধান দূর করতে।

তার জন্যে একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে, কঠোর সংকল্প করে এই মাঝখানের গর্ত ভরাট করবার কাজে ব্রতী হন। এই গর্ত ভরাট করে মাঝখানের ব্যবধান দূর করবার জন্যে যা যা উপকরণের দরকার, সবই তাঁর ছিল।

অর্ধেক গর্ত যখন ভরাট হয়ে এসেছে, তখন তাঁর ক্লান্ত কম্পিত কর থেকে হাতিয়ার পড়ে গেল। তিনি থেমে গেলেন।

কিন্তু যে-কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তার গতিবেগ তাঁকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চল্লো। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত পরবর্তীর দল তাঁর অসমাপ্ত দায়িত্বকেই আজ সম্পূর্ণ করতে চলেছে। কালশক্তি আজ পরবর্তীদের সহায়।

যে পাখী সারাদিন আকাশে বিহার করে, সন্ধ্যায় আকাশ থেকে ডানা গুটিয়ে ফেরবার জন্য তার নীড়ের একান্ত প্রয়োজন।

আকাশ বিরাট কিন্তু তাতে নীড় রচনার মতো এতটুকু জায়গা নেই। বহুলোকের মাঝখানে শিশিরকুমার ছিলেন নিঃসঙ্গ। বিষমুখ কণ্টকের মতন এই নিঃসঙ্গতা তাঁর হৃৎপিণ্ডে বিঁধে ছিল। পৌরুষের অভিমানে এই ব্যথাকে তিনি সাতপুরু চামড়ার তলায় লুকিয়ে রাখতেন। মাতাল যেমন মদের পাত্রকে খোঁজে, তেমনি তিনি খুঁজতেন বন্ধুজনের সঙ্গ। খোঁজবার প্রয়োজন হতো না, তাঁর সঙ্গ-সুখের জন্য বন্ধুরাই ছুটে আসতেন। সবসময়েই তিনি চাইতেন বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে। অন্তরের সংগোপন নিঃসঙ্গতার আতঙ্কে বহুজনসঙ্গ কামনা করতেন। বহুলোকও তাঁর বন্ধুতায় গর্ব বোধ করতেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁর বাইরের বৈঠকখানার লোক, তাঁর মনের অন্তঃপুরে, তিনি জানতেন, তিনি নিঃসঙ্গ।

সন্ধ্যা হোল, আলো জ্বললো, যবনিকার ওধারে যেমন লোকের ভিড়, যবনিকার এধারেও তেমনি লোকের ভিড়—আলাপ, আলোচনা, হাসি, ঠাট্টা··· রঙ্গমঞ্চে কান্না হাসির ঢেউ···সহস্র লোকের আনন্দিত করতালি···তারপর অভিনয়ের শেষে যে-যার ঘরে ফিরে গেল···একে একে বিরাট প্রেক্ষাগৃহের, রঙ্গমঞ্চের সব আলো নিভে গেল···মাঝরাতের নিঃশব্দ নিশুতি অন্ধকার··· সেইখানেই তাঁর ঘর···

অনেক দিন দেখেছি, সেই অন্ধকারের শূন্য রঙ্গমঞ্চে এসে, শিশিরকুমার

নির্বাপিত-আলো জনশূন্য প্রেক্ষাগৃহের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে···বড় বিচিত্র লাগে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের সেই নিঃশব্দ অকস্মাৎ নির্জনতা···তাঁর নিজের ভেতর জীবনের মতন শূন্য, নিস্তব্ধ, অন্ধকার···

আকাশ আছে, ফেরবার নীড় নেই।

জীবনের সূচনার মুখে একদা এক অকস্মাৎ দুর্যোগে সে-নীড় পুড়ে যায়।

এইখানেই ছিল তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডীর মর্মমূল।

ষোড়শীর জীবানন্দের অভিনয়ে তাঁর সমস্ত গতি, এমন কি তাঁর ক্লান্ত পদচারণার মধ্যে যে-সহজ চেষ্টাহীন নিঃসঙ্গতার ব্যথা ফুটে উঠতো, সে নিঃসঙ্গতা যতখানি জীবানন্দের, ঠিক ততখানি শিশিরকুমারের। পৌরাণিক রাম চরিত্রের অভিনয়ে যে-মানবীয় বেদনার আর্তনাদ জেগে উঠতো, তার মধ্যে মিশে থাকত অভিনেতার নিজের জীবনের আর্তনাদ। যোগেশচন্দ্র শিশিরকুমারের অন্তরের খবর জানতেন, তাই জেনেশুনেই তিনি লিখেছিলেন, সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী।

এই নিঃসঙ্গতার অভিশাপকে তিনি প্রচণ্ড উপেক্ষায় অস্বীকার করতে চাইতেন। কিন্তু যাকে বাইরে অস্বীকার করেছেন, সে তাঁর চেতনার গভীরে গিয়ে তাঁর অলক্ষ্যে তাঁর জীবনকে প্রচণ্ডভাবে দোলা দেয়। বেদনাকে সৃজনে রূপান্তরিত করতে হলে মনের যে বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন, সে প্রস্তুতি তাঁর ছিল না। অশ্রু-জলের তর্পণে বেদনাকে কণ্টকহীন করতে হলে যে অশ্রুর প্রয়োজন, তাঁর চোখে সে-অশ্রু ছিল না। তাঁর অভিনয়ের যে-সব মুহূর্তে দর্শকেরা কেঁদে ভাসিয়েছেন, সে-সব মুহূর্তেও তাঁর চোখে অশ্রু-বাষ্প আসত না।

সৃজনে যে-বেদনা রূপান্তরিত হোল না, অশ্রুজলে যা নিঃশেষিত হল না, তাঁর জীবনের গভীর অন্তরাল থেকে সে বেদনা শুকনো কাঠের ভেতর আগুনের কণার মতো নিঃশব্দে তাঁকে দহন করেছে, এনে দিয়েছে বিচিত্র সব অসঙ্গতি···অপচয়ের ভেতর দিয়ে অপহরণ করে নিয়েছে তাঁর প্রাণশক্তি, যে প্রাণশক্তির সাহায্যে তিনি অনায়াসে পারতেন তাঁর জীবনের স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে, রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই পারতেন গড়ে তুলতে ভারতের জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে, তাঁর প্রতিভা দিয়ে পারতেন সমগ্র জাতির নাট্য-প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে। গ্যেটের ফাউস্টের মত জীবনের এক আত্মবিস্মৃত লগ্নে তিনি

মেফিস্‌টোফিলিসের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করেন...ফাউস্টের মতন রাত্রির বিভীষিকা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তাঁরও দরকার ছিল মার্গারেটের মতন নারীর সঙ্কট-মোচন ব্রত।

মার্গারেটের স্বপ্ন নিয়ে তাঁর জীবনের তমিস্র লগ্নে এক নারী এসেছিলেনও। কিন্তু ভ্রষ্ট লগ্নের জন্যে ব্যর্থ হয়ে গেল তাঁর আত্মাহুতি।"

সে নারী শ্রীমতী কঙ্কাবতী দেবী।

চৌত্রিশ

জগতে সর্বত্র প্রবিষ্ট উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত আদিত্যের যে মূর্তি প্রকাশমান থাকে তাকেই আমরা সূর্য নামে অভিহিত করি। উদয়ের পূর্বে সূর্যের মূর্তির নাম সবিতা। ঊষা ও অরুণোদয় কালের পরেই সূর্য প্রথম যে মূর্তিতে প্রকাশিত হন তার নাম ভর্গ। তারপর যাবৎ সূর্যের তেজ প্রচণ্ড না হয় তাবৎ সেই স্বল্পতেজা সূর্যকে বলা হয় পূষা। সূর্যোদয়ের পরবর্তীকালে প্রচণ্ডতেজা সূর্যকে বলা হয় অর্ক বা অর্যমা। অর্যমা অন্তে মধ্যাহ্নকাল শেষ। সূর্য তখন অস্তাচলাভিমুখী হন। অস্তগামী সূর্যের নাম বরুণ।

ভারতবর্ষের নাট্যাকাশে শিশিরকুমারের উদয়কে সূর্যের উদয়ের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। তিনিই প্রকৃত নটসূর্য।

'ভর্গ' মূর্তিতে শিশির-প্রতিভা-সূর্যের প্রথম প্রকাশ স্কটিশচার্চ কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের রঙ্গমঞ্চে।

'পূষা'-মূর্তির প্রকাশ ওল্ড ক্লাবের পক্ষে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ম্যাডান কোম্পানীর পক্ষে কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে ও ইডেন গার্ডেনের ক্ষণস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে।

'অর্ক' বা 'অর্যমা' মূর্তিতে প্রকাশ 'নাট্যমন্দির'-এ। শিশির-প্রতিভা-সূর্য প্রচণ্ড তেজে তখন মধ্যাহ্ন গগনে ভাস্বর। প্রতিভা-রশ্মিজালে নাট্যজগৎ উদ্ভাসিত—অন্যান্য ক্ষীণতর অভিনেতৃজ্যোতিষ্কমণ্ডলী আলোকিত।

'অর্যমা' অন্তে মধ্যাহ্নকাল শেষ। সূর্য তখন মধ্যাহ্নগগন থেকে পশ্চিম গগনাভিমুখী হন। 'নাট্যমন্দির' পর্ব অন্তে শিশির-প্রতিভা-সূর্যের মধ্যাহ্নকাল শেষ হল। 'নবনাট্যমন্দির'-পর্বে শিশির-প্রতিভা-সূর্য পশ্চিমগগনাভিমুখী।

এর পরের পর্ব 'শ্রীরঙ্গম্'। শিশির-প্রতিভা-সূর্য অস্তগমনোন্মুখ। এবার 'বরুণ'-এর বিদায়-আয়োজনের পালা।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চ উঠে গেল। সেই গৃহে শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর নিজের নাট্যশালা—তাঁর জীবনের শেষ কীর্তিস্তম্ভ—শ্রীরঙ্গম্।

'শ্রীরঙ্গম্' প্রতিষ্ঠার কিছুকাল আগে অর্থাৎ ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রয়াণ করেছেন।

শিশিরকুমারের 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৮) প্রকাশিত হল। সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করি: "আমাদের দেশের যাত্রা ছিল আমাদের দেশের মাটির জিনিস। দেশের লোকের প্রাণের সাড়া পেয়েছিল এবং দেশের লোকের প্রাণে নাড়া দিয়েছিল যাত্রার গীতাভিনয়। ঠিক যে ভাবে যাত্রা আমাদের দেশের মাটিতে শিকড় নিয়েছিল, আমাদের অভিনব থিয়েটার, ঠিক সেই ভাবে দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছি কি না সেটা ভেবে দেখবার জিনিস। ভালই হোক, মন্দই হোক আমাদের দেশে একটা রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছে এবং দেশের সংস্কৃতি, দেশের জীবনধারা তার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। দেশের যাঁরা মনস্বী, যাঁরা কর্মী—তাঁরা এবং দেশের আপামর সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে অস্বীকার করতে পারে না, অবহেলা করতে পারে না। সমগ্র বাংলাদেশ এবং বাংলার বাইরে যেখানে বাঙালী আছে, আজ শৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ে ভরে গেছে। আমাদের রসবোধ ও রসানুভূতি রঙ্গাভিনয়কে বাহন করে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত এবং উদ্‌গ্রীব। এরূপ অবস্থায় রঙ্গমঞ্চকে অনাদর করলে বা তাকে অপাংক্তেয় করে রাখলে জাতীয় জীবনের বিশিষ্ট ক্ষতি হবে, এই কথাটা যেন আমরা কিছুতেই না ভুলে যাই।

"পূর্বকালে অর্থাৎ যাত্রার যুগে যখন মঞ্চ ছিল না, তখন হোত গীতাভিনয়, সাধারণ লোকে বলত 'পালা'। বড় বড় নামজাদা কবিরা গান বাঁধতেন আর সাধারণতঃ পণ্ডিতেরা বা শক্তিশালী অধিকারীরা (বর্তমান যুগের প্রয়োগকর্তা বা producer) পালা লিখতেন। কিন্তু যখন আসর ঘুচিয়ে এলিজাবেথীয় যুগের পদ্ধতির অনুকরণে বাংলা দেশে ইংরেজী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হোল, তখন প্রয়োজন হল পঞ্চাঙ্ক নাটকের। এই আসরকে মঞ্চে গড়ে তুলতে, গীতাভিনয়কে নাটকে পরিণত করতে, এক কথায় বাংলার ব্যবসাদারী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে যে কয়জন শক্তিশালী পুরুষ আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল।...এই থিয়েটারের

প্রতিষ্ঠাতারা নাট্যকার হিসেবে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন দীনবন্ধু ও মাইকেলের কাছে। নাট্যবস্তু আহরণ করবার জন্য বঙ্কিমের উপন্যাসকেও বাদ দেওয়া হয় নি। নাটক নইলে রঙ্গমঞ্চ চলে না, অথচ নাট্যকারের বিশেষ অভাব। এই অভাববোধ থেকেই জন্ম হোল গিরিশচন্দ্রের বিস্ময়কর নাট্য-প্রতিভার। পরবর্তী যুগে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল —এঁদের নিয়ে পেশাদারী থিয়েটার জমে উঠলো। স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলা সাহিত্যে নাট্যবিভাগে অনেকখানি স্থান এঁরা অধিকার করে আছেন।

"বাংলাদেশে শক্তিশালী নটের কখনো অভাব হয় নি, কিন্তু প্রতিভাবান সূক্ষ্মদর্শী নাট্যকারের অভাব হয়েছে। যাঁরা পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করবেন যে, সোফোক্লিস, শেক্‌সপীয়ার থেকে শুরু করে আজকালকার দিনে নোয়েল কাওয়ার্ড পর্যন্ত সমস্ত নাট্যকারেরই রঙ্গমঞ্চের ব্যাকরণ সম্বন্ধে ভেতর দিককার জ্ঞান আছে। এঁরা অনেকেই নট, কেউ বা প্রয়োগকর্তা অথবা মঞ্চব্যবসায়ী। বাংলাদেশে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ছাড়া রঙ্গমঞ্চের ভেতর দিককার অভিজ্ঞতা বিশেষ কোন নাট্যকারের নেই, সেইজন্য তাঁদের নাটক অভিনয় করতে গেলে কাটতে ছাঁটতে হয় এবং অভিনয়ের রসসৃষ্টিতে অসম্পূর্ণতা ঘটে যায়।

"এতখানি ভূমিকা করছি এই কথা বোঝাবার জন্য যে, বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্তা। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে, যদিও ব্যবসাদার হিসেবে নয়, তিনি নট ও প্রয়োগকর্তারূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের সম্মুখে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছেন। এমন কি বার্ধক্যে পদার্পণ করবার পরও তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রয়োগনৈপুণ্যের বিবিধ কলাকৌশল দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আমাদের দেশে নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের মত আসনে বসে থাকবেন এবং অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মত অভিনয় করবে—এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে যে বেড়া সেকালের যাত্রায়, গ্রীক ট্র্যাজেডির অভিনয়ে, এমন কি শেকস্‌পীয়ারের থিয়েটারে ছিল না, যে বেড়া তুলে দেবার জন্যে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন প্রয়োগাচার্য (মায়ারহোল ও রাইনাহার্ট) চেষ্টা করে

আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন, সেই বেড়া ভুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজস্ব দল নিয়ে দু'একবার করেছেন।

"আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে ঘটে উঠল না। আমি নিজে তাঁকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাধা এসেছে নানা দিক থেকে। যে অপূর্ব প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত আপনার আলোকে উজ্জ্বল করে বিশ্বসাহিত্যের সভায় বাংলা সাহিত্যের হয়ে সমান আসন দাবী করা সম্ভব করে তুললেন, সেই নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিভাগ নাটকে তাঁর শক্তির এবং প্রাচুর্যের অতি অল্প অংশই ব্যয় করলেন। যে ভাবে শেকস্‌পীয়ার, ইব্‌সেন বা হাউটম্যান তাঁদের জাতীয় নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চ সফল করে তুলবার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যদি নিজের দেশের নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্য সৃষ্ট করবার সম্ভাবনা ঘটে উঠত, তাহলে আজকে বাংলার নাট্যমঞ্চ সুসম্পন্নপ্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারত।

"...নাট্যমঞ্চকে বাদ দিয়ে নাটক হয় না, নাটক লেখা চলে না। আমাদের হিন্দু আলঙ্কারিকেরা বলেন, নাটক দৃশ্যকাব্য। সুতরাং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি যিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁকে নটের সঙ্গে সাহচর্য করতে হবে। **'No playwright has come halves with the actor more than Shakespeare'**—এই যে সেকস্‌পীরিয়ান্ অন্তর্দৃষ্টি, নাটক লেখার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। তাঁর 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা', 'তপতী' এই সব যাঁরা অভিনয় করেছেন বা অভিনয় দেখেছেন, এ বিষয়ে তাঁদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন হলে আমরা পেতাম অপূর্ব সমৃদ্ধ নাট্যসাহিত্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রঙ্গশালা ও সমাজের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যে আবয়বিক সম্বন্ধ সেটা সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত হতে পারতো।..."

২৮শে নভেম্বর শ্রীরঙ্গমের দ্বারোদ্ঘাটন হল তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ' নাটক দিয়ে। 'নাট্যাচার্য অমরেশ'-এর ভূমিকায় শিশিরকুমার অবিস্মরণীয় অভিনয় করলেন। প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্র 'নাট্যকার'-এর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নবাগত শচীন মিত্র। 'অমরেশ'-এর ভূমিকায় শিশিরকুমারের

অভিনয় প্রসঙ্গে শ্রীশম্ভু মিত্র তাঁর 'নাট্য-সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন : "...এর মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবেই স্মরণীয়। তিনি শিশিরকুমার। তাঁর নাট্যপ্রযোজনায়, তাঁর অভিনয়ে, তাঁর বাচনভঙ্গীতে, তাঁর উচ্চারণে আমরা প্রথম বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্টতঃ অনুভব করলাম। একমাত্র তাঁর কণ্ঠেই কাব্যের কথা যেন স্পষ্ট রূপ পেত। শুধু কাব্য কেন, কথা যে কেবল সেন্টিমেন্টবাহী নয়, তাতে যে বুদ্ধির বিচিত্র রঙ ঝলমল করে সেটা কেবলমাত্র তাঁর অভিনয়েই বুঝতে পারতাম। আর কারও অভিনয়েই সে উপলব্ধি আমার হোত না। 'জীবনরঙ্গ' নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষটায় নাট্য কেমন হবে তার একটা বর্ণনা ছিল একটি চরিত্রের মুখে। সেটি অভিনয় করতেন শিশিরকুমার। অমন অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয়াবেগের প্রকাশ আমি খুব কম দেখেছি। আজও আমার শিশিরকুমারের ওই কথাগুলো বলবার ভঙ্গী খুব স্পষ্টভাবে মনে আছে, সে স্বরবৈচিত্র্য অদ্ভুত। যতদূর মনে পড়ে, নাটকে ছিল যে শিষ্য জিজ্ঞাসা করছে নাট্যাচার্যকে, লোকে তো থিয়েটার দেখতে আসে আনন্দ করবার জন্যে, তারা তো শিক্ষার জন্য আসে না। সুতরাং আপনি শিক্ষা দেবেন কী করে? নাট্যাচার্য তার উত্তরে বলেন যে, নাটককে সুরু করতে হবে কেতুনপুরের ভুনাগ রাজার রাণীর মতো ঘাঘরা দুলিয়ে, ওড়না উড়িয়ে, আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে। তারপর অকস্মাৎ নাটকের মধ্যভাগে আসবে সঙ্কট। তখন—

বিনা মেঘে বজ্ররবের মতো
উঠবে বেজে কাড়ানাকাড়া
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী
ঝনঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি
গভীর সুরে ধরবে কানাড়া—

রক্ত! রক্ত! বেগে গড়িয়ে পড়বে রক্তধারা। যারা আনন্দ করতে এসেছিল তাদের দুচোখ যাবে অন্ধ হয়ে।—

"এই যে অভিনয় (যার প্রতিটি ভঙ্গী আজও আমার প্রায় মুখস্থ), এই যে বিশিষ্ট বক্তব্য—এর সঙ্গে দেশের সাধারণ মঞ্চ কোনও যোগ রেখেছে? শিশিরকুমার উচ্চারণ সম্পর্কে খুব রুচিবান ছিলেন। সেই

উচ্চারণস্পষ্টতা কি সাধারণ রঙ্গালয়ে অনুসৃত হয়? কিংবা তথাকথিত নবনাট্য আন্দোলনে? তাই আমি বিচারকদের অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন বিশ্লেষণ করে দেখেন যে শিশিরকুমারের নাট্যচিন্তার সঙ্গে কি নব-নাট্য আন্দোলনের কোনও যোগ আছে, নাকি আজকের ব্যবসায়িক মঞ্চের সঙ্গে তার যোগ আছে?"

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ।

১১ই মার্চ খোলা হল নিতাই ভট্টাচার্যের 'উড়ো চিঠি'। শিশিরকুমার 'সুনীল' সাজলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'দেশবন্ধু'। এই নাটকটি 'মহর্ষি' আসলে ডিউকসের 'Such men are Dangerous' (মূল নাট্যকার য়্যালফ্রেড ন্যুমান ও নাটকের মূল নাম The Patriot) নাটকটি অবলম্বন করে বাংলায় মর্মানুবাদ করেন। এই নাটকে শিশির-কুমারের অভিনয় প্রসঙ্গে 'শিলালি' লিখেছেন: "নাট্যাচার্য অতুলনীয় দক্ষতার সঙ্গে দেশভক্ত রাজঅমাত্য কহ্লনের ভূমিকার রূপায়ণ করেছিলেন। শেষ দৃশ্যে তিনি অভিনয়কে গ্রেট এ্যাকটিং-এর হাইটে তুলেছিলেন।"

২৩শে ডিসেম্বর 'মায়া' নাটকে 'জ্যাঠামশায়ের ভূমিকায় অভিনয় করলেন শিশিরকুমার।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ।

২৩শে এপ্রিল মঞ্চস্থ হল নিতাই ভট্টাচার্যের 'মাইকেল'।

এর কিছুদিন আগে মাইকেলের জীবনচরিত অবলম্বনে আর একখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকটির রচয়িতা শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত। মাইকেলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

শিশিরকুমারের 'মাইকেল' সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন: "মাইকেলের ভূমিকায় দেখা দিয়ে শিশিরকুমার দর্শকের মনকে মুহূর্ত মধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেলেন। চরিত্র অভিনয়ের এই অনুপম ক্ষমতার পরিচয় যৌবনে তিনি বারবার দিয়েছেন। ইদানিংকালে মনে হত এই ক্ষমতা বুঝি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। মাইকেল অভিনয় করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রতিভা ক্ষয় পায় না, প্রকাশের অবসর পেলে আপন দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে।"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "সাধারণ ব্যক্তির জীবন যদি

দুর্বোধ্য হয়, তবে কবির জীবন আরও কত রহস্যময়। বিশেষতঃ মধুসূদনের মত দ্বৈত-উপাদান-সংগঠিত, বিপরীত রুচি ও আদর্শের আকর্ষণে অস্থির চরিত্রের ব্যক্তিত্ব-রহস্য ভেদ করা প্রায় অসম্ভব মনে হয়। মধুসূদন একাধারে প্রাচীন ও উগ্র আধুনিকতাপন্থী, হ্যাটকোটপরা সাহেব ও প্রচ্ছন্ন টিকি-ভূষিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও অসহায় পরনির্ভরতার অদ্ভুত সমাবেশ। এ-হেন দুর্জ্ঞেয়, দ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিত্বকে শিশির আশ্চর্যরূপে পরিস্ফুট করিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব, ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় কাব্য একসঙ্গে লেখার মধ্যে এই বিভক্ত সত্তার বহুমুখীন শক্তি ও প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। যখন কবি পণ্ডিতদের মুখে মুখে কবিতার ছত্রগুলি বলিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহার অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত পদচারণা যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। এই এক আঁচড়েই কবির সমুদ্রতরঙ্গবৎ বিক্ষুব্ধ চঞ্চল, বাস্তবের তটভূমিতে অশান্ত—অধীরভাবে আছড়াইয়া পড়া অন্তর-প্রকৃতি কি অপূর্বভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। মধুসূদনের অন্তর-সমুদ্রের একটা ঢেউ শিশিরের অভিনয়-ছন্দে ধরা পড়িয়া দর্শকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে।”

সূত্রধার (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য) লিখেছেন : “নাটকখানি যেমন হোক, ওই নাটকে শিশিরকুমারের আবৃত্তি যিনি না শুনেছেন, কালিকলমের সাহায্যে তাঁকে তা বোঝানো সম্ভব নয়। রঙমহলেও…‘মধুসূদন’ অভিনীত হল, শ্রীরঙ্গমের ‘মধুসূদন’-এর কাছ দিয়েও তা গেল না।”

শিশিরকুমার তাঁর নটজীবনে অসংখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন। এই অসংখ্য চরিত্রসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ চরিত্রে তাঁর ব্যক্তি জীবন প্রতিফলিত হয়েছে ? এর উত্তরে আচার্য শ্রীকুমার বলেছেন : “আমার মনে হয় মাইকেল ও জীবানন্দ—এই দুটি চরিত্রই শিশির-জীবনের নিকটতম আত্মীয়, নিজ ব্যক্তিত্ব প্রক্ষেপের সার্থকতম পটভূমিকা। প্রতিভার সঙ্গে সাধারণ জীবনের অসামঞ্জস্য, রুদ্ধ বেগবান আবেগের প্রকাশ-ব্যাকুলতা, মানস-অভীপ্সা ও বস্তুগত বাধার মধ্য দিয়ে তার ক্ষুব্ধ, খণ্ডিত রূপায়ণ—শিশির-চরিত্রের অসাধারণত্ব ও তাঁর জীবনে ট্র্যাজেডির মূল উৎস। মাইকেলের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনের এই চিরন্তন অতৃপ্তি, পিঞ্জরাবদ্ধ ঈগল পাখির এই অশান্ত পক্ষ-বিক্ষেপ আশ্চর্য সুসঙ্গতির সঙ্গে রূপ পেয়েছিল। মেঘনাদ রচনা কালে কবির অস্থির পাদচারণা, উজ্জ্বল কল্পনার বহিঃপ্রকাশে শব্দ-

ভাণ্ডার ও ভাষাপ্রয়োগের অপ্রাচুর্যজনিত বাধার ক্ষুব্ধ অনুভূতি শিশিরের অন্তর-বেদনার, কৃপণ প্রতিবেশের বিরুদ্ধে তাঁর রাজোচিত চিত্ত-প্রশস্তির দৃপ্ত প্রতিবাদেরই অনিবার্য সংকেত। জীবানন্দের বেপরোয়া অসংযম; অকুণ্ঠ আত্মপ্রসার ও শেষজীবনের মর্মদাহী অনুশোচনা—মনে হয় যেন এর ভেতর দিয়ে শিশিরের ব্যক্তি-জীবনের দৃপ্ত সাহসিকতা ও করুণ আত্ম-গ্লানির কিছুটা সুরমূর্চ্ছনা মিশেছিল। তাঁর চাণক্য, রাসবিহারী, আলমগীর, দিগ্বিজয়ী, এমন কি রামও—সব তাঁর নটকল্পনার অপূর্ব আত্মপ্রসারণের নিদর্শন। কিন্তু মাইকেল ও জীবানন্দে তাঁর নটজীবন ও ব্যক্তি-জীবন এক অপরূপ সমন্বয়ে, পরস্পরের পরিপূরকরূপে, আলিঙ্গনবদ্ধ হয়েছে।"

২২শে জুন জনপ্রিয় অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন।

২৫শে নভেম্বর মঞ্চস্থ হলো শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস'। শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য উপন্যাসটিকে নাটকে রূপায়িত করলেন। শিশিরকুমার এই নাটকে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। পরিচালনার ভারটুকু নিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার গুণে বিশ্বনাথ 'বিপ্রদাস'-এর ভূমিকায় জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছিলেন। 'রায়সাহেব'-এর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, 'দ্বিজদাস'-এর ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য আর 'বন্দনা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীমতী মলিনা দেবী। অনুজ বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর শিশিরকুমার 'বিপ্রদাস'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

২৫শে ডিসেম্বর খোলা হল বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাইতো'। এই নাটকে শিশিরকুমার নামেন নি। ভূমিকালিপি ঃ—বিরূপাক্ষ—বিশ্বনাথ, জীবনময়—শৈলেন চৌধুরী, দীননাথ—রঞ্জিত রায়, সমর—জীবেন বসু, সমীর—মিহির ভট্টাচার্য, মল্লিকা—শ্রীমতী মলিনা, বল্লিকা—শ্রীমতী রেবা বসু।

একই দিনে অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর শিশিরকুমার অভিনীত পঞ্চম সবাকচিত্র অনুরূপাদেবীর 'পোষ্যপুত্র' (ভ্যারাইটি পিকচার্স) মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ করে। শিশিরকুমার 'শ্যামাকান্ত' চরিত্রে অভিনয় করেন। পরিচালক ছিলেন স্বর্গত সতীশ দাশগুপ্ত। শিশিরকুমার এই প্রথম ও শেষ কোন ভিন্ন ব্যক্তির পরিচালনাধীনে অভিনয় করলেন। তিনি চলচ্চিত্রে এরপর আর অভিনয় করেন নি।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীরঙ্গমে গণনাট্যসংঘের শিল্পীরা ১০ই জুলাই 'জবানবন্দী' ও ২৪শে অক্টোবর 'নবান্ন' অভিনয় করলেন। প্রখ্যাত নট, নাট্যকার ও প্রযোজক শ্রীবিজন ভট্টাচার্য নাটক দুটির রচয়িতা। 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ই বাংলাদেশে পেশাদারী মঞ্চের বাইরে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা করেছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীশম্ভু মিত্র লিখেছেন: "নবান্ন যদি একদিন চমৎকৃত করে থাকে তার কারণ এ নয় যে তাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের রোমহর্ষক মৃত্যুকাহিনী বিবৃত ছিল। সে নাট্যাভিনয়ে কাব্য ছিল।...নবান্ন অভিনয়ে একটা কাব্য সৃষ্টি হত। আবেগের কাব্য। মানুষের নিঃসঙ্গতার কাব্য, তার ভালবাসার কাব্য।"

শিশিরকুমারের নাট্য প্রযোজনায় ও অভিনয়ে এই কাব্যই সৃষ্টি হত। তাঁর অভিনয়েও কাব্যের ঝড় বয়ে যেত। নবনাট্য আন্দোলনকারীরা শিশির-কুমারের প্রযোজনা ও অভিনয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাই 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনায় ও অভিনয়ে কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র তা স্বীকার করেছেন। নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে যে অনুরূপ মন্তব্য তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার' নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি। তিনি লিখেছেন:

"গিরিশ ঘোষ ও শিশিরকুমার—দুজনই রঙ্গমঞ্চে দুই যুগোত্তর প্রতিভা। কিন্তু তবু এই দুই প্রতিভার মধ্যে মূলগত ঐক্য থাকলেও গুণগত পার্থক্য বহুলাংশে বিদ্যমান। একজনের ভাব, অন্যজনের ভাবনা; একজনের প্রেরণা অন্যজনের দ্যোতনা। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে আবেগতরঙ্গের সৃষ্টি করাই ছিল গিরিশ প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। আর শিশিরকুমারের বিশিষ্টতা ছিল নাট্যের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অধিগত হয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে সেই চরিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত বিকীরণ। কি ক্লাসিক, কি ঐতিহাসিক, কি সামাজিক, শিশিরকুমারের প্রত্যেকটি প্রযোজনার ক্ষেত্রেই তাই ঐশী শক্তির জায়গায় মানুষী শক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশ সুস্পষ্ট।

"সমুদ্রের নাচন অনেকেই দেখেছেন কিন্তু সমুদ্র হয়ে যিনি না নেচেছেন তিনি তাঁর সেই শিবতাণ্ডবের রসমাধুর্য সম্যক অনুধাবন করতে পারবেন না। আলমগীর, রাম, রঘুবীর চাণক্য, নাদির শা, জীবানন্দ, মাইকেল প্রমুখ বিভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপায়নে সেই সত্যই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

"নাট্যাভিনয় ভিন্ন অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির মূল্যে স্বল্পাধিক কতকগুলি রূপায়ন পদ্ধতি আছে। কিন্তু অভিনয় শিল্পের রসবিচারে সে রকম কোনো নির্দিষ্ট নিরিখ-এর মাধ্যম নেই। ফলে অভিনয় শিল্পের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বিচার শ্রোতার অন্তর্লীন মানসলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরগ্রাম ছুঁয়েছুঁয়ে কখনও বা সগন্ধপুষ্পচন্দনের এক নিরবয়ব বিলসিত রূপরেখার লীলাবিলাসে, কখনও বা উৎকট কোন বিকেন্দ্রিক চিত্তবিক্ষেপের ক্লান্তিকর অনুভবে ধরা পড়ে। শিশিরকুমারের তিরোধানের পর অভিনয় শিল্পের সেই বিচিত্র স্বরগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও পরোক্ষভাবে যে তার লয়মান কথঞ্চিৎভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে, এ কথা বলা যায়। 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'—সত্য। কিন্তু অভিনয় শিল্পে যে ঐতিহ্য শিশিরকুমারের মহত্তম অবদান, সে কথা স্মরণ করলে সেই সত্য ও মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণ করে দেখলে স্পষ্টতঃই দেখা যায় শিশিরকুমারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতকের শেষ ট্র্যাজিডি নায়ক রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে চিরদিনের মত অবলুপ্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু এই অবলুপ্তির প্রাক-মুহূর্তে বাংলার রঙ্গমঞ্চের বেদীমূলে যে অনির্বাণ পাদপ্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেলেন, জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের এই কুহকের মাঝখানে দাঁড়িয়েও তাঁর উত্তরাধিকারীরা নাট্যশিল্পের প্রাণবস্তু খুঁজে নিতে সংশয়ান্বিত হবেন না।...

"শিশিরকুমারের মৃত্যুর সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হলেও অভিনয় শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে তাঁর অপরিসীম দান বিশ্বের দরবারে সমগ্র জাতির সম্ভ্রম এনে দিয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথ অভিনয় শিল্পের ক্ষেত্রে তেমনি শিশিরকুমার এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

"রঙ্গমঞ্চই যদি জাতির আত্মপরিচিতির একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে তবে শিশিরকুমারের জীবিতকালে তাঁর প্রতিভার প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রদর্শনে সমগ্র জাতির অবমাননা হয়েছে এবং তাতে করে আমরাই আমাদের প্রতি নিকৃষ্ট অসম্মানের পরিচয় দিয়েছি।...

"এই প্রসঙ্গে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'নবান্ন' নাটক অভিনয়কালে এক রজনীর কথা মনে পড়ে আমার। মেদিনীপুরের সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত বিক্ষিপ্ত হয়ে দয়ালের ভূমিকায় বন্ধুবর শম্ভু মিত্র তাঁর শিশির-সুলভ স্বরবিন্যাসে—'জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল, সমুদ্দুর উঠে এয়েছে প্রধান'—বলে

অনতিপূর্বেই মঞ্চে ও প্রেক্ষাগৃহে সমুদ্র এনে ফেলেছেন। আমি বিহ্বল হয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি মঞ্চের বাঁদিক দিয়ে। এমন সময়ে উইংস-এর পথ আগলে দেখি মঞ্চের আলমগীর তদীয় ভ্রাতা বিশ্বনাথের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রাকার রচনা করে। প্রথমে বিরক্ত বোধ করি চিনতে না পেরে। নিষ্ক্রমণের পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে, এ আবার কেমন নাট্যরসিক। নাট্যাচার্যের মুখের দিকে তাকাবার পূর্বেই একটি হ্রস্ব মন্তব্য দন্তপিষ্ট হয়ে ঠোঁট ছিটকে বেরিয়ে যায় আমার, সরে দাঁড়াতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, 'এই বিশে'—কথাটি উচ্চারণ করে লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে টেনে নিয়ে একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন শিশিরকুমার। ঘটনাটা ঘটে প্রায় যুগপৎ। আমি সবিশেষ কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি। করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষার পূর্বেই মোটা একটা কালো চুরুট সমেত আলমগীরের ডান হাতখানা আমার কাঁধের ওপর নেমে আসে। নবান্ন-নাটকে প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকায় ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধের সেই রূপসজ্জায় আমার বয়সের কোন গাছপাথর ছিল না। সুতরাং বিভ্রম ঘটে আলমগীরের। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে ততোধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু শিশিরকুমারের সেদিকে দৃষ্টি থাকবার কথা নয়। প্রবীণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে বিশ্বনাথকে লক্ষ্য করে বলেন, জানিস বিশে, সেই যে আমাদের, সেই ধোপা! মনে পড়ছে না তোর?…অস্থির হয়ে পড়েন শিশিরকুমার। 'নবান্ন' নাটকে প্রধান সমাদ্দারের দিকে তাকিয়ে কোন্ রজকের স্মরণ করছিলেন শিশিরকুমার তা তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁর ক্ষণিকের সেই বিভ্রান্তির মধ্যে আমি এক সত্য প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম, রামচন্দ্র গুহকচণ্ডালরূপী এক রজকের ভূমিকায় পরোক্ষভাবে ধন্য হতে চাইছেন। একথা আমি নিজে একজন মঞ্চশিল্পী হয়ে জোর দিয়ে বলতে পারি। কারণ পুরু চশমার লেন্সের আড়ালে তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি আর মুখের পেশীগুলি তখন সমাজের অধস্তন কোন এক দুর্মদ রজক-এর অঙ্গীকারে কঠিন হয়ে উঠেছে। আমার চোখে আলমগীর সেদিন কিন্তু সংশয়াতীতভাবে উত্তরণ করেছিল এক রজক চরিত্রে। আর্যপুত্র রামচন্দ্রের পক্ষে গুহক হতে তখন আর কোন বাধা নেই।

"সমন্বয় তিনি দেখেছিলেন।…"

'নবান্ন'র সমশ্রেণীর নাটক 'দুঃখীর ইমান' (তুলসী লাহিড়ী রচিত) প্রযোজনা করে শিশিরকুমার সেই সমন্বয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

২৬শে অক্টোবর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'বন্দনার বিয়ে' মঞ্চস্থ হল। এ নাটকে শিশিরকুমার নামেন নি। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন।

২০শে ডিসেম্বর শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' অভিনীত হল। গল্পটিকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। এ নাটকে শিশিরকুমার নামেন নি। 'যাদব,' 'অন্নপূর্ণা' ও 'বিন্দু'র ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভাদেবী ও সাবিত্রী। তিনজনেই অতুলনীয় অভিনয় করেন। শিশিরকুমারের শিক্ষায় অতি সাধারণ অভিনেত্রী সাবিত্রী (পক্ষী) যে অসাধারণ অভিনয় করেন তা নাট্যামোদীরা আজও বিস্মৃত হন নি। পরে শিশিরকুমার কয়েকরাত্রি যাদবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ ভ্রাতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী পরলোকগমন করলেন। শিশিরকুমার অসামান্য ভ্রাতৃবৎসল। ভ্রাতৃ-বিয়োগজনিত শোক এই প্রথম পেলেন। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চস্থ হল। এ নাটকেও শিশিরকুমার কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ডিসেম্বর মাসে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের পুনরভিনয় হল। মিনার্ভা থিয়েটারে এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর। ভূমিকালিপি ছিল এই রকম :—করিমচাচা—গিরিশচন্দ্র, দানশা ফকির—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, সিরাজ—দানীবাবু, মোহন-লাল—তারক পালিত, ক্লাইভ—ক্ষেত্র মিত্র, জহরা—তারাসুন্দরী, ঘেসেটি—সুধীরাবালা। নাটকটির অভিনয় পরে ইংরেজ সরকারের আদেশে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হবার পরই শিশিরকুমার এই নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। তাঁর দুই অনুজ মুরারীমোহন ও ভবানীকিশোর যথাক্রমে 'সিরাজ' ও 'করিমচাচা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। পরে শিশিরকুমারও 'সিরাজ' সেজেছিলেন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।

১০ই আগষ্ট মঞ্চস্থ হল শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'পরিচয়'। নাটকটির নাম ছিল 'ভাবী মানব'। শিশিরকুমারই নামকরণ করেন 'পরিচয়' এবং অনেক জায়গায় কলমও ধরেছিলেন। ভূমিকালিপি :—রায়বাহাদুর

শশাঙ্ক চাটুয্যে—শিশিরকুমার, নরেশ ব্যানার্জি—কমল মিত্র, ডাক্তার আদি—ভবানীকিশোর ভাদুড়ী, নীরদ চৌধুরী—বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়, নিবারণ—রাজকুমার মল্লিক, রায়বাহাদুর অনন্তলাল—আদিত্য ঘোষ, বৈরাগী—গণেশ শর্মা, আর্দালী—কার্তিক মিত্র, খোকা—কুমারী মঞ্জু, মমতা—নিভাননী, নিভা—রেবা, শুভা—বীণা ও লতা—শেফালিকা (পুতুল)।

রায় বাহাদুর শশাঙ্ক চাটুয্যের চরিত্র রূপায়ণ শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্ব-নিমজ্জিত অভিনয়ের আর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই ভূমিকায় শিশির-কুমারের অভিনয়-প্রতিভার অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পরিচয় নাটকে শিশিরকুমার' (বিচিত্রা, ১৩৬৬) নামক প্রবন্ধে। সেটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করি। শ্রদ্ধেয় দিগিন্দ্রবাবু লিখেছেন : "শিশিরকুমারের অভিনয়ধারা মূলতঃ ছিল রোমান্টিক। তার কারণ তিনি ছিলেন মঞ্চের রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুরটি রোমান্টিক। ইউরোপীয় রোমান্টিক সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রপূর্বযুগের বাঙালী লেখকগণ বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক ধারাটির প্রবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এসে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সুতরাং রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতার অভিনয়ে রোমান্টিসিজম্ প্রাধান্য পাবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যেই নয়, ইউরোপের রোমান্টিক সাহিত্যেও শিশিরকুমারের যথেষ্ট দখল ছিল। সুতরাং তাঁর কল্পনাশক্তির উদ্দীপনের মূলে ছিল রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাব।...শিশির-কুমারের সহকর্মী স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রায়ই বলতেন : 'নাটকে কিছু থাকলে আমিও কিছু করতে পারি, কিছু না পেলে কিছু করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আশ্চর্য শিশিরবাবুর ক্ষমতা। তাঁর অননুকরণীয় অভিনয়দক্ষতা দিয়ে সামান্যকে তিনি অসামান্য করে তুলতে পারেন। হি ক্যান্ ডু সামথিং আউট অফ নাথিং।'

"শিশিরকুমারের অভিনয় যাঁরা নিয়মিতভাবে দেখেছেন তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন। অনেক নাটকেই কতগুলি দুর্বল স্থান থাকে; অথচ কাহিনী বিন্যাসের প্রয়োজনে সেগুলি অপরিহার্য। শিশিরকুমার তাঁর অসাধারণ অভিনয়কুশলতা দিয়ে সে সমস্ত দুর্বল স্থানকে ভুলে দিতে পারতেন। কখনও কণ্ঠস্বরকে অকস্মাৎ উচ্চগ্রামে তুলে, কখনও একটি বিশেষ ভঙ্গী দিয়ে, আবার কখনও বা মাত্র একটা নীরব দৃষ্টিপাত করে

সেই জায়গাগুলি ভরাট করে দিতেন। সেটা ছিল তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা। অপেশাদার মহলের বহু অভিনেতা শিশিরকুমারের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুকরণ করতে গিয়ে অনেক সময় হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করতেন। বলা বাহুল্য, বিপুল কল্পনাশক্তির অধিকারী শিশিরকুমারের পক্ষে যা সহজসাধ্য ছিল, কল্পনাবিহীন কোনো সাধারণ অভিনেতা যদি তা অনুকরণ করতে যান তবে হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া তাঁর গতি কি? বড় প্রতিভাকে অনুশীলন করা যায়, অনুকরণ করা যায় না।

"মূলত রোমান্টিক স্কুলের হলেও মাত্র একটি অভিনয় ধারার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না। বড় শিল্পী-সাহিত্যিকের লক্ষণই তাই। নানা রীতি ও ধারার মিলন হয় তাঁদের মধ্যে। শিশিরকুমার প্রধানতঃ ইম্প্রেসনিষ্ট ছিলেন। চরিত্র ও গোটা নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটাকে ভাবময় অভিনয়ের দ্বারা দর্শকচিত্তে গভীরভাবে অঙ্কিত করে দিতে চাইতেন তিনি। ভঙ্গীর চাইতে ভাবের দিকে দৃষ্টি ছিল তাঁর বেশি। কিন্তু যেখানে প্রয়োজন সেখানে তিনি এক্সপ্রেসনিষ্টও হতেন। বক্তব্যটিকে সুপরিস্ফুট করবার জন্য সেসব ক্ষেত্রে তিনি ভঙ্গীটিকে প্রাধান্য দিতেন। আবার কোথাও কোথাও তিনি প্রতীকধর্মীও হয়ে উঠতেন। রোমান্টিক শিশিরকুমারকে বাস্তবধর্মী নাটকে বাস্তবিকরূপেও আমরা পেয়েছি। মোট কথা, নাটকের প্রয়োজনেই তিনি বিভিন্ন ধারায় অভিনয় করতেন; কোনও একটি বিশেষ ধারায় সমস্ত নাটককে ফেলে ছকবাঁধা পথে রূপায়ণের চেষ্টা করতেন না।

"বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর অভিনয়কৌশল সম্পর্কে আলোচনা একটি মাত্র নাটকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো।

"পরিচয়। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত এই সামাজিক নাটকটি ১৯৪৯ সালে শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হয়।...শিশিরকুমার এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন:

'সমাজের বিবেকবুদ্ধি, সামাজিক চিন্তার ধারা, সমাজ সমস্যার বিশ্লেষণ যে নায়কের প্রাণ (motif) তাকেই প্রকৃত সামাজিক নাটক বলা চলে। বর্তমান নায়কের সেই লক্ষণগুলি সরলভাবে পরিস্ফুট। তাই নাটকখানি অপরিচিত লেখকের হলেও আমার রঙ্গমঞ্চে অনেকদিন ধরে অভিনয় করেছিলাম।'

"অবৈধ সন্তানের সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরিচয় নাটকের মূল কাহিনী উপস্থাপিত। কিন্তু সেই সমস্যাকে ভাবালুতার বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নাট্যকার হিন্দুসমাজের গোঁড়ামীর দিকে তাঁর সন্ধানী আলো ফেলেছেন। এজন্যেই নাটকটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যে সনাতনী চিন্তাধারা খাপ খায় না, সেদিকেই নাটকের নির্দেশ। বর্তমান সমাজবাস্তবের সঙ্গে সনাতনী চিন্তাধারার সংঘাত ও অসঙ্গতিকে পরিস্ফুট করার জন্যে নাটকে দুটি উচ্চশিক্ষিত রক্ষণশীল চরিত্রের আমদানী করা হয়েছে—একটি রায় বাহাদুর শশাঙ্ক চাটুয্যে, আর একটি নিবারণ চৌধুরী। প্রথম জন অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয়জন নামজাদা এ্যাডভোকেট। দু'জনেরই অন্তরে বেদনা—বাইরে শাস্ত্রবাক্যে সান্ত্বনা খোঁজেন। একজন শাঙ্করভাষ্য নিয়ে ব্যস্ত, অপরজন নিষ্প্রাণ ধর্মাচরণের দ্বারা মানসিক শান্তি পাবার জন্যে ব্যাকুল। অপত্যস্নেহ ফল্গুর ধারার ন্যায় দু'জনেরই অন্তরে প্রবাহিত। রায় বাহাদুর শশাঙ্ক চাটুয্যে নিজের যৌবন লালসা সম্ভূত অবৈধ সন্তানকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত; নিবারণ চৌধুরী অসবর্ণ বিবাহের দরুণ ছেলেকে স্বগৃহে স্থান দিতে অসম্মত। দ্বন্দ্ব দুজনের জীবনেই রয়েছে। তবে শশাঙ্ক চাটুয্যে চাপা আর নিবারণ চৌধুরী প্রায় মতিচ্ছন্ন। শিশিরকুমার রূপ দিয়েছিলেন রায় বাহাদুর শশাঙ্ক চাটুয্যের চরিত্রটিকে।

"দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শিশিরকুমার ঢুকেই যখন (বন্ধু রায় বাহাদুর অনন্তলালকে—গ্রন্থকার, বলতেন :

'..চলহে রায় বাহাদুর আমার নতুন লেখাটা—শঙ্করভাষ্যের ওপর—তোমায় একটু শুনিয়েই দিই।'...

"তখন বাহ্যত মনে হতো না তাঁর মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। কোমরটি ঈষৎ বাঁকিয়ে শুধু বার্ধক্যের ইংগিতটুকু প্রকাশ করতেন; কিন্তু সহজ ঋজু ভঙ্গীতে বাক্যোচ্চারণের মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটা দৃঢ়তা প্রকাশ পেতো। মনের গোপন ভাবকে চাপা দেবার শক্তি এই চরিত্রের আছে যা নিবারণ চৌধুরীর মধ্যে আমরা পাইনে। কিন্তু অভিনিবেশসহ শুনলেই বুঝতে পারা যেত শিশিরকুমার প্রারম্ভেই শশাঙ্ক চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটিকে অতি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশের চেষ্টা করতেন। 'আমার নতুন লেখাটা' বলেই একটু থামতেন, তারপর 'শঙ্কর ভাষ্যের ওপর' এই শব্দ ক'টির

ওপর একটু জোর দিতেন। জীবনের সত্যকে অস্বীকার করার দরুণ যে বিবেকের দংশন, সেটি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে শঙ্করভাষ্যের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছেন শশাঙ্ক, শিশিরকুমার পরিচয় নাটকে অবতীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আভাসটি দিতেন। অভিনয় চরিত্রানুগ করার জন্যেই তিনি সেটিকে গোড়ায় অত্যন্ত সূক্ষ্মস্তরে রাখতেন। জীবনরহস্যের সামনে একটি কুয়াশার পর্দা সৃষ্টি করতেন তিনি। রসিক দর্শকবৃন্দ চরিত্রসম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠতেন। নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে এই পর্দা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসত এবং পরিণতিতে আবরণ সম্পূর্ণ অপসৃত হয়ে চরিত্র জীবন-সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াত।

"শশাঙ্কের মনের দ্বন্দ্বটিকে সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে কিভাবে শিশিরকুমার স্ফুট থেকে স্ফুটতর করতেন, দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে তার দৃষ্টান্ত মেলে। নীরদ ও শশাঙ্কের মধ্যে সংলাপ হচ্ছে ঃ

নীরদ—কি রকম পাত্র চান ?

শশাঙ্ক—সদ্বংশজাত, বিদ্বান, স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র আর কি ?

নীরদ—আর অর্থবানও নিশ্চয় ?

শশাঙ্ক—নিশ্চয়ই। অর্থ নইলে সংসারে কোন্ কাজটা হয় রে বাবা ?

নীরদ—যদি অর্থবান হয় অথচ চরিত্রবান না হয় তা হলে ?

"শিশিরকুমার এই প্রশ্নে অকস্মাৎ একটু চমকে উঠতেন। নিমেষেই নিজেকে সামলে নিয়ে নীরদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বলতেন ঃ

—চরিত্রবান না হয় মানে ? প্রকাশ্যে চরিত্রহীনতার কাজ হতে থাকলে সমাজে মুখ দেখাব কি করে ?

নীরদ—যদি অপ্রকাশ্যেই হয় ?

"শিশিরকুমার এখানে একটু ম্রিয়মান হয়ে পড়তেন। মনে হত কোন দুর্বল স্থানে আঘাত লেগেছে তাঁর। অতীত জীবনের এক ঘটনার স্মৃতি যেন অবশ করে দিচ্ছে তাঁকে। দেহটাকে একটু এলিয়ে দিতেন তিনি। তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বলতেন ঃ

—বড় গুরুতর প্রশ্ন করলে নীরদ, বড় গুরুতর প্রশ্ন।

"এখানে নিজের কাছে নিজের পরাজিত হবার একটা বিষণ্ণ সুর যেন তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসতো তার পরমুহূর্তেই আত্মস্থ হয়ে তিনি বলতেন ঃ

—পিতার কাছ থেকে হয়ত এর একই জবাব সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমি সাংসারিক লোক। নিজের ভালমন্দ ওজন করে বুঝতে পারি—আর সেই অনুসারে চলতেও পারি।...

"নিজের অবদমিত মনকে প্রশ্রয় না দিয়ে সচেতন মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি যে সংসার পথে চলতে সক্ষম—এই দৃঢ় মনোভাবই আবার তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। এভাবে সামান্য কয়েকটি মুহূর্তের ব্যবধানে মনের একটি ভাবকে গৌণ করে আর একটি ভাবকে তিনি মুখ্য করতেন। অভিনয়ে ভাববৈপরীত্যের এমন অপূর্ব সমাবেশ অন্য কোন শিল্পীতে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

"রায় বাহাদুর শশাঙ্ক চাটুয্যে যেদিন জানতে পারলেন তাঁর বড় মেয়ে বিধবা আভা ভগ্নীপতি নরেশের দ্বারা সন্তানসম্ভবা হয়েছে তখন তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো ঃ

ইম্পশিবল্! ইম্পশিবল্ এই ক্রিয়েশন! হা জগদীশ্বর! না, এখানে ঈশ্বর নেই, ধর্ম নেই, পাপপুণ্য নেই! উঃ, গা জ্বালা করছে। সমস্ত শরীর জ্বালা করছে।

"উত্তেজিত অবস্থা থেকে শিশিরকুমার হঠাৎ অবসন্ন অবস্থায় চলে আসতেন এবং অসাড় দেহে বসে পড়তেন। তারপর খেদপূর্ণ কণ্ঠে বলতেন ঃ

অহো। মাই কাপ অফ্ মিসারি ইস্ ফুল্। আমার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে।

"আক্ষেপ নয়—অনুশোচনা। নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপে দগ্ধ হওয়া। স্বতোৎসারিত এই কথাগুলির মধ্যে যেন তাঁর আত্মার কান্না শুনতে পাওয়া যেত। আভার জন্যে যতো না কান্না তার চেয়ে বেশি কান্না তাঁর নিজের জন্যে। মনে হতো অন্তরের এক অব্যক্ত বেদনা যেন বাঙ্ময় হয়ে প্রকাশ পেতে চাচ্ছে। উপলক্ষ্যকে ছাড়িয়ে লক্ষ্যে চলে যাওয়ার এরূপ ক্ষমতা সমসাময়িক কালে একমাত্র শিশিরকুমারেরই ছিল।

"তার পর তিনি যখন বলতেন ঃ

বিপদটা কার হল? ওর না আর কারুর? আর একজন ত দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছেন! শিকারী—শিকারী!

"এখানে শিশিরকুমার 'শিকারী—শিকারী' শব্দ দুটি এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যার দ্বারা একটি পূর্ব চিত্রকল্প দর্শকদের চোখের সামনে ভেসে

উঠত। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষদিকে নরেশ বন্দুকের গুলিতে একটা সাদা পাখি শিকার করে। রক্তাক্ত সেই তুষার শুভ্র পাখিটাকে মঞ্চে এনে দেখানো হতো। বলা বাহুল্য, এই পাখি-শিকারকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। একদিকে নরেশ চরিত্রের নিষ্ঠুরতার দিকটি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেত, অপরদিকে পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাস পাওয়া যেত। নিষ্পাপ আভা নরেশের শিকারে পরিণত হয়েছে। রক্তাপ্লুত সাদা পাখিটির কথা স্মরণ করে শ্বেতবসনা বিধবা আভার দুর্দশার চিত্রটি দর্শকদের চোখের সামনে ভেসে উঠতো। 'শিকারী—শিকারী' মাত্র দুটি কথার উচ্চারণের দ্বারা শিশিরকুমার নাটকের ঘটনা পারম্পর্যকে এমনভাবে তুলে ধরতেন যে দর্শকগণ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে যেতেন। পাখি শিকারের এই দৃশ্যটি শেখভ-এর 'দি সী-গাল' নাটকের সেই রক্তাপ্লুত সাগর-বিহঙ্গীর দৃশ্যটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিশিরকুমার এভাবে দর্শকদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করতেন।

"শশাঙ্ক চরিত্রে শিশিরকুমারের অভিনয় চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতো শেষ দৃশ্যে। ভেতর থেকে গুলির শব্দ এলো। ডাঃ আলি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

গুলি ছুঁড়ল কে ?

শশাঙ্ক স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলেন ঃ

আভা

আলি—আভা ?

নরেশ—কেন ?

শশাঙ্ক টেনে টেনে কথাগুলো বললেন ঃ

কারণ—গুলি—দিয়ে—সে—নিজেকেই—শেষ—করে—দিয়েছে।

"শিশিরকুমার এখানে টেনে টেনে সংযত কণ্ঠে কথাগুলি বলতেন যাতে মনে হতো তিনি অন্তরের বেদনাকে চেপে রাখবার চেষ্টা কচ্ছেন। আত্মহত্যা করা ছাড়া আভার কোনো উপায় ছিল না—যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে—এই ভাবটাকে তিনি প্রকাশ করতেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর ব্যথিত হৃদয়টি যেন হাহাকার করে উঠতো। আলি যখন শশাঙ্ককে অভিযোগ করে বলে ঃ

আপনি নিজে তাকে গুলি করেছেন। নিশ্চয় করেছেন। আপনি সব পারেন।

"শশাঙ্ক তখন অপরাধীর মত বলে ওঠে ঃ

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সব পারি। সব পারি! তবু—তবু—সেই নিজেকে নিজে গুলি করেছে। নিজ হাতেই আত্মহত্যা করেছে।

"এ সময় শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে আসত। সমাজবিধান ও অপত্যস্নেহের দ্বন্দ্বে বড় অসহায় মনে হত তাঁকে। কোমলতার প্রবাহে এখানে শশাঙ্ক চরিত্রের কাঠিন্য যেন ভেসে যেত। তাই তাঁর এই অন্তস্তল থেকে উৎসারিত হত :

আমি কি কাঁদছি, না—আমি কি কাঁদছি, না—আমি কি কাঁদছি, না—

"নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলতেন :

এই দ্যাখ, আমি কাঁদছি না। কিন্তু আমার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এইবার একটা স্বীকারোক্তি করবার সময় এসেছে।

"এতকাল যে-সত্যকে গোপন রেখে ভেতরে ভেতরে শশাঙ্ক দগ্ধ হচ্ছিলেন, নির্মম হলেও এবার সেই সত্যকে স্বীকার করবার জন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন। সমাজ, শাস্ত্র তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। জীবন সত্যকে গ্রহণ করবার জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে উঠলেন। নিজের ঔরসজাত পুত্র ডাঃ আলির কাছে তার জন্মবৃত্তান্ত বলে মনের গুরুভার লাঘব করলেন।

"এত বড় একটা বিষাদপূর্ণ অবস্থায়ও শিশিরকুমার এখানে এমনভাবে বাক্যবিন্যাস করতেন যা শুনে মনে হত এক একটা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা একটা করে জগদ্দল পাষাণ যেন তাঁর মন থেকে নেমে যাচ্ছে।

"নিজের জন্মবৃত্তান্ত শোনার পর ডাঃ আলি যখন সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছে তখন শশাঙ্কর অপত্যস্নেহের পরম প্রকাশ হত শিশিরকুমারের কণ্ঠে ও অভিব্যক্তিতে। সমস্ত সংস্কারমুক্ত হয়ে শশাঙ্ক সস্নেহ আবেদন জানাচ্ছেন :

আমার ত ছেলে নেই। তুমি ত আমার একমাত্র পুত্র। আমার ঘরে ফিরে এস।

"এই আবেদনে থাকত আন্তরিকতা, অধীরতা প্রকাশ পেত না। সংস্কার-মুক্ত, লব্ধসত্য শশাঙ্কের ধীর স্থির মূর্তিটিকেই শিশিরকুমার এখানে রূপায়িত করতেন। বাৎসল্যরস প্রকাশের জন্যে বাচনে বা অভিব্যক্তিতে আতিশয্য এনে মেলোড্রামার পর্যায়ে নিয়ে যেতেন না। তার ফলে চরিত্রের অন্তরের উপলব্ধিটি বাহ্যপ্রকাশের দ্বারা লঘু না হয়ে অন্তর্মুখীনতার দ্বারা আরো বেশি

মর্মস্পর্শী হয়ে উঠত। শিশিরকুমার যে কত বড় সংযমী অভিনেতা ছিলেন, তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'পরিচয়' নাটকের শেষ দৃশ্যে।

"'পরিচয়'-এ শিশিরকুমারের মঞ্চাবস্থান খুব বেশি সময়ের জন্যে ছিল না। কিন্তু সেই স্বল্প পরিসরে একটি জটিল চরিত্রে শিশিরকুমারের অপূর্ব অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে সেই স্মৃতি চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।"

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই শিশিরকুমারের মাতৃবিয়োগ হল। 'সীতা' নাটকের উদ্বোধন লগ্নে মঞ্চে প্রবেশ করবার পূর্বে শিশিরকুমার সর্বাগ্রে তাঁর জননীকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। মাতাই ছিলেন তাঁর বৃহৎ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ।

Russian Cultural Mission-এর ডেলিগেটরূপে বিশ্বের অন্যমত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক পুডোভকিন ও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতা তখন ভারত পরিভ্রমণ করছেন। কলকাতায় এসে তাঁরা ১৭ই জানুয়ারী শ্রীরঙ্গমে 'ষোড়শী' নাটকের অভিনয় দেখলেন। 'জীবানন্দ'র ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে তাঁরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হলেন। অভিনয় শেষে সাজঘরে গিয়ে তাঁরা শিশিরকুমারকে অভিনন্দন জানালেন।

পুডোভকিন বললেন :

"You are a great artiste. Do you know why you are great? The moment you come on the stage you capture the attention of the audience. Then while you are establishing the character you portray they relax somewhat after the first attraction. As the play proceeds, however, your every gesture and intonation strike at them. After a while they loose all sense of individuality and personal preferences. They become completely fascinated as it were and then, like some master magician, you can present them with any character you choose to depict and they will accept it as completely authentic."

চেরকাসভ বললেন :

"you are a great actor. Your acting is just in the line of our acting that is realism. You captivated us when speaking. You

are as great an actor, as Stanislavsky of Moscow Art Theatre. We found in your acting, the character in person before us. Your acting is great and details are marvellous. We are charmed with your acting. You are a Master."

চেরকাসভ আরও বললেন, আশ্চর্য, আপনার মত একজন শিল্পী এই নাট্যশালায় এই পরিবেশে অভিনয় করছেন !

শিশিরকুমার মাননীয় অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং চেরকাসভের শেষ কথার উত্তরে বললেন ঃ

"The people of my country are fond of me, and it is their affection and sympathy that have kept me and my theatre going. You are probably aware of the great poverty that prevails in our country. This poverty is reflected in the poverty of my own theatre. In your country the State will lend support to the stage whenever necessary. That is not the case here. A theatre in this country must stand on its own feet."

১০ই মে মঞ্চস্থ হল প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'তখৎ-এ-তাউস'।

অধুনালুপ্ত 'ভগ্নদূত' পত্রিকায় (১লা জুন, ১৯৫১) এই নাটক ও অভিনয়ের সমালোচনা করেছিলেন অভিনয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী। সেই সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

"গত ২৬শে বৈশাখ (বাংলা ১৩৫৮ সাল--গ্রন্থকার) থেকে 'শ্রীরঙ্গম্' মঞ্চে শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী রচিত একটি নতুন ঐতিহাসিক নাটক খোলা হয়েছে। নাটকটির প্রয়োগকর্তা নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, এবং স্বয়ং তিনি নাটকের নায়ক জাহান্দার শা-র ভূমিকায় অবতীর্ণ। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন— জুলফিকর খাঁ ঃ মুরারীমোহন ভাদুড়ী, আসাদ্ খাঁ ঃ রাজকুমার মল্লিক, কোকলতাস খাঁ ঃ বিজয় দত্ত, সভাচাঁদ ঃ সত্যেন গোস্বামী, সাদুল্লা খাঁ ঃ বিনয় মিত্র, নিয়ামৎ খাঁ ঃ মণি শ্রীমানি, আজুদ্দিন ঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ইজুদ্দিন ঃ অনুপকুমার দাস, ফারুখশায়ার ঃ বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়, জিন্নৎউন্নিসা ঃ শ্রীমতী রেবা, ইমতিয়াজ মহল (লালকুঁয়ার) ঃ শ্রীমতী ঝর্ণা প্রভৃতি। নাটকে গানের সুর দিয়েছেন চিত্ত রায়, নাচের ভঙ্গী রচনা করেছেন ব্রজবল্লভ পাল, পট পরিকল্পনা করেছেন সুবোধকুমার ঘোষ।

"'তখৎ-এ-তাউস' (আরবি এবং ফার্সি ভাষায় ঠিক উচ্চারণ হচ্ছে… তখৎ-এ-তাউস—'চলন্তিকা' ষষ্ঠ সংস্করণ, ২৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য) নাটকের কথা বলতে গেলে প্রথমেই একটি অতি অপ্রিয় মন্তব্য দিয়ে শুরু করতে হয়,—বাংলা-সাহিত্যে নাটকের দারিদ্র্যই শোচনীয়। ঐতিহাসিক নাটকের বেলায় সে-দারিদ্র্য শোচনীয়তম। গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে এযাবৎ যতোগুলি ঐতিহাসিক নাটক বাংলায় রচিত হয়েছে সেগুলোর প্রায় সব কটিই নাটক হয়ে ওঠে নি। হয়েছে কতকগুলো ঐতিহাসিক ঘটনার পূর্বাপর দৃশ্যপরিচয় মাত্র। তাতে ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক ব্যক্তির ভিড় আছে, কাহিনী বর্ণনামূলক সংলাপ আছে, নাচ আছে, গান আছে, বীররস আছে, করুণরস আছে আর সর্বোপরি আছে স্থানে-অস্থানে সস্তা হাততালি মার্কা বক্তৃতা। এক কথায় বিবাহের আয়োজনে বরযাত্রী আছে, কন্যাযাত্রী আছে, দানসজ্জা আছে, লুচি মণ্ডা মিঠাই আছে,…নেই শুধু বর আর কন্যা। যে চরিত্রের সংঘাতে নাটকীয় দ্বন্দ্বের বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, বাংলা নাটকে সে চরিত্রের সাক্ষাৎ কোথাও পাওয়া যায় না। গিরিশ ঘোষের সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিমে ভালো ভালো কথা আছে, নাটকীয় কথা কিছুই নেই, দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্তে' 'সাজাহানে', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্যে' নাট্যকার যুগের প্রয়োজনের ব্যপদেশে নিজের প্রয়োজনেই এমন সব দৃশ্যের অবতারণা পর্যন্ত করেছেন যা নাটকের পক্ষে রসাভাসী তো বটেই, এমন কি তা বাস্তব সত্যেরই বিরোধী। টেকনিকের দিক থেকে আরো অগ্রগামী আধুনিক ঐতিহাসিক বাংলা নাটকেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। শচীন সেনগুপ্তের অতি খ্যাত 'সিরাজদ্দৌলা' গীতাভিনয় পুস্তকের মার্জিত সংস্করণ মাত্র, সিরাজ সেখানে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বক্তা, মহেন্দ্র গুপ্তের 'টিপু সুলতান', 'মহারাজা নন্দকুমার' সংলাপমূলক ঐতিহাসিক ঘটনামাত্র। ঐতিহাসিক নাটকের এই বিরস মরুভূমির মধ্যে একটিমাত্র মরূদ্যানই আমার চোখে পড়েছিল; সেটি হচ্ছে যোগেশ চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটক। ওটি বাংলা দিগ্বিজয়ী ঐতিহাসিক নাটকও বটে। ওতে শুধু ঐতিহাসিক ব্যক্তিরই ভিড় নেই, নানা সংঘাত বিকশিত হতে হতে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে হয়ে উঠেছে নাটকীয় চরিত্র। 'দিগ্বিজয়ী'তে অযথা বক্তৃতা নেই, বাঙালী নাট্যকারসুলভ ভাবাবেগের বিলাস নেই, নেই play-র সস্তা প্যাঁচ, আছে drama-র হীরকদ্যুতি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'তখৎ-এ-তাউস' দেখে মনে

হলো…'দিগ্বিজয়ীর' পাশে এটিকেও স্বচ্ছন্দে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কেন পারে, তাই সংক্ষেপে বলছি।

"ঐতিহাসিক নাটকে নাট্যকার কেবল ইতিহাসই বর্ণনা করেন না, কিংবা অতি দীর্ঘকালব্যাপী ঘটনাও সে নাটকের বিষয়বস্তু হয় না, অন্তত আধুনিক যুগের নাটকে তো নয়ই। কারণ মানুষের জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে অল্প সময়ের মধ্যেই। রয়ে বসে অনেকদিন ধরে যা ঘটে তা মহাকাব্য বা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে, নাটকের নয়। নাটক ঝড়ের মত। আসবার পূর্বে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায় কালো মেঘে, বিদ্যুৎ-চমক জানিয়ে দিয়ে যায় ঝড়ের সংকেত, স্তম্ভিত পৃথিবী ভীত-ত্রস্ত-বিস্মিত হয়ে ওঠে, দেখতে দেখতে আসে ঝড়, চারিদিকে শুরু হয় ঝড়ের মাতামাতি, তারপর হঠাৎ যখন ঝড় থেমে যায়, দেখি ভগ্ন শাখা, ভগ্ন পালক, ভগ্ন গৃহ আর ভগ্ন হৃদয়। অর্থাৎ নাটকের মূল সূত্র থাকে একটি। চরিত্র সেই মূল সূত্রকে ঘিরেই আবর্তিত হয়, আর সেই আবর্তনের ফলেই ঘটে কাহিনীর জন্ম। নাটকীয়-চরিত্র কাহিনীর অনুসরণ করে না, কাহিনীই চরিত্রের অনুসরণ করে। বাংলা নাটকে এই সূত্রেরই অভাব। 'শাজাহানে' কী বলতে চেয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল? ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' কোন্ সূত্রকে অবলম্বন করে দানা বেঁধে উঠেছে? অথচ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলো দেখুন। উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে নেমে এসেছে 'ম্যাকবেথের' ট্র্যাজেডি, অন্ধ স্নেহ 'কিংলিয়রের' কণ্ঠে তুলেছে করুণ মৃত্যু বেদনার অরুন্তুদ আর্তনাদ, প্রিয়া-প্রেমের অবিশ্বাস 'ওথেলো'কে করেছে অশ্রুসজল, নিজেকে বোঝা না বোঝার দ্বন্দ্বে ডেনমার্কের যুবরাজের জীবনে অকালে পড়েছে দীর্ঘশ্বাসে ভরা মৃত্যুর ধূসর যবনিকা। এই হিসেবে 'তখৎ-এ-তাউস'-এর মূল সূত্র হচ্ছে তখৎ-এ-তাউস—অভিশপ্ত ময়ূর সিংহাসন। জীর্ণ মুঘল সাম্রাজ্য, ভাঙতে শুরু হয়েছে, তারি মধ্যে আলমগীর বাদশার নাতি, বাহাদুর শার পুত্র জাহান্দার শা বসেছেন সেই তখতে, এক অখ্যাত নাচওয়ালী লালকুঁয়ারকে দিয়েছেন ইমতিয়াজ মহল নামে প্রধানা বেগমের মর্যাদা, আর সেই মর্যাদাই মুঘল আভিজাত্যের সংঘর্ষে উদ্গীরিত করতে লাগল ষড়যন্ত্রের স্ফুলিঙ্গ, এবং শেষ পর্যন্ত তারই শিখায় পুড়ে মরতে হল জাহান্দার শাকে। জাহান্দারের রাজত্বকালের মতই নাটকের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। দৃশ্যাবলীও বাহুল্যবর্জিত। অন্তত প্রথম অঙ্কটি তো বটেই। দেওয়ান ই-খাস আর জিন্নৎউন্নিসার মহল—প্রথম অঙ্কের প্রায় সবগুলি দৃশ্যই

ঘটেছে এই দুটি স্থানকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয় অঙ্কটি যুদ্ধক্ষেত্রের একটি তাঁবু, তৃতীয় অঙ্কে পথ, আসাদখাঁর বাড়ি আর জাহান্দারের প্রতিদ্বন্দ্বী ফারুক-শায়ারের তাঁবু—এই বাড়তি তিনটি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। গ্রীক নাটকের মত ইউনিটি অফ প্লট-এর সঙ্গে ইউনিটি অফ প্লেস এ্যাণ্ড টাইম-এর অত্যাশ্চর্য মিলন না ঘটলেও তখৎ-এ-তাউসে স্থান এবং কালের ব্যাপ্তি অনেক-খানি সংহত। আলোচ্য নাটকের পক্ষে এইটিই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দ্বিতীয়ত এই নাটকের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্রটির পরিস্ফুটন এতো চমৎকার হয়েছে যে, পূর্বোক্ত 'দিগ্বিজয়ী'র 'নাদিরশা' চরিত্র ভিন্ন এমন সার্থক নাটকীয় চরিত্র আর কোন বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে সৃষ্ট হয় নি। তথাপি নাটকের কিছু দোষ থেকে গেছে। নাটকের প্রথম অঙ্কটি অনবদ্য, নিখুঁত। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্ক আর প্রথম অঙ্কের মধ্যে সংলগ্নতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফারুকশায়ারের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা যেন আকস্মিক ভাবে উপস্থিত হয়েছে, প্রথম অঙ্কে তার কোন প্রস্তুতিই দেখতে পাই নে। তৃতীয় অঙ্কের বাঁধুনি আর একটু সংযত হলে ভাল হত। তবে নাটকের শেষ দৃশ্যটি ভা-রি সুন্দর হয়েছে। এমন সংযমের মধ্যে এত বড় ট্র্যাজেডির যবনিকাপাত যিনি করতে পারেন তিনি শক্তিমান সন্দেহ নেই।

"নাটকের দৃশ্যপট প্রশংসা পাবার যোগ্য। দেওয়ান-ই-খাসে এবং জিন্নৎউন্নিসার মহলে মুঘল স্থাপত্যের নিদর্শন পটপরিকল্পকের কৃতিত্বের পরিচায়ক।...

"অভিনয়ে শিশিরকুমারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু 'জাহান্দার'-এর রূপায়ন সম্বন্ধে এইটেই বড় কথা নয়। জাহান্দারের অভিনয় দেখে মনে হল—শিশিরকুমার আবার তাঁর যৌবন ফিরে পেয়েছেন। যাঁরা বলেন প্রতিভার সীমা আছে, বার্ধক্যে তা অপরাহ্ন-সূর্যের মতই নিষ্প্রভতর হতে থাকে, তাঁরা এসে শিশিরকুমারের জাহান্দার শা দেখে যান,—মত বদলাতে বাধ্য হবেন। প্রায় দু-যুগ আগে নাট্যমন্দিরে 'নাদির শা-রূপী যে শক্তিমান বলিষ্ঠ শিশিরকুমারকে দেখেছি, তিনিই কি নবরূপে উজ্জীবিত হলেন জাহান্দার শা-তে—এ কথা বার বার মনে হয়েছে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে। নাদির শার চরিত্র আর জাহান্দারের চরিত্র দুটি আলাদা রূপের হলেও—জাহান্দারে যেন নাদিরশার কিছু কিছু ছাপ দেখতে পেয়েছি। জাহান্দারকে হত্যা করবার সময়ে শিশিরকুমার সংক্ষিপ্ত দু একটি শব্দ

উচ্চারণের সঙ্গে যে আশ্চর্য অভিনয় করেন তেমন অভিনয় ইতিপূর্বে তিনিও করেছেন কি না সন্দেহ। আর চরিত্র বিশ্লেষণী অভিনয়ে তো তিনিই একমাত্র অভিনেতা। অপদার্থ অযোগ্য হলেও মুঘল বাদশাই। তার রূপ কি হতে পারে জাহান্দার শার রূপায়ণে শিশিরকুমার তাই দেখিয়েছেন।"

১০ই ডিসেম্বর সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের ত্রিশ বছর পূর্ণ হল। ত্রিশ বছর আগে (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে) ঠিক এই দিনে ম্যাডান থিয়েটারে 'আলমগীর' নাটকের নাম ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। "তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল তিনি একান্ত ভাবে নাট্যসেবা করে এসেছেন। শিশিরকুমারের নাট্যসেবার ইতিহাস ব্যক্তির ইতিহাস নয়, একটা যুগের ইতিহাস, কারণ নাট্যক্ষেত্রে তিনি যুগপ্রবর্তক। উত্থান-পতন, ব্যর্থতা-সাফল্য সব কিছুর মধ্য দিয়েই তাঁকে আসতে হয়েছে, কিন্তু তিনি সর্ববরেণ্য এজন্যে যে কখনো সাময়িক পতন তাঁর উত্থানের পথ রোধ করে নি, ব্যর্থতা কখনো তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে নি। নিন্দা-স্তুতি সমজ্ঞানে তিনি আজীবন শিল্পীর ন্যায় সংগ্রাম করে এসেছেন, নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন,—এজন্যেই শিল্পী হিসাবে তিনি মহৎ, নাট্যজগতে নমস্য। নাট্যকলার অধোগতি রোধের জন্যে তিনি যে অক্লান্ত শ্রম করেছেন, এযুগে নাট্যসেবীদের অবশ্যই তা প্রেরণা যোগাবে। পরাধীন দেশে, অনগ্রসর দেশে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে তাঁকে একাই সংগ্রাম করতে হয়েছে। যে কোন স্বাধীন দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করলে তাঁর অসাধারণ শিল্প প্রতিভার সমাদর যে বহুগুণ বেশি হতো, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। প্রতিভার প্রকৃত সমাদর আমাদের দেশে আজও হয় না—একথা অপ্রিয় হলেও সত্য। সুতরাং সময় সময় যে অনাদর, ঔদাসীন্য দেশবাসীর কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন বা পাচ্ছেন সেটা ব্যতিক্রম নয়, এই সামাজিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়ম; কারণ, এই পরিবেশে প্রতিভার যথার্থ সমাদর হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এদেশবাসী একদিন এরূপ ঔদাসীন্যই দেখিয়েছিল এবং তার জন্যে কবির বেদনা, ক্ষোভ ও অভিমানের অন্ত ছিল না।

যে দুর্ভাগা দেশে আজও শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর, অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সে দেশে শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকের এই তো কদর হবে। আঘাত ছিল, বেদনা ছিল, অতৃপ্তি ছিল, তবুও রবীন্দ্রনাথ যেমন আজীবন নিরলসভাবে

বঙ্গসাহিত্য-জননীর সেবা করে গিয়েছেন, আমরা জানি শিশিরকুমারও তেমনি অনাদর, উপেক্ষা, আঘাত, সংঘাত কোন কিছুতে জ্রক্ষেপ না করে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্যকলাদেবীর সেবা করে এসেছেন। তাই তিনি আমাদের প্রণম্য।"*

আজ ত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তিনি তাঁর সহকর্মী, সুহৃদ ও অনুরাগীদের শ্রীরঙ্গমে আমন্ত্রণ করে এনেছেন। তাঁদের 'আলমগীর' নাট্যাভিনয়ের দ্বারা আপ্যায়িত করবেন। অভিনয়ের আগে তিনি তাঁর সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত করেন। তিনি এটাকে বিবৃতি না বলে বললেন কৈফিয়ত। শিশিরকুমার দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণের উপসংহারে তিনি বলেন: "থিয়েটার চালাতে গেলে টাকা চাই, নিজস্ব বাড়ি চাই। কেবল মাত্র বেতন দিয়ে যেমন বিদ্যালয় ভালোভাবে চলে না, তেমনি টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়েও থিয়েটার ভালোভাবে চলতে পারে না। থিয়েটার সমস্ত চারুশিল্পের মিলনকেন্দ্র—জাতির সাংস্কৃতিক দর্পণ, সুতরাং থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে জাতিরই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিদেশের বড় বড় থিয়েটার রাজশক্তির সহায়তায় গড়ে উঠেছে—কিন্তু এদেশের সরকার থিয়েটার সম্বন্ধে উদাসীন। আজ চাই জীবনে বিশ্বাসী, সংগ্রামে বিশ্বাসী নায়ক নিয়ে লেখা নতুন নাটক। যোগেশের মতন একটুতেই ভেঙে পড়ে, সুদিনে জমিদার সরকারে দেড়শত টাকা মাইনে পেয়েও পিতা কন্যার মৃত্যু কামনা করে, এমন সংগ্রামবিমুখ নৈরাশ্যবাদী নায়কের প্রয়োজন আজ নেই। সংগ্রাম করে যে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাকেই এ যুগে নাটকের নায়করূপে চিত্রিত করতে হবে।

"যাত্রা থেকে যদি আমাদের থিয়েটার গড়ে উঠতো তবে আজ তার রূপ হত অন্যরকম; তা সত্যি হয়তো আমাদের জাতীয় নাট্যশালা হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু এ থিয়েটার গড়ে উঠেছে বিদেশীর প্রভাবে। যাই হোক, যা গড়ে উঠেছে তাকে ফেরাবার উপায় হয়তো নেই। আমি চেয়েছিলাম জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তুলতে, কিন্তু তা পারি নি। আমার পক্ষে যা

* শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'নাট্যলোক' (১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৮) পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত।

সম্ভব হয় নি, এ যুগের লোক তা সম্ভব করে তুলুক, এই আমার একান্ত অভিলাষ।"*

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে পুলিটজার পুরস্কার বিজয়ী বিখ্যাত আমেরিকান নাট্যকার পল্ এলিয়ট গ্রীণ কলকাতায় এসে শিশিরকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অভিনয়, নাটক, মঞ্চ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নিয়ে তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। শিশিরকুমারের গভীর পাণ্ডিত্যে ও প্রখর ব্যক্তিত্বে পল এলিয়ট গ্রীণ অভিভূত হন। পরে 'আমেরিকান রিপোর্টার' কাগজে (১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫১) এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি পরিবেশিত হয়ঃ—

"Mr. Green said after the meeting that he was highly impressed by the 'inspiring personality' of Mr. Sisir Kumar Bhadury and thought 'he symbolizes the hope of future India'."

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৩রা জানুয়ারী অভিনীত হল তারাকুমার মুখোপাধ্যায়-রচিত 'প্রশ্ন'। এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীপরিমল গোস্বামী লিখেছেনঃ "আধুনিক কালে আধুনিক বিষয়বস্তু নিয়ে পুরাতন নাট্যরীতিকে অনুসরণ না করে আধুনিক নাটক কি করে অভিনীত হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে এতে।"

ভূমিকালিপিঃ-নীতীন্দ্র—শিশিরকুমার, বর্মণ—মুরারী মোহন ভাদুড়ী, সুকুমার—অমল ঘোষ, প্রমথ—রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিমল—বিনয় বসু, প্রশান্ত—অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধব—সুধীর দে, চঞ্চল—কুমারী ভারতী, মণিকা- সরযূবালা, অনঙ্গমোহিনী—লীলা, সুরুচি—রেখা।

এর পর শ্রীরঙ্গমে আর কোন নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয় নি।

শিশিরকুমারের প্রযোজনায় আর যে সব পালা মঞ্চস্থ হয়েছিল সেগুলি হচ্ছেঃ

পুনর্জন্ম, রাধাকৃষ্ণ, শিবরাত্রি, আগমনী, জন্মাষ্টমী, আলিবাবা, আবুহোসেন, কুঞ্জ-দরজী, হারানো রতন, ভিখারীর মেয়ে, জয়দেব, তুলসীদাস।

---

* এই ভাষণটির নোট গ্রহণ করেছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁ 'নাট্যলোক' পত্রিকায় (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫১) প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সব পালায় তিনি অভিনয় করেন নি।

পুরাতন নাটকে যে-কটি নূতন ভূমিকায় শ্রীরঙ্গমে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেগুলির নাম করি ঃ

'জনা'য় বিদূষক, অমৃতলালের 'খাসদখল'-এ নিতাই, 'মন্ত্রশক্তি'-তে রমাবল্লভ, 'চন্দ্রশেখর'-এ লরেন্স ফস্টর, 'চিরকুমার সভা'তে রসিক।

আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'সাজাহান' নাটকে একসঙ্গে সাজাহান ও ঔরংজীব ও 'আলমগীর' নাটকে একসঙ্গে 'আলমগীর'ও 'রাজসিংহ' রূপে অভিনয় করেছিলেন। শেষ দৃশ্যে তিনি 'সাজাহান' ও 'আলমগীর'রূপে আর অন্য অভিনেতা 'ঔরংজেব' ও 'রাজসিংহ'রূপে অভিনয় করতেন। এরকম বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় বাংলা মঞ্চে আর কোনো অভিনেতা দেখাতে পারেন নি।

এখানে একটি বিষয়ের অবতারণা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেটি 'চিরকুমার সভা' প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' (প্রথম স্বতন্ত্র সংস্করণ ১৩১৪ সালে প্রকাশিত) উপন্যাসের নাট্যরূপ 'চিরকুমার সভা' ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। কবি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসটিকে কী উদ্দেশ্যে পুনর্লিখন করে 'চিরকুমার সভা' নাটকে পরিণত করলেন সেই সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম ensemble acting পদ্ধতিতে 'সীতা' নাটক রূপায়িত করলেন। এই ensemble acting জার্মানীর মিনিন্‌জেন্ নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক আবিষ্কৃত। পরবর্তীকালে মস্কো আর্ট থিয়েটারে চেকভের নাটকগুলিতে এর সার্থক প্রয়োগ করেন স্ট্যানিস্লাভস্কি। রবীন্দ্রনাথও এই পদ্ধতিতেই তাঁর নাটক প্রযোজনা করে গেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা ভবন'-এ কবির 'ডাকঘর' প্রযোজনার কথা উল্লেখ করা যায়। নাটক হিসেবে 'সীতা' খুবই দুর্বল। কিন্তু ensemble acting দিয়ে শিশিরকুমার ওই দুর্বল নাটকটিকেও উতরে দিলেন। 'সীতা' নাট্যাভিনয়ে কবি শিশিরকুমারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। তিনি আশ্বস্ত হলেন যে তাঁর নাটক প্রযোজনা করার ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতাশালী অভিনেতার। তার ফলে কবি যে-কটি

নাটক শিশিরকুমারের অভিনয়ের উপযোগী করে প্রস্তুত করে দেন, 'চিরকুমার সভা' তার মধ্যে প্রথম।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে 'ভারতী'-সম্পাদক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ১৩৩১ সালের ১২ই ভাদ্র তারিখের চিঠিটি উপস্থাপিত করছি :—

কল্যাণীয়েষু—

কাগজে নিজের জবানীতে অভিনয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তুমি লিখে দিতে পার যে শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি। সীতা বইটিকে আমি একটুও পছন্দ করি নে—ওটা নাটকই নয়—এই জন্যই এ নাটক অবলম্বন করে অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখানো কঠিন—তৎসত্ত্বেও শিশিরবাবু নিজের ক্ষমতার জোরে এ বইটিকেও চালিয়ে দিতে পেরেচেন। তুমি আমার কাছ থেকে এ সব কথা শুনেচ বলে লিখতে পার। ইতি ১২ই ভাদ্র ১৩৩১

রবিদাদা

ওপরের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যে 'দুই একটা নাটক অভিনয়ের ভার' শিশির-কুমারের হাতে দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে 'চিরকুমার সভা' আর 'রক্তকরবী'।

এর সমর্থনে উদ্ধৃত করছি তৎকালীন 'নাচঘর' (১৩৩১ সাল, ১৩ই ভাদ্র, ১৭শ সংখ্যা) পত্রিকা কর্তৃক পরিবেশিত একটি সংবাদের কিয়দংশ :—

" 'মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে' শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রচনা 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় হবে। সকলেই জানেন, 'চিরকুমার সভা' এতদিন আধা-উপন্যাস ও আধা-নাটকের আকারে বর্তমান ছিল। কিন্তু শিশিরকুমারের অভিনয়ের সুবিধের জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাকে পুরাদস্তুর নাটকে পরিণত করেছেন এবং সেজন্যে 'চিরকুমার সভা'র মধ্যে যে আবশ্যক মত পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে সে কথা বলা বাহুল্য।

"রসিক সমাজকে আজ আমরা আর একটি আনন্দ-সংবাদ দিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগ্রহে শিশিরকুমার তাঁর নূতন ও অপূর্ব নাটক 'রক্তকরবী' অভিনয় করবার অধিকার পেয়েছেন। নাটকখানি শীঘ্রই 'প্রবাসী'র পত্রে আত্মপ্রকাশ করবে,…"

সুতরাং নাচঘরের উক্ত সংবাদটি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে :—

(১) কবি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসটিকে 'চিরকুমার সভা'য় পরিণত করে দিয়েছিলেন শিশিরকুমারের জন্যেই।

(২) কবি এই নাটকের অভিনয়ের ভার এবং নাটকের পাণ্ডুলিপিটি শিশিরকুমারের হস্তেই অর্পণ করেছিলেন।

(৩) ১৩৩১ সালের ১২ই ভাদ্রের পূর্বে নাটকটির রচনা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছিল, কেননা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির তারিখ ১২ই ভাদ্র আর 'নাচঘর' পত্রিকার পরিবেশিত সংবাদটি ১৩ই ভাদ্র তারিখের।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদিও 'নাট্যমন্দির'-এ অভিনয়ের জন্যে 'চিরকুমার সভা'র পাণ্ডুলিপি কবি শিশিরকুমারের হস্তেই অর্পণ করেছিলেন তবুও নাটকটি শেষ পর্যন্ত স্টার রঙ্গমঞ্চে 'আর্ট থিয়েটার' কর্তৃক সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ (প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮ই জুলাই, ১৯২৫) হয়েছিল কেন?

এ প্রশ্নের আমরা উত্তর পাই স্বর্গীয় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার' গ্রন্থে। ওই গ্রন্থে (পৃঃ ৭৪-৭৫) তিনি লিখেছেন :—

"'সীতা' নাট্যাভিনয়ে শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুসি হয়ে তাঁর উপরেই 'চিরকুমার সভা' অভিনয় করবার ভার দেন। 'চিরকুমার সভা' প্রথমে একটি ধারাবাহিক নাটকীয় কাহিনীরূপে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও যে তার উপযোগিতা আছে, শিশিরকুমারের আগে বাংলা রঙ্গালয়ের আর কোন ব্যক্তি এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে কাহিনীটিকে রঙ্গালয়ের উপযোগী করে দিলেন। 'চিরকুমার সভা'র অভিনয়ের আয়োজন হতে লাগল। কিন্তু মুস্কিল হল অক্ষয়ের ভূমিকাটি নিয়ে। ঐ ভূমিকার গ্রাহককে এক সঙ্গে হতে হবে ভালো গায়ক ও ভালো অভিনেতা। কিন্তু সে-রকম গুণী শিল্পী মনোমোহন নাট্যমন্দিরে কেউ ছিলেন না। ঐ শ্রেণীর একজন শিল্পীর সন্ধান পাওয়া গেল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে। তিনি একদিন রঙ্গালয়ে এলেনও বটে, কিন্তু তারপরই অদৃশ্য হলেন। কারণ নাকি অভিভাবকদের অসম্মতি। ফলে 'চিরকুমার সভা' কয়েক মাসের মধ্যে পাদপ্রদীপের আলোকে আত্মপ্রকাশ করতে পারল না এবং এই বিলম্বের সুযোগ গ্রহণ করলেন আর্ট সম্প্রদায়ের সেই সুচতুর কর্তৃপক্ষ, এর আগেই যাঁরা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' হরণ। 'চিরকুমার সভা'ও শিশিরকুমারের

হাতছাড়া হয়ে গেল। তবে ঐ পালাটির সঙ্গেও তাঁর স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। কারণ কয়েক বৎসর পরে ঐ আর্ট থিয়েটারেই তিনি চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন। 'চিরকুমার সভা'র পাণ্ডুলিপি শিশিরকুমারের হাতে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, পৌরাণিক চরিত্র অর্জুনকে নিয়ে তিনি তাঁর জন্যে একখানি নূতন নাটক রচনা করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নি।"

'চিরকুমার সভা' হাতছাড়া হবার কাহিনী সম্পর্কে স্বয়ং শিশিরকুমারের বিবৃতি পাই শ্রীরবি মিত্র ও শ্রীদেবকুমার বসুর 'শিশির সান্নিধ্যে' গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থ থেকে শিশিরকুমারের উক্তি উদ্ধৃত করছি :—

"রবীন্দ্রনাথ নাকি শারদোৎসব আর কি একটা বই করেছিলেন শান্তিনিকেতনে—রথীবাবু লিখেছেন, যা নাকি খুব ভালো হয়েছিল। রবিবাবুর প্রোডাকসনের মধ্যেও ভাল হয়েছিল ডাকঘর সিম্বলিক সেটিং-এর জন্যে, আর তাসের দেশ—অপেরা। এমনি নাটকে উনি স্বীকার করেছেন আমাদের প্রোডাকসনই ভালো হয়েছে। উনি আমার উপরেই ভার দিয়েছিলেন, অথচ ওঁর অফিসিয়াল বায়োগ্রাফিতে লেখা হচ্ছে, উনি নাকি অহীন্দ্রের জন্যে বই লিখেছেন। কোন্ বইটা লিখেছেন? উনি মণিলালকে চিঠি লিখছেন—আমি বাইরে যাচ্ছি, যাতে গোলমাল না হয় তাই শিশিরের ওপর প্রয়োগের ভার দিয়ে যাচ্ছি।*

"সে চিঠি নাচঘরে ছাপা হয়েছিল। অথচ বলেছে অহীন্দ্রের জন্যে লেখা হয়েছে। ও তো এক চিরকুমার সভাতেই নেবেছিল। ওই বইটাও কিন্তু

---

* কল্যাণীয়েষু,

মণিলাল, আমি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম, যে সীতা অভিনয়ের পর আমার নাম নিয়ে কোন কোন লোক শিশির ভাদুড়ীর নিন্দা রটনা করছে। যদি প্রয়োজন হয় তুমি জানাতে পার যে তাদের কারোর সঙ্গে আমার কোনও প্রকার আলাপ মাত্রই হয় নি—এবং শিশিরকে আমি ক্ষমতাশালী লোক বলেই জানি।

আমি শীঘ্রই বিদেশে যাচ্ছি—আশঙ্কা হচ্ছে আমার অনুপস্থিতিকালে এইরূপ মিথ্যা রটনা প্রশ্রয় পাবে। তোমার উপর ভার রইল তুমি এদের মিথ্যাচরণের প্রতিবাদ করবে। ইতি
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনি আমাকেই লিখে দিয়েছিলেন। তার প্রথম এডিশনের কাটা বইয়ে কাগজ মেরে রবিবাবুর হাতে লেখা কারেকশন, এতকাল আমার কাছেই ছিল, এখন এই নতুন বাড়ি বদলাতে গিয়ে হারিয়ে গেল। তপতীর কাটা কাগজ মেরে কারেকশন করা বইটা এখনও আছে।†

"চিরকুমার সভা স্টার থিয়েটারে অভিনীত হবারও একটা কাহিনী আছে। বইটা পাবার পর আমি অন্য বই অভিনয় করছি, সেই সময়ে প্রবোধচন্দ্র গিয়ে ওঁকে বললে, এই তো শিশিরবাবু এতদিন রেখে দিয়েছেন, এখন আবার অন্য বই করছেন। উনি করবেন না। কান পাতলা লোক ছিলেন তো, তখনি ওকে দিয়ে দিলেন।"

সেইজন্যই আর্ট থিয়েটার 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ করার প্রথম সুযোগ লাভ করে।

এখন দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের অফিসিয়াল বায়োগ্রাফিতে এই প্রসঙ্গে কী লেখা হয়েছে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'রবীন্দ্র-জীবনী'র তৃতীয় খণ্ডে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় ও রচনাকাল সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে সেটি উদ্ধৃত করছি ঃ—

"কলিকাতায় পাবলিক থিয়েটারে অহীন্দ্র চৌধুরী বিখ্যাত অভিনেতা; তিনি ও তাঁহার দল কবির নাটক অভিনয়ের কথা ভাবিতেছেন। সেই সংবাদ পাইয়া কবি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নূতন নাটকীয় রূপদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৩৩১ চৈত্র মাসের মধ্যে রচনা শেষ হয়। মূল প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসাকারে রচিত হইলেও নাটকীয় কথোপকথনে আদ্যন্ত পূর্ণ। সুতরাং ইহাকে অল্প চেষ্টাতেই নাটক করা সম্ভব হইল।"

শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার-প্রদত্ত এই তথ্য আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ পাবলিক থিয়েটারে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর কোন দিনই নিজের দল ছিল না। আজীবন তিনি কলকাতার বিভিন্ন পাবলিক থিয়েটারে বেতনভোগী অভিনেতা হিসেবে কাজ করে গেছেন। স্টার থিয়েটারেও তিনি আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের কর্তৃত্বাধীনে বেতনভোগী অভিনেতা ছিলেন। আর্ট থিয়েটারে তিনি প্রধান অভিনেতার পদেও আসীন ছিলেন না। আর্ট থিয়েটারে নাট্যাচার্য ছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সেক্রেটারী ছিলেন

† এই বইটি এখনও নাট্যাচার্যের পুত্র শ্রীঅশোক ভাদুড়ীর কাছে সংরক্ষিত আছে। বইটি দেখবার সৌভাগ্য লেখকের হয়েছে।

প্রবোধচন্দ্র গুহ। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর ও তাঁর দলের কবির নাটক অভিনয়ের কথা ভাবার সংবাদ পেয়ে কবি যে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নূতন নাটকীয় রূপদানে প্রবৃত্ত হন নি এ সম্বন্ধে আগেই যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ, 'চিরকুমার সভা' রচনা শেষ হয়েছিল '১৩৩১ সালের চৈত্র মাসের মধ্যে'র পরিবর্তে ১৩৩১ সালের ১২ই ভাদ্রের পূর্বে। এ সম্বন্ধেও প্রমাণের 'বল' চালনা করা হয়েছে।

শিশিরকুমার যাঁদের হাতে করে মানুষ করে বাংলা রঙ্গমঞ্চে শিল্পী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই সব প্রিয় শিষ্যশিষ্যারা একে একে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করছেন। চলে গেছেন ললিতমোহন লাহিড়ী, অমলেন্দু লাহিড়ী, নৃপেশ রায়, তুলসী বন্দোপাধ্যায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ, শৈলেন চৌধুরী ; বিদায় নিয়েছেন কঙ্কা।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর শ্রীমতী প্রভা পরলোক গমন করেন। পরদিন শ্রীরঙ্গমে শোকসভার অনুষ্ঠান করে শিশিরকুমার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন—'মঞ্চরাজ্ঞী'বলে অভিহিত করলেন তাঁকে।

শ্রীমতী প্রভার চরিত্র-সৃষ্টিমূলক অভিনয়ধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী তাঁর 'অভিনেতৃ আর অভিনয়' নামক প্রবন্ধে যা লিখেছেন তার কিছুটা এখানে তুলে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন : "…প্রভা কেবল জন্ম অভিনেত্রীই নহেন, তাঁহার প্রতিভার ইস্পাতে শান পড়িয়াছে শ্রেষ্ঠ রূপকর্মকারের হাতে। ১৯২১ সালে ম্যাডান কোম্পানীর 'বেঙ্গলি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' প্রতিষ্ঠানের 'আলমগীর' নাটকে 'রূপকুমারী' ভূমিকাতেই প্রথম তিনি সংলাপ সংবলিত চরিত্রাভিনয় করেন। অর্থাৎ শিশিরকুমারের কাছেই প্রথম তাঁহার প্রকৃত নটীজীবনের হাতে খড়ি। ইহার পূর্বে সম্ভবত তিনি ব্যালেটে কাজ করিয়াছেন, অখ্যাত দুই একটি ভূমিকাভিনয়ও করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু শ্রীমতী প্রভার অভিনয় সম্পর্কে তার ঐতিহাসিক মূল্য থাকিতে পারে, রস মূল্য কিছুই নাই। রূপকুমারীর পরে তিনি বিশেষ ভাবে দেখা দেন ১৯২৩ সালে ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে শিশির সম্প্রদায়েরই দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত 'সীতা' নাটকাভিনয়ে 'সীতা'র ভূমিকায়, এবং সেই অভিনয়েই তিনি বিশেষ অভিনেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন। এই প্রতিষ্ঠার পূর্ণ রূপ দেখি আর কিছুকাল পরে মনোমোহন থিয়েটার মঞ্চে 'মনোমোহন নাট্যমন্দির'-এর 'সীতা' নাটকাভিনয়ে 'সীতা'র ভূমিকায়। এই নাটকটির

রচয়িতা ছিলেন স্বর্গত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। এখানেও ছিল শিশিরকুমারের শিক্ষার স্পর্শ, আর সেই স্পর্শমনির স্পর্শে যে লোহাও সোনা হয়, একথা কে না জানেন? অবশ্য প্রভা লোহা ছিলেন না, সোনা ছিলেন, তবে দক্ষতম কারুশিল্পীর হাতে পড়িয়াই উহা বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলংকার হইয়া উঠিয়াছিল, নহিলে হয়ত উহা সোনার তালই থাকিয়া যাইত।

"তাহার পর হইতে প্রভা এযাবৎ বহু ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। সবগুলির নাম বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে কতকগুলির নামোল্লেখ করিতেছি—মুরা (চন্দ্রগুপ্ত), রমা (রমা), ষোড়শী (ষোড়শী), উদিপুরী (আলমগীর), ইন্দু (শেষরক্ষা), সখার মা (রঘুবীর), সিরাজী (দিগ্বিজয়ী), প্রফুল্ল, জ্ঞানদা, উমাসুন্দরী (প্রফুল্ল), স্বাগতা (রীতিমত নাটক), সুমিত্রা (পথের দাবী), বিমলা (দুই পুরুষ), 'পথের ডাক'-এর একটি চরিত্র, শীতলসেনী (ধাত্রীপান্না), অন্নপূর্ণা (বিন্দুর ছেলে), দিগম্বরী (রামের সুমতি), ক্ষীরোদা (দুঃখীর ইমান), দ্রৌপদী (উত্তরা), পুরবালা, (চিরকুমার সভা) জাহানারা (সাজাহান), প্রমদা (সরলা), সরস্বতী (বলিদান), ভ্রমর (ভ্রমর), কুন্তী (কর্ণার্জুন), সুনন্দা (কেদার রায়), সুধনের মা (কিন্নরী), নিবৃত্তি (আত্মদর্শন), কাঞ্চন (সধবার একাদশী), জীজাবাঈ (গৈরিক পতাকা), বৃন্দাবনের মা (পণ্ডিত মশাই), সিদ্ধেশ্বরী (নিষ্কৃতি), চাঁদবিবি (চাঁদবিবি)। ইহা ব্যতীত 'হারানো রতন' 'হাসনুহানা' প্রভৃতি দুই চারিটি প্রহসন এবং গীতিনাট্যেও অবতীর্ণ হইয়াছেন তিনি। উপরিউক্ত ভূমিকাগুলির মধ্যে অনেকগুলি ভূমিকায় তিনিই প্রথম রূপদান করিয়াছেন, আবার কতকগুলি চরিত্র পূর্ব অভিনীত। ষোড়শী, উদিপুরী, সিরাজী, প্রফুল্ল, জ্ঞানদা, উমাসুন্দরী, ভ্রমর, মুরা, প্রমদা প্রভৃতি পূর্ব অভিনীত চরিত্রও তিনি নিজস্ব ভঙ্গীতেই অভিনয় করিয়াছেন; এবং উহার মধ্যে জ্ঞানদা, মুরা আর ভ্রমর চরিত্রের রূপদানে তুলনায় তিনি আজিও অপরাজিতা রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সীতা, রমা, ইন্দু, সখার মা, দিগম্বরী ও সিদ্ধেশ্বরী চরিত্রাভিনয়ে তাঁহার খ্যাতি এমনই যে, তাঁহাকে ঐ চরিত্রগুলি হইতে পৃথক করিয়া দেখা নাট্যরসিকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

"শ্রীমতী প্রভার অভিনয়ের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার তুলনাহীন বাচনভঙ্গি। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহার অদ্বিতীয় কণ্ঠস্বর বহুল পরিমাণে

সহায়ক হইয়াছে। ইংরেজিতে যাহাকে 'গোল্ডেন ভয়েস' বলে, প্রভা সেইরূপ সুধানিষ্যন্দী কণ্ঠের অধিকারিণী। এমন আশ্চর্য মধুর কণ্ঠস্বর বিনোদিনী তিনকড়ির ছিল কি না জানি না, তবে তারাসুন্দরী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত কোন বাঙালী অভিনেত্রীর কণ্ঠ হইতে অমন মধুক্ষরা বাণীর ঝঙ্কার শুনি নাই। তবে একথাও সত্য যে, কেবল অমৃতকণ্ঠ হইলেই কেহ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হইতে পারেন না, সেই কণ্ঠকে কাজে লাগানো চাই। বলাবাহুল্য প্রভা তাঁহার কণ্ঠস্বরকে সার্থকতমরূপেই কাজে লাগাইয়াছেন। তাঁহার বাচনভঙ্গি কেবল যে স্বাভাবিক তাহাই নয়, উহার সঙ্গে হৃদয়াবেগ এমনভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যাহাতে অভিনয়ের চরিত্রটি আপনা হইতেই প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। বাচনভঙ্গীর সঙ্গে হৃদয়াবেগের উপযুক্ত মিশ্রণের অভাবে বহু অভিনেত্রী নটীজীবনে খ্যাতিসম্পন্না হইয়াও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারেন নাই। আবার এই হৃদয়াবেগযুক্ত বাচনভঙ্গির সঙ্গে অনুকূল দেহভঙ্গি, বিশেষতঃ মুখভঙ্গি, না থাকিলে বাচনভঙ্গির চমৎকারিত্বও ব্যর্থ হয়। এ বিষয়েও প্রভা প্রথম শ্রেণীর নটীরই পরিচয় দিয়াছেন। একটি মাত্র উদাহরণ দিই। যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' নাটকে আছে উর্মিলার নিকট রাম কর্তৃক সীতা-নির্বাসনের বার্তা শুনিয়া সীতা কথাটাকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। রামচন্দ্রের নিকটে গিয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আর্যপুত্র !
তুমি নাকি আমারে দিয়াছ নির্বাসন ?
উর্ম্মিলার মুখে শুনিলাম সমাচার।
অবোধ বালিকা—
লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝিতে না পারি
কত কথা কহিল আমায়।'

ইহার উত্তরে রামচন্দ্র কিছুই বলিতেছেন না দেখিয়া সহসা সীতার অন্তর অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল,—সীতা-নির্বাসন-কথা তবে পরিহাস নয় ? —উপরের পংক্তি কয়টির অব্যবহিত পরেই 'সীতা' নাটকে 'সীতা'র সংলাপ এইরূপ—

'এ কি আর্যপুত্র,
মোরে সম্ভাষণ নাহি কর ?

কি হয়েছে নাথ ?
বুঝিতেছি—উর্মিলার অশ্রুজল
মিথ্যা নহে।' ইত্যাদি

যাঁহারা 'মনোমোহন নাট্যমন্দিরে' কিংবা 'নাট্যমন্দিরে' (বর্তমান "শ্রী' চিত্রগৃহ) প্রভার সীতা চরিত্রাভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন—হাস্য-মুখে প্রথমোক্ত সংলাপটি বলিবার পরেই প্রভার মুখের কী আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিত। মনে হইত, পূর্ণচন্দ্রকে অকস্মাৎ অতর্কিতে রাহু আসিয়া গ্রাস করিয়াছে। মুখের হাসি মুহূর্তে মিলাইয়া যাইত, চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত, আর ওষ্ঠাধর থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিত। সে কম্পন যেন ওষ্ঠাধরের নয়—উহা তাঁহার সমগ্র অন্তরের—না, সমগ্র সত্তার কম্পন। এই ওষ্ঠাধরের কম্পন প্রভার অভিব্যক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। ওষ্ঠাধরও যে কিরূপ নীরব কথা কহিতে পারে, প্রভার মধ্যেই আমি তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। কেবল কী সীতায় ? 'রমা'তেও দেখিয়াছি,—'ভ্রমরে'ও দেখিয়াছি—ঐ ওষ্ঠাধরই প্রণয়াস্পদ এবং স্বামীর প্রতি অভিমানে ক্ষোভে আশ্চর্যরূপে স্ফুরিত হইতেছে। আবার ঐ ওষ্ঠাধরের মৃদু কম্পনেই 'ইন্দুমতী'র চাপা রহস্য বিচ্ছুরিত হইতেছে।

"প্রভা সম্পর্কে একটা কথা বলা হইয়া থাকে—প্রভা কেবল করুণ ভূমিকাতেই শ্রেষ্ঠ অভিনয় করিয়াছেন, অন্যরূপ ভূমিকায় তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ইন্দু, সখার মা এবং দিগম্বরী— এই তিনটি ব্যতিক্রম মাত্র। অবশ্য কথাটা এক হিসাবে সত্য। সীতা, রমা, মুরা, প্রফুল্ল, জ্ঞানদা, উমাসুন্দরী, ভ্রমর, অন্নপূর্ণা, সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি চরিত্রে প্রভা যে-পরিমাণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, উদিপুরী, ষোড়শী, সিরাজী, শীতলসেনী প্রভৃতি চরিত্রাভিনয়ে তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। উহার জন্য হয়তো তাঁহার অতি মধুর কণ্ঠস্বরও খানিকটা দায়ী। ঐরূপ কণ্ঠে কারুণ্য যতটা ফোটে, গাম্ভীর্য ততটা নয়। কিন্তু কোন্ অভিনেত্রী সর্বরসের অভিনয়ে একেবারে তুলাদণ্ডে ওজন করা সমান কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন ? শুনিয়াছি—বিনোদিনী করুণ মধুর রসের চরিত্রে যেমন অভিনয় করিতেন, গাম্ভীর্যপূর্ণ চরিত্রে তেমন অভিনয় করিতে পারিতেন না। আবার তিনকড়ি বা তারাসুন্দরী, লেডি ম্যাকবেথ, জনা-অথবা রিজিয়া, জাহানারা, জহরায় যেমন অতুলনীয় অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, প্রফুল্ল, জ্ঞানদা, সরলা, ভ্রমর-এ

সেইরূপ অভিনয় করিতে পারিতেন? এলেন টেরি, সারা বার্ণাড কিংবা সিডন্‌-এর দ্বারা জুলিয়েটের ভূমিকার যাথার্থ্য রক্ষিত হইত কিনা সন্দেহ।..."

মহাপ্রস্থান করলেন মনীষী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য— 'সীতা' নাটকে 'মহর্ষি বাল্মীকি'র ভূমিকায় অলৌকিক অভিনয়-দক্ষতায় ভূমিকার নামে পরিচিত হয়ে 'মহর্ষি' নামে যিনি খ্যাত। সর্বজন শ্রদ্ধেয় তিনি—চারিত্র্যে ও পাণ্ডিত্যে। অসুস্থ হয়ে পড়তেই 'মহর্ষি' শিশিরকুমারকে সংবাদ দিয়েছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরেই গুরু উপস্থিত হয়েছেন শিষ্যের শয্যা-পার্শ্বে। শিষ্যের বাক্‌লোপ হয়েছে কিন্তু তখনও চেতনা আছে। শিষ্য গুরুর দক্ষিণ হস্তখানি ধীরে ধীরে তুলে নিজের ওষ্ঠে ঠেকালেন। তারপর ধীরে ধীরে সব শেষ—রাত সাড়ে তিনটের সময়।

পরদিন প্রভাতে প্রথমেই শ্রীরঙ্গমে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হ'ল। গুরুর চোখে জল—একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ—অবশেষে ধরা গলায় ব'লে উঠলেন—"কৈ? পা দুখানি কোথায়?"

গুরু নিলেন শিষ্যের পদধূলি।

'মহর্ষি'র অভিনয়ধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ পাল-চৌধুরী তাঁর 'অভিনেতৃ আর অভিনয়' প্রবন্ধে যে-মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেনঃ "শিশিরকুমারের সঙ্গে থাকিয়াই অতি অল্প যে কয়জন অভিনেতা শিশিরকুমারের সমকালেই খ্যাতিমান হইয়াছিলেন, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁহাদের অন্যতম। অথচ সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে শ্রীমনোরঞ্জনের অভিনয়ে শিশিরকুমারের অভিনয়-ধারার প্রভাব এত অল্প যে, নাই বলিলেই হয়। শিশিরকুমারের সঙ্গী মাত্র আর একজন অভিনেতাই শিশিরপ্রভাব সম্পূর্ণ এড়াইয়া নিজস্ব অভিনয়বৈশিষ্ট্যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে অমর হইয়া আছেন; তিনি স্বর্গত যোগেশ-চন্দ্র চৌধুরী। যোগেশচন্দ্রের অভিনয়সম্পর্কে এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে চেষ্টা করিলে হয়তো অনুকরণ করা যায়, কিন্তু যোগেশচন্দ্রের অভিনয়ভঙ্গি, আর বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একমাত্র তাঁহার অভিনয়ভঙ্গিই,—অননুকরণীয়। আমার দুর্ভাগ্য যে, বর্তমান প্রবন্ধে স্বর্গতদের অভিনয় বিশ্লেষণ করিবার অবকাশ নাই, প্রবন্ধের পক্ষেও উহা অবান্তর; নইলে যোগেশচন্দ্রের অভিনয়ধারার নানাবিধ রূপের উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতে পারিতাম যে, শিশিরকুমার যেমন একদিকে একটা

যুগ, যোগেশচন্দ্রও তেমনি আর এক হিসাবে, যুগপ্রবর্তক না হইলেও সেই যুগেরই পুরুষ হইয়া, এমন একটা বিশিষ্ট অভিনয়ধারার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, যাহা অনুকরণ করিতে পারিলে হয়তো একই কালে আমরা দুইটি বিভিন্ন যুগের সাক্ষাৎ পাইতাম। যাহা হোক যোগেশচন্দ্রের অভিনয় যাঁহারা দেখেন নাই, বর্তমানে মনোরঞ্জনের অভিনয় দেখিলে তাঁহারা হয়তো যোগেশচন্দ্রের অভিনয়ধারার খানিকটা স্বাদ পাইতে পারেন। মনোরঞ্জন যেন নিজের অজ্ঞাতে, অবশেই যোগেশচন্দ্রকে অনুকরণ করিয়াছেন, অন্তত যোগেশচন্দ্রের অভিনয়পদ্ধতি, বিশেষত বাচনভঙ্গির আশ্চর্য স্বাভাবিকতা, অলক্ষ্য পদসঞ্চারে মনোরঞ্জনের নট-প্রতিভার স্নিগ্ধ-শ্যাম-কুঞ্জবনচ্ছায়ায় আপনার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সেই চিহ্ন অস্পষ্ট হইলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়।

"যতদূর মনে পড়ে—শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযোগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধেই,—১৯২১ সালে ঢাকায় 'চন্দ্রশেখর' নাটকে মাত্র একদিনের জন্য 'চন্দ্রশেখর'-এর ভূমিকাতেই মনোরঞ্জন প্রথম পেশাদারি দলে অভিনয় করেন। (মনোরঞ্জনের দেশও পূর্ববঙ্গে—ঢাকায়)। সেখানকার ক্রাউন থিয়েটারেও তিনি কয়েকদিন অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমারের দলে না আসা পর্যন্ত তাঁহার প্রতিভাপ্রসূন বিকশিত হয় নাই। ১৯২৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকে 'বাল্মিকী'র ভূমিকায় যেদিন তিনি মঞ্চাবতরণ করেন সেইদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নাট্যরসিক-মহলে তিনি যে 'মহর্ষি' নামে অভিহিত হন, মহর্ষি বাল্মিকীর ভূমিকাভিনয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য উহারই একটা অব্যর্থ প্রমাণ।···

"মনোরঞ্জনের অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা একান্তভাবে অন্তর্মুখী। তাঁহার অভিনয়ে অভিনেয় চরিত্রের স্বরূপটি প্রকাশ করিবার প্রয়াস সর্বত্র পরিস্ফুট। তাঁহার বাচনভঙ্গি ঘরোয়া কথার মতই নিতান্ত স্বাভাবিক; প্রকাশভংগিও সংযত। কোথায়ও 'এ্যাক্টো' করিবার মোহে নিজের শিল্পদৃষ্টিকে তিনি বিসর্জন দেন না। কিন্তু বাচনভঙ্গি এবং অঙ্গভঙ্গির অপেক্ষা তিনি অভিনেয় চরিত্রের অন্তরঙ্গে প্রবেশ করিয়া উহাকে যেমন বুঝিয়াছেন তেমন প্রকাশ করাই তাঁহার অভিনয়ের লক্ষ্য। নিজে তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি। নাটক এবং অভিনয় সম্পর্কে কিছু রচনাও তাঁর আছে। কয়েকটি নাটকও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'থিয়েটার প্রসঙ্গে' নামক পুস্তকের প্রবন্ধাদি

পাঠ করিলে বিশেষতঃ 'মদন ঘোষ', 'চাণক্য', 'বলিদান ও করুণাময়', 'স্টুপিড' প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি নাটকীয় চরিত্র কী ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করেন। ঐ গ্রন্থেই স্বর্গত যোগেশ চৌধুরীর অভিনয় সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার নিজের অভিনয় সম্পর্কেও সেই কথা প্রযোজ্য। যোগেশচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—'তাঁর অভিনয় অভিনয় ছিল না, ছিল চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী অভিনেতা ছিলেন যোগেশচন্দ্র। দৃষ্টি ছিল সর্বদা অভিনীত চরিত্রের প্রতি, দর্শকদের প্রতি নয়। অনেক অভিনয় চতুর আছেন যাঁরা সর্বদা দর্শকমুখাপেক্ষী অভিনয় দ্বারা দর্শকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন। রসিক দর্শক এরূপ অভিনয়ে যথার্থ তৃপ্তি পান না। যদিও সাধারণের হাততালি ও সস্তায় খ্যাতিলাভ এর দ্বারা অসম্ভব নয়। যোগেশচন্দ্রের এরূপ খ্যাতি সৌভাগ্য ছিল কিনা জানি না, কিন্তু রসিকচিত্তে যোগেশচন্দ্রের অভিনয় বিশিষ্ট রেখাপাত করে গিয়েছে। হাস্যরসের ভূমিকা এমন গম্ভীরভাবে এবং করুণরসের ভূমিকা এমন সংযতভাবে অভিনয় করতে আমি কম অভিনেতাকেই দেখেছি।' মনোরঞ্জনও যে যোগেশচন্দ্রের যোগ্য শিষ্য একথা, একদিকে তাঁহার মদন ঘোষ, রসিক, ভাঁড়ু দত্ত, রামমাণিক্য এবং অপরদিকে বাল্মীকি, রজনীনাথ, সত্যপ্রসন্ন প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন সেই সকল রসিকব্যক্তি একবাক্যে স্বীকার করিবেন।"

এই অবসরে স্বর্গত নরেশচন্দ্র মিত্রের অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দেওয়া এখানে অবান্তর হবে না বলেই মনে করি। নরেশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভা বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী তাঁর অভিনেতৃ আর আর অভিনয়' প্রবন্ধে। উক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্রের অভিনয়ধারার স্বরূপ নির্দেশ করে যে-মনোজ্ঞ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "টাইপ চরিত্রাভিনয়ে নরেশচন্দ্রের খ্যাতি অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতি যে একেবারে নিরর্থক, এমন কথা বলিব না, বরং আরও অগ্রসর হইয়া বলা যায় যে, তথাকথিত 'টাইপ' চরিত্র ভিন্ন অন্যরূপ চরিত্রাভিনয়েও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার আকৃতি যদি আর একটু দীর্ঘ হইত এবং কণ্ঠস্বরটি যদি আনুনাসিক না হইত তবে অভিনেতা হিসাবে

শিশিরকুমারের পরেই স্বর্গত বিশ্বনাথ ভাতুড়ির সঙ্গে তাঁহার নাম অসঙ্কোচে উচ্চারণ করা চলিত। জন্মগত ঐ দুইটি দোষের জন্যই প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্ট হইয়াও তিনি দর্শকসাধারণের নিকট ·টাইপ চরিত্রাভিনেতারূপেই পরিচিত হইয়া রহিলেন। নরেশচন্দ্রের নটজীবনের এই ট্র্যাজেডি 'সূত পুত্র' কর্ণের ট্র্যাজেডিরই অনুরূপ।

"নাটক সম্পর্কে যাহাকে 'টাইপ' বলা হয় তাহার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ কিছু নাই। 'বিশেষ লক্ষণযুক্ত'—এইরূপ অর্থেই 'টাইপ'-এর ব্যবহার প্রচলিত। অর্থাৎ 'টাইপ'-চরিত্র বলিতে আমরা সেইরূপ চরিত্র বুঝাই যে চরিত্রে একই প্রকৃতির বিভিন্ন মানুষের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বিশেষভাবে পরিস্ফুট। দৃষ্টান্তস্বরূপ villain চরিত্রের কথা ধরা যাউক। villain বলিতে আমাদের চোখের সুমুখে এমন ব্যক্তির ছবি ভাসিয়া উঠে যাহার দৃষ্টি ভ্রূকুটি-কুটিল, যাহার চলাফেরায় একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে, যে বিষকুম্ভ পয়োমুখ, প্রত্যক্ষে মিষ্ট বাক্য বলে আর পরোক্ষে বসিয়া ছুরি শানায়। villainy-র এই সাধারণ লক্ষণগুলি যে-চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকেই আমরা টাইপ ভিলেন চরিত্র বলিয়া থাকি। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই আমাদের ঐরূপ ধারণার অসারত্ব বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষই আলাদা। একজনের আকৃতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে আর একজনের আকৃতি এবং প্রকৃতির মিল নাই। এই বৈলক্ষণ্য হেতুই এক মানুষ আর এক মানুষ হইতে পৃথক। বলা চলে,—বৈসাদৃশ্যই ব্যক্তি-মানুষের পরিচয়। মনে রাখিতে হইবে, আমি নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলিতেছি। কবিতা বা গল্পউপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রায় বিপরীত বলিলেও চলে। উহারা বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্যেরই সাধনা করে। কাব্য বলে, 'কাবুলিওয়ালা'র বাহিরের রূপটা কিছুই নয়; যেখানে সে স্নেহময় পিতা, সেখানে সে পৃথিবীর যে কোন জাতির যে কোন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে এক, সগোত্র, সেইখানেই সে সত্য। বিশেষকে নির্বিশেষ করিয়া তোলাই কাব্যের ধর্ম। কিন্তু নাটকের ধর্ম অন্যরূপ। বিশেষের মধ্যেই নাট্যকার যে প্রাণের লীলা দেখেন তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। নাটক বলে,—কাবুলিওয়ালার হাতের লাঠিটি, তার বলিষ্ঠ গঠন, তার ঢিলা পাজামা আর ময়লা কোর্তাই সত্য। এমন কি একজনের লাঠির সঙ্গে আর একজনের লাঠির মিল নাই, একজনের পাগড়ি বাঁধার ঢং আর একজনের সঙ্গে মেলে না, একজনের পরিচ্ছদ আর একজনের

পরিচ্ছদের অনুরূপ নয় ; আর সেই বৈচিত্র্যই নাট্যকারের কল্পনাকে উত্তেজিত করে। মনের দিক হইতে কোন কাবুলিওয়ালা এক নয়। কেউ বা হিংস্র, কেউ শান্ত, কেউ স্নেহপ্রবণ, কেউ নির্মম। এই অনৈক্যকে প্রকাশ করাই নাট্যকারের ধর্ম। যিনি মানুষের মধ্যে এই বৈচিত্র্যের লীলারস উপলব্ধি করিতে না পরেন তিনি নাটক রচনা করিবার অধিকারী নহেন। খাঁটি নাটকে তাই কোন 'ভিলেন'ই এক নয়। শাইলক ইয়াগোতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। কেবল ভিলেনেই নয়, যে কোন নাটকীয় চরিত্রই। এমন কি 'জুলিয়াস সিজার'এর বিখ্যাত 'Forum' দৃশ্যের নাগরিকগণও একজন আর একজন হইতে একেবারে আলাদা। 'নীলদর্পণ'-এর বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘরের তিনজন রায়তও তিন প্রকৃতির। অতএব বলিতে পারা যায়—খাঁটি নাটকে 'টাইপ' বলিয়া কোন চরিত্র থাকিতে পারে না, কারণ সাধারণ লক্ষণ যেখানে কোন মানুষের পরিচয় নয়, অসাধারণত্বেই সে বিশেষ ব্যক্তি।

"এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে—তবে নাটকে টাইপ চরিত্র কথাটার আমদানি হইল কীরূপে ? ইহার উত্তর এই যে, টাইপ-চরিত্র আমদানির ইতিহাস জানি না বটে, কিন্তু আমদানির কারণটা অনুমান করিতে পারি। যে-সকল লেখকের নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গী নাই অথচ যাঁহারা নাটক লিখিতে গিয়াছেন তাঁহারাই অক্ষমতার দরুণ একরূপ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া উহাকে টাইপ চরিত্র আখ্যা দিয়াছেন। নাট্যরসকল্পনা বাঙালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়াই বিশেষ করিয়া বাংলা নাটকে উক্ত টাইপ চরিত্রের মহামারী দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা নাটকে সকল ভিলেনই এক ঢংয়ে চলে-বলে-চায়, সকল কর্তাই সেখানে এক প্রকৃতির, সকল চাকরই বোকা, সরল, প্রভুভক্ত, সকল প্রেমিকের প্রেম নিবেদনের স্বরূপ এক, সকল বীরই একই রীতিতে তরবারি ঘুরাইয়া একই রূপ আস্ফালন করিয়া থাকে। সেখানে যোগেশ করুণাময় এক, বেহারীতে (চরিত্রহীন) বেহারীতে (মহানিশা) পার্থক্য নাই, যশোবন্ত (সাজাহান) দুর্গাদাস অভিন্ন, কালীচরণ পার্বতী (পরপারে), কালীনাথ (পতিব্রতা) একই প্রকৃতির, রমেশ (প্রফুল্ল) ঔরঙ্গজেবে (সাজাহান) তফাৎ করা যায় না, শ্রীমন্ত (কেদার রায়) ভবানন্দেরই প্রতিধ্বনি, কার্ভালো রডারই দীর্ঘতর সংস্করণ, জাহানারা আর সত্যবতীর (মেবার পতন) বক্তৃতা শুনিলে মনে হয় উহারা একই 'সেক্রেটারি'র রচনা। সুতরাং অভিনয় করিতে গেলে ঐ সকল চরিত্রের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণই বিশেষভাবে অভিনেতার মধ্যে

প্রকট হইয়া উঠে। এবং এইরূপ চরিত্র যিনি বেশির ভাগ অভিনয় করিয়া থাকেন তাঁহাকেই আমরা টাইপ চরিত্রাভিনেতা আখ্যা দিয়া থাকি। এই অর্থে করুণাময় যোগেশও টাইপ, যশোবন্ত-দুর্গাদাসও টাইপ। কিন্তু মজার কথা এই যে, যাঁহারা ওই চারিটি চরিত্রে অভিনয় করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে টাইপ চরিত্রাভিনেতা বলা হয় না। ইহার কারণ এই—'টাইপ চরিত্র'-এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই, তাই একধরণের ভিলেন চরিত্র (যেমন পান্নুবাবু, কাঙ্গালীচরণ, কালীনাথ, শকুনি, শ্রীমন্ত), চাকর-চরিত্র (যেমন্ বেহারী, ধর্মদাস, নেড়া) এবং উদ্ভট সরল চরিত্রকেই (যেমন নীলকমল, অমর মাষ্টার) আমরা টাইপ চরিত্র বলিয়া থাকি। ইহার চেয়ে হাস্যকর আর কী হইতে পারে? টাইপ চরিত্র কথাটা বাঙালী নাট্যকারেরও অক্ষমতার পরিচয়, বাঙালী দর্শকের রসবোধেরও দারিদ্র্যের সূচক।

"যাহাই হোক, টাইপ চরিত্রকে স্বীকার করিয়া লইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, নরেশচন্দ্র তথাকথিত টাইপ চরিত্রাভিনয়ে সত্য সত্যই অসামান্য নিপুণ, এ বিষয়ে বাংলাদেশে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। কিন্তু টাইপ চরিত্র নয়,—এরূপ চরিত্রাভিনয়েও তিনি আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিঃ জেকব (প্যালারামের স্বাদেশিকতা), জিতেন ব্যানার্জী (বাংলার মেয়ে), খোজা পিরু (মীর কাশেম) প্রভৃতি চরিত্রের নামোল্লেখ করিতে পারি। তবে তাঁহাকে টাইপ চরিত্রাভিনেতাই বা বলিব কেন? এককালে তিনি চাণক্য, নিতাই (খাসদখল), রঘুপতি, সাজাহান প্রভৃতি চরিত্রেও অভিনয় করিয়াছেন; এবং সে সকল অভিনয় যে খুব মন্দ হইয়াছে এমন কথা বলা চলে না। তাই বলিতেছিলাম,—টাইপ চরিত্রাভিনেতা বলিলে নরেশচন্দ্রের অভিনয় প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয়, কারণ সেই প্রতিভা আরও উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিকার্যে সফল হইয়াছে; যাঁহারা উনিশ শ' একুশ-বাইশ সাল হইতে উনিশ শ' সাঁইত্রিশ আটত্রিশ সাল পর্যন্ত নট নরেশচন্দ্রকে দেখিয়াছেন তাঁহারাই আমার কথা স্বীকার করিবেন।...

"...ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্তে'র অভিনয়ে যৎকালে শিশিরকুমার চাণক্যের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন তৎকালে সেই অভিনয়েই কাত্যায়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নরেশচন্দ্র রসিক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহাকে দেখি উনিশ শো বাইশ সালের গোড়ার দিকে মিনার্ভা থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকেরই চাণক্যের ভূমিকায়। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার

প্রথম পেশাদারি মঞ্চাবতরণ। কিন্তু শিশিরকুমারের তুলনায় নরেশচন্দ্রের 'চাণক্য' হয় নিতান্ত নিষ্প্রভ। তবে মিনার্ভায় অভিনীত পরবর্তী নাটক ভূপেন্দ্রনাথের 'প্যালারমের স্বাদেশিকতা'য় মিঃ জেকবের ভূমিকায় নরেশচন্দ্র উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া ওঠেন।অতঃপর মিনার্ভার ভাগ্যাকাশ অগ্নিদগ্ধ হইলে নরেশচন্দ্র নবরূপে উদিত হন আর্ট থিয়েটারের ভাগ্যগগনে। 'কর্ণার্জুনে' শকুনির ভূমিকাভিনয়ের পরই নটরূপে নরেশচন্দ্রের আসন পাকাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। প্রসঙ্গত একথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, নরেশচন্দ্রেব পরে স্বর্গত রাধিকানন্দও শকুনির ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন, এবং সেই অভিনয় তুলনায় নরেশচন্দ্রের অভিনয়ের অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর হইয়াছিল। যাহাই হউক, আর্ট থিয়েটারে আরও দুইটি চরিত্রের অভিনয়ে তিনি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। একটি কাত্যায়ণের (চন্দ্রগুপ্ত) ভূমিকা, অপরটি নীলকমলের (সরলা) ভূমিকা। তাঁহার নটজীবনের প্রথম ভাগে নীলকমলের ভূমিকাভিনয়ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিনয়। উহা তাঁহার নটজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়ও বটে। নীলকমলের ভূমিকাকে হাস্যরসের অভিনয় না করিয়া নীলকমলের গভীর বেদনার দিকটাই-যে নরেশচন্দ্র ঐ চরিত্রাভিনয়ের প্রধান অবলম্বনরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন উহারই মধ্যে নরেশচন্দ্রের উচ্চাঙ্গ নাট্যরসবোধের পরিচয় নিহিত আছে। অভিনয়ও করিয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীর। 'পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে যায়' বলিয়া বেহালায় হাত দিতে গিয়া ভাঙা বেহালা দেখিবার পর তাঁহার মুখের ভাবাভিব্যক্তি যে-ট্র্যাজেডির ছবি রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা তৎকালীন দর্শক কোনোদিনই ভুলিবেন না।

"আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য আরও কয়েকটি মঞ্চে আরও অনেক ভূমিকাই তিনি অভিনয় করিয়াছেন; কিন্তু আমার মনে হয় উনিশশো তেত্রিশ সাল হইতে উনিশশো ছত্রিশ সালই তাঁহার নটজীবনের শ্রেষ্ঠতম গৌরব ও কৃতিত্বের কাল। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি যে-কটি চরিত্রাভিনয় করেন তন্মধ্যে পাঁচটি চরিত্রের অভিনয়ই হইয়াছিল উচ্চ প্রথম শ্রেণীর। ঐ চরিত্র পাঁচটি হইল—বেহারী (মহানিশা), কালীনাথ (পতিব্রতা), জিতেন ব্যানার্জি (বাংলার মেয়ে), অমর মাস্টার (পথের সাথী) এবং পানুবাবু (গোরা)। প্রথম চারিটির অভিনয় হয় রঙমহল মঞ্চে, এবং শেষেরটির নাট্যনিকেতনে। 'গোরা'র পূর্বে নাট্যনিকেতনেই 'কেদার রায়' নাটকে

শ্রীমন্ত-এর ভূমিকায় সাধারণ দর্শককে বিশেষভাবে অভিভূত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয়—ঐ ভূমিকার অভিনয়ে যতখানি প্রকৃত অভিনয়ের পরিচয় ছিল, শস্তা stunt ছিল তাহার চেয়ে বহুগুণ বেশি, আর দর্শক তাহাতেই ভুলিয়াছিল। পরে সে কথায় আসিতেছি।...

"নরেশচন্দ্রের অভিনয়ধারা লক্ষ্য করিলে যে-লক্ষণগুলি বিশেষভাবে চোখে পড়ে তাহা হইল তাঁহার স্বাভাবিক সহজ বাচনভঙ্গি এবং তদনুযায়ী অভিব্যক্তি। ঐ দুইটি গুণই তাঁহার অভিনয়-প্রতিভার ভিত্তি। অভিনয় ব্যাপারে ঐ দুইটি গুণ যে অত্যাবশ্যক তাহা না বলিলেও চলে। সাধারণ অভিনেতাদের মধ্যে, এমন কি প্রখ্যাত বহু নটের মধ্যেও ঐ দুইটি গুণের অপব্যবহার ঘটে বলিয়াই তাঁহাদের অভিনয় অভিনয়ের ব্যঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। নরেশচন্দ্রের সঙ্গে ঐ সকল অভিনেতার পার্থক্য এই যে,—অভিনেতার পক্ষে অপরিহার্য ঐ দুইটি গুণ নরেশচন্দ্রের মধ্যে যেরূপ সার্থকতমরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে, দুই-চারিজন অভিনেতা ভিন্ন আর কোন বাঙালী অভিনেতার মধ্যে উহা তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। এই কারণে ঐ দুটি গুণ সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

"স্বাভাবিক বাচনভংগি বলিতে আমি সুরবর্জিত সংলাপ উচ্চারণের কথাই বলিতেছি। ঐরূপ উচ্চারণে দীর্ঘকাল সংলাপেও সুরের আভাস থাকে না। অথচ দীর্ঘ সংলাপ আবৃত্তিকালে আমাদের প্রায় সকল অভিনেতাই কণ্ঠস্বরের উঠানো নামানোর কসরতে একপ্রকার সুরের মিশ্রণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ গোড়ায় খাদে বলিতে আরম্ভ করিয়া কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে চড়াইতে থাকেন, তারপর হঠাৎ উহাকে নামাইয়া আনেন নিচু পর্দায়। বক্তব্যের অর্থের সঙ্গে ঐরূপ উচ্চারণের মিল থাকুক আর নাই থাকুক উহাতে হঠাৎ চমকের একটা ভংগি আছে : বহু ব্যবহারে এই ভংগিটা একটা যান্ত্রিক ফরমূলায় দাঁড়াইয়া গেছে। সকল অভিনেতাই ঐ ফরমূলায় কণ্ঠস্বরকে ফেলিয়া একই ছাঁচের মূর্তি গড়িয়া তোলেন। দর্শকগণ উহার অন্তঃসারশূন্যতা ধরিতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের নিকট অর্থপূর্ণ আবৃত্তির অপেক্ষা চমকটাই অধিকতর উপাদেয়। স্বর্গত দানীবাবুর লোকপ্রিয়তা এবং অভিনয়-গৌরবের অনেকখানিই নির্ভর করিত এইরূপ বাঁধাধরা কৌশলের উপর। স্বর্গত নির্মলেন্দু লাহিড়ীর 'বাণীবিনোদ' আখ্যাও এই কৌশলেরই পুরস্কার। বস্তুত নির্মলেন্দুর অভিনয়প্রতিভা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—কণ্ঠস্বরের

আকস্মিক উত্থান-পতনের খেলাই সেখানে ভূপৃষ্ঠের তিন ভাগ জলের মত বিস্তৃত হইয়া আছে, বাকি এক ভাগ মাত্র কঠিন পদার্থ। 'মহিষাসুর,' 'কংস', 'সিরাজদ্দৌলা', 'চাণক্য', 'শিবাজী' প্রভৃতি যে সকল চরিত্রাভিনয়ে তাঁহার সমধিক খ্যাতি ছিল ঐ সকল অভিনয়ের মূল ভিত্তিই ছিল আবৃত্তির যান্ত্রিক খেলা। কিন্তু উহা যে অভিনয়ের একটা মস্ত বড় ফাঁকি, দর্শকসাধারণ এই কথাই বুঝিতে পারে নাই। শুধু দানীবাবু, নির্মলেন্দু নন, বহু অভিনেতাই ঐ চালে কিস্তিমাৎ করিবার আশায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তবে এ বিষয়ে ঐ দুইজনের সাফল্য অপর সকলের চেষ্টাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। অনেকে ঐরূপ আবৃত্তিকে কণ্ঠস্বরের ক্ষমতারূপে বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু আসলে উহা অভিনয় প্রতিভারই দৈন্যের একটা দিক। সেই দৈন্যকে ঢাকিবার জন্যই কণ্ঠসাধনার নামে স্বরের ম্যাজিক দেখাইতে হয়।

"নরেশচন্দ্রের আবৃত্তি ঐরূপ যান্ত্রিক কৌশলের প্রবল প্রতিবাদ। সুদীর্ঘ সংলাপ উচ্চারণেও তিনি কখনও কণ্ঠস্বরের ঐরূপ উত্থান-পতনের অস্বাভাবিকতাকে আশ্রয় করেন না। সংলাপ আবৃত্তিতে বাক্যার্থকে সুস্পস্টরূপে প্রকাশ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কণ্ঠস্বর একই পর্দায় থাকে, এমন মনে করার হেতু নাই। উহাও উঁচু নীচু পর্দায় উঠা নামা করে, তবে চমক দিয়া নয়, সংলাপের অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার 'শকুনি' ভূমিকার আবৃত্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুর্যোধনের সঙ্গে আলাপকালে 'দুর্যোধন, দুর্যোধন। বাতাসে কি শবধূমের গন্ধ পাচ্ছ, অগ্নিশিখা কি আকাশ স্পর্শ করেছে, মৃতের আর্তস্বরে কি ধরণীর বক্ষ কেঁপে উঠছে' ইত্যাদি সংলাপগুলি স্মরণ করুন। ধরাবাঁধা ফরমূলায় সংলাপ বলিবার প্রয়াস নাই, অথচ প্রত্যেকটি কথার উচ্চারণ মনকে আশ্চর্যরূপে অভিভূত করে। 'ধীরে—ধীরে মিশে কাল অনন্তের কোলে' ইত্যাদি সুদীর্ঘ স্বগতোক্তিটি অন্য অভিনেতার মুখে শুনিলে কণ্ঠস্বরের চমক দেখিয়া আমরা হাততালি দিতাম; কিন্তু নরেশচন্দ্রের আবৃত্তিতে শকুনির অন্তর্বেদনার কথাই আমাদের কানে বাজিতে থাকে, অর্থগ্রহণ ছাড়িয়া করতালিধ্বনি করিতে আমরা প্রমত্ত হইয়া উঠি না। সামাজিক নাটকের চরিত্রাভিনয়ে নরেশচন্দ্রের আবৃত্তি যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, উহা কত স্বাভাবিক, অন্যান্য অভিনেতার আবৃত্তি হইতে উহা কত বিলক্ষণ। 'বাংলার মেয়ে' নাটকে নিজ কন্যার শোচনীয় মৃত্যুদর্শনে 'ভবানী, ভবানী, চলে

গেলি মা ?'—এই অতি সংক্ষিপ্ত সংলাপ উচ্চারণের কি তুলনা আছে ? খুব বড় অভিনেতাও এরূপ স্থলে গলা কাঁপাইয়া, উহাতে ক্রন্দনের আভাস আনিবার চেষ্টায় একটি বিশ্রী কাণ্ড করিয়া বসিতেন। কিন্তু যোগেশচন্দ্র ? কত সহজভাবে কত নিদারুণ বুক ফাটা কথাই না বলিয়া যাইতেন। মনে হইত, অশ্রুর উৎস তাঁহার শুকাইয়া গেছে, আছে শুধু মর্ম্মদাহকারী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, সংলাপ ছলে তাহারই যেন একটা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। নরেশচন্দ্রের সংলাপ উচ্চারণও এমনই স্বাভাবিক, উহা কখনও অর্থকে অতিক্রম করিয়া সস্তা চমক লাগাইবার চেষ্টায় মোহগ্রস্ত হয় না, ধর্মচ্যুত হয় না।

"নরেশচন্দ্রের আঙ্গিক, বিশেষত মৌখিক, অভিব্যক্তিও তাঁহার বাচনভঙ্গির অনুরূপ স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অর্থ—উচ্চারিত সংলাপের অনুসংগী। অর্থাৎ যখন যেরূপ ভাবের কথাবার্তা বলা হয়, মুখে এবং অন্যান্য অঙ্গেও তদনুযায়ী অভিব্যক্তির প্রতিপালন দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সকল অভিনেতাই এইরূপ আঙ্গিক অভিব্যক্তির প্রয়াস করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলেই উহাতে সফলকাম হন না। আবার যে কয়জন খ্যাতিমান অভিনেতা ঐরূপ প্রকাশভঙ্গির সাধনায় সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই সাধনার মধ্যে ফাঁকি দেখা যায়। তাঁহারা কতকগুলি বিশেষভাবকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করিয়া থাকেন মাত্র। তাই ভয়ের অভিব্যক্তিতে সকল ভূমিকাতেই একরূপ মৌখিক প্রকাশভঙ্গি ফুটিয়া উঠে, আবার বেদনার অভিব্যক্তিতেও সকল ভূমিকাতেই একই রূপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বাঁধাধরা ফরমূলার ক্রন্দন বিরক্তি, নিরাশা, দ্বন্দ্ব, হর্ষ প্রভৃতি আয়ত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অভিব্যক্তিতে, রাম শ্যাম বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তি হইলেও উহাদের শোকের প্রকাশ বিভিন্ন হয় না, যদু মধু বিভিন্ন ব্যক্তি হইলেও উহাদের আনন্দের প্রকাশ হয় একই রূপ। তার উপর অনেক অভিনেতাই বিভিন্ন ভাবের জন্য বিভিন্ন কয়েকটি বাঁধা প্যাঁচ প্রকাশ ভাণ্ডারে জমা করিয়া রাখেন, আর প্রয়োজনমত ঐগুলিকে কাজে লাগাইয়া দর্শকের করতালি আদায় করে। আমি এরূপ অভিব্যক্তি বলি না। স্বাভাবিক অভিব্যক্তি চরিত্রের সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি চরিত্রানুযায়ী প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐরূপ অভিব্যক্তি দেখিয়া রসিক দর্শকের কখনও এরূপ মনে হয় না যে, দর্শকের প্রয়োজনেই নাটকীয় চরিত্রটি কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি করিতেছেন। নরেশচন্দ্রের আঙ্গিক অভিব্যক্তিতে

মাত্রাজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ পরিমিত মাত্রাবোধ বহু খ্যাতিমান অভিনেতার মধ্যেও দেখা যায় না। 'মহানিশা' নাটকে যেখানে কামাখ্যাচরণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, 'তোমার বাড়ি? তোমার বাবাকেসে বাড়ি পেয়েছ,—না?'—পাঠকদিগকে সেই দৃশ্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে বলি। ঐ কথাগুলি বলিবার সময় নরেশচন্দ্র কোমরে গামছা বাঁধিয়া যে ভঙ্গিতে দাঁড়ান, তাঁহার সমস্ত মুখ সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে আরক্তিম হইয়া উঠে, উহা দেখিয়া, কেহ অভিনয় করিতেছেন; কখনও এরূপ মনে হয় না; মনে হয়—কোন প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রভুর অবর্তমানে তাঁহার দৌহিত্রী এবং দৌহিত্রী-কন্যার অভিভাবকরূপে অন্যায়ের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আবার রাধিকাপ্রসন্নের মৃত্যুর দৃশ্যে বেহারীরূপী নরেশচন্দ্র যেরূপ উচ্ছ্বসিত রোদনে কাঁদিয়া উঠেন, উহা সরল ভৃত্যের কান্নারই অনুরূপ। এরূপ আশ্চর্য স্বাভাবিক ক্রন্দন আমি বাংলা মঞ্চে আর কাহারও মধ্যে প্রত্যক্ষ করি নাই। 'দুই পুরুষ' নাটকে নুটবিহারী যখন গুপী মিত্তিরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মিটমাট?' তখন নুটবিহারীরূপী ছবি বিশ্বাস যেভাবে ঐ একটা কথাকেই হাস্যকররূপে অসংযতমাত্রায় ফেনাইতে থাকেন, তাহারই পার্শ্বে গুপীমিত্তিররূপী নরেশচন্দ্রের নীরব অভিব্যক্তির কথা স্মরণ করুন। বিনয়ে বিগলিত 'হ্যাঁ' কথাটি উহারই মধ্যে কী চমৎকার রূপেই না ফুটিয়া উঠে। অথচ কোথায়ও অস্বাভাবিকতার লেশ নাই, প্রতিটি ভঙ্গি স্বীকৃতির বিভিন্ন রূপাভিব্যঞ্জনায় রসোজ্জ্বল।

"অবশ্য নরেশচন্দ্র যে কখনও তাঁহার ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হন নাই, এমন কথা বলা চলে না। তবে তাঁহার সেই চ্যুতির পরিমাণ খুবই নগণ্য। একটির উদাহরণ দিতেছি। 'কেদার রায়' নাটকে 'শ্রীমন্ত' চরিত্রাভিনয়ে নরেশচন্দ্রের সমধিক খ্যাতি আছে। ঐ চরিত্রেরই প্রথম দৃশ্যটির কথা মনে করুন। 'গাছে একটা বেল পেকেছিল' ইত্যাদি সংলাপের পরে 'দেখতে হবে—দেখতে হবে' বলিয়া শ্রীমন্ত যখন প্রস্থান করেন তখন শ্রীমন্তরূপী নরেশচন্দ্র যাইবার পূর্বে একবার মুকুট রায়ের নিকটে গিয়া দাঁড়ান। তারপর মুকুট রায়ের কটিদেশে রক্ষিত ছুরিটি সহসা টানিয়া লইয়া পুনরাবৃত্তি করেন 'দেখতে হবে—দেখতে হবে'। অতঃপর ছুরিটি মুকুট রায়কে ফেরত দিয়া দৃশ্য হইতে প্রস্থান করেন। তাহার এইরূপ কার্যের কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু না বুঝিয়াই দর্শকগণ প্রশংসায় 'আহা, আহা' করিয়া উঠেন। বস্তুত নরেশচন্দ্রের ঐরূপ করিবার কোন যুক্তিপূর্ণ

কারণই নাই। উহা নিতান্তই একটা stunt, সস্তার প্যাঁচ, অর্থ না থাকিলেও দর্শকগণকে সহজে বিভ্রান্ত করিবার একটা সাধারণ উপায় মাত্র। যদি বলেন, শ্রীমন্ত পাগল, পাগলে অনেক কিছুই করিতে পারে, তাহার উত্তরে বলিব,—তবে নরেশচন্দ্র তো এখানে নাচিতেও পারিতেন, কিম্বা কাঁদিতেও পারিতেন, পাগলের পক্ষে তো উহাও অস্বাভাবিক হইত না। কিন্তু তাহা হইবার নয়। 'কেদার রায়'-এর 'শ্রীমন্ত' চরিত্র পাগল নয়। যদিও নাট্যকার শ্রীমন্তকে অনেক স্থলে অন্য চরিত্রকে দিয়া পাগল বলাইয়াছেন তথাপি নাট্যকারের হাতে শ্রীমন্ত পাগল হইয়া উঠে নাই ; পাগল হইলেও সে জ্ঞানবান পাগল, অর্থাৎ পাগলামিটা তাহার ভাণ মাত্র। নাটকের সর্বত্রই শ্রীমন্তের রূপ এই। তবে মাঝে মাঝে নাট্যকার তাহাকে দিয়া পাগলামি করাইয়াছেন, এবং ওই কারণেই 'শ্রীমন্ত'টি একটা জগাখিচুড়ি হইয়া নাট্যকারের রচনাদৈন্যের পরিচয় বহন করিতেছে। তথাপি একথা সত্য যে, শ্রীমন্তকে যাহা করিতে হইবে তাহা অর্থপূর্ণ হওয়া চাই। গাছের পাকা বেল, দাঁড়কাক—সমস্তই যদি ইঙ্গিতপূর্ণ হয় তবে ছুরিকাগ্রহণ এবং ফেরৎ দেওয়ার পিছনেও একটা অর্থ থাকা দরকার। কিন্তু নরেশচন্দ্র উহার কী অর্থ করিবেন ?

"আমি টানিয়া-বুনিয়া উহার একটা অর্থ দাঁড় করাইয়াছি। ছুরিকা বা অস্ত্র যোদ্ধার নিকট প্রিয়তম বস্তু। উহা গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্ত হয়তো পরোক্ষে চাঁদ রায় কেদার রায়কে বলিতে চাহেন—তোমাদের প্রিয়তম জন সোনাকেও এমনিভাবে তোমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইব, তখন তোমাদের অবস্থা কী হয় তাহাই 'দেখতে হবে—দেখতে হবে'। কিন্তু ইহা আমারই ব্যাখ্যা। নরেশবাবু কি সজ্ঞানে এইরূপ ব্যাখ্যারই অনুসরণ করেন ? মনে হয়—না। তাছাড়া এরূপ অর্থকরণ অতি পরোক্ষ ব্যাপার। অভিনয়ে যাহা অতি প্রত্যক্ষ নয়, তাহার আবেদন নিস্ফল, দর্শকের নিকট তাই উহা অগ্রাহ্য।

"নরেশচন্দ্রের অভিনয়ধারা সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল বলিলাম। আবার বলিতেছি দৈর্ঘনির্দেশে তাঁহার স্বর যদি আনুনাসিক না হইত এবং যদি তিনি আরও একটু দীর্ঘাকৃতিবিশিষ্ট হইতেন তবে আরও বহু বিচিত্র চরিত্রের বহু বিচিত্র অভিনয় নরেশচন্দ্রের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়াই তিনি কেবল 'টাইপ' চরিত্রাভিনেতা-রূপেই বাংলা মঞ্চে স্মরণীয় হইয়া রহিলেন। ইহা নরেশচন্দ্রেরও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও দুর্ভাগ্য।"

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদম্পতি স্যার লুই ক্যাশন ও ডেম্ সিবিল থর্ণডাইক অষ্ট্রেলিয়া যাবার পথে কলকাতায় এসেছেন। তাঁরা এলেন শ্রীরঙ্গমে—শিশিরকুমারের 'মাইকেল' দেখলেন। সে অভিনয়রজনীতে স্বর্গত কালিদাস নাগ মশায়ও উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের পর শিল্পীদম্পতি মঞ্চে উঠে শিশিরকুমারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বললেন যে Irish Abbey Theatre ছাড়া আর কোথাও তাঁর এমন 'free acting' দেখেন নি।

২৩শে আগষ্ট। মঙ্গলবার, সন্ধ্যা।

স্বাধীনতা উৎসব সপ্তাহ পালন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির গুণীজন সম্বর্ধনা আয়োজনের সমাপ্তি দিবসে শিশিরকুমারকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গী রোডের সংযোগ স্থলে সুরুচিসম্পন্ন এক মণ্ডপে। এই দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শিশিরকুমার ও শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে স্বাগত জানান। শিশিরকুমারকে মাল্যচন্দনে অভিষিক্ত করা হয়। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী শিশিরকুমারকে একটি হস্তীদন্ত নির্মিত অশোক স্তম্ভের প্রতীক উপহার দেন। শিশিরকুমার সস্নেহে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে আলিঙ্গন করেন। শিশিরকুমার তাঁর ভাষণে বলেন—

"আজ কংগ্রেস কমিটি যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই অভিনন্দন আমাকে জানানো হয় নি, আমার মাধ্যমে বাংলার নাট্যশালাকে জানানো হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বাংলার নাট্যশালা স্বীকৃতি পেল। কারণ কংগ্রেস এখন রাষ্ট্রের পরিচালক। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সম্বর্ধনার কথা ছেড়ে দিলেও এই কথা বলা যায় যে, সাহিত্য, ললিতকলা সব দলের ওপরেই।

আমার মূল্য ততদিন থাকবে, যতদিন আমি নট। যতদিন আমি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে পারবো ততদিন আমার সমাদর। নাট্যশালা বা নটের অভাব বাংলাদেশে নেই। এই দেশের নাট্যশালার কোন দিন বিলুপ্তি সাধন হবে না। তবে আজ অভাব হচ্ছে, সঠিক গতি পথের সন্ধান দেওয়া। মাঝে মাঝে হয়তো এদেশের নাট্যপ্রবাহ কিছুকালের জন্যে ব্যাহত হয়ে থাকতে পারে তবে তা অল্পস্থায়ী। তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলেই, তার গতি অব্যাহত থাকবে।

বাংলায় চিরকালই উৎকৃষ্ট নাটক রচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ১৯২৭ সালে ষোড়শী নাটকে কৃষকের হাতে জমি দেবার যে ইঙ্গিত ছিল আজ কংগ্রেস তাই সফল করতে যাচ্ছে।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের লোকের মনের মধ্যে নতুন সাড়া এসেছে।

ইংলণ্ডে যখন যুদ্ধ চলছিল তখনও তাঁরা নাট্যশালার উন্নতির জন্যে অজস্র টাকা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন নি।

রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে না। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলেই বিশ্বাস রাখি।"

শিশিরকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন—

"বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের যখন ঘোরতর দুর্দিন, যখন সকলেই অনুভব করছিলেন যে, রঙ্গালয়ের পুনর্জীবনের জন্য তরুণ কর্মীর প্রয়োজন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯২১ সালে নাট্যাচার্যের মত একজন শিক্ষাবিদ রঙ্গালয়ে প্রবেশ করলেন। দেশবাসী সেদিন তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই সময়ে শুধু যে রঙ্গালয়ের অবস্থা মন্দ ছিল তা নয়, সামাজিক অপবাদ ও নিন্দা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনের প্রতিদিনের প্রাপ্য ছিল। গিরিশ, অমৃতলাল প্রমুখ নটচূড়ামণিগণ কেউই সেই অপবাদের হাত থেকে বাঁচতে পারেন নি। নাট্যাচার্য সেদিন মৃতপ্রায় বাঙলা রঙ্গমঞ্চে জয়গানের বাণী বহন করে এনেছিলেন। তিনি নব্যনটকুলের পিতামহ।

ভবিষ্যতের রঙ্গালয় রচনা করবার দায়িত্বভার নেবে নবীনের দল। প্রবীণরা তাদের যাত্রাপথে উৎসাহ দেবেন এবং তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারা নবীনদের চলার পথ সুগম করে দেবেন। আজ প্রকৃতপক্ষে প্রবীণ বলতে দুই একজনই বাংলার রঙ্গালয়ে বিরাজ করছেন। তাঁদের মধ্যে নাট্যাচার্য অন্যতম। তিনিই আমাদের কাছে জীবন্ত উদাহরণ। তাঁর সৃজনীপ্রতিভার স্পর্শে দেশ ধন্য হয়েছে।"

এই সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের ব্যাপারে স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি অপ্রিয় মন্তব্য করলেন। তিনি লিখলেন: "...শুনলাম শিশিরবাবু বাংলা দেশের দশজন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর একজন গণ্য হয়েছেন। এ ক্ষতিপূরণের অর্থ

হয় না। গরু মেরে জুতো দান। ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেকটার করা হয় নি কেন?"

দিল্লীতে সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমি গঠনের পর শিশিরকুমারকে ফেলোশিপ দান করা হল অর্থাৎ তাঁকে শিল্পীরূপে ভারতসরকার স্বীকৃতি দিলেন। কিন্তু এটিই কি তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি? তাঁর কাছে এ সম্মানের কোন মূল্যই নেই। তিনি সম্মানের কাঙাল নন। তিনি চান জাতীয় নাট্যশালা। তিনি ফেলোশিপ প্রত্যাখ্যান করলেন।

পশ্চিম বাংলায় এ্যাকাডেমী প্রতিষ্ঠা হলো। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায় শিশিরকুমারকে দিতে চাইলেন 'ডীন'-এর পদ। শিশিরকুমার এই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। এই প্রসঙ্গে পরে শিশিরকুমার বলেছেন: "সরকারী পদ নিয়ে বিপদে পড়ি আর কি! ওই-সব কাজের অনেক ফ্যাসাদ—সরকারের উদ্যোগে কোন নাটক নামালেই থাকবে ওদের হস্তক্ষেপ। আমার কোন হাত থাকবে না, ওদের ফরমাশ মত কাজ করতে হবে, নাটক প্রযোজনা করতে হবে। ওসব আমার পোষায় না। সরকার এমন একটি নাট্যশালা করুন, যেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রযোজকের। কিন্তু বিধানবাবুর কথায় ভরসা পেলুম না। 'না' বলে সোজা চলে এলুম। আর ওদিকে পা বাড়াই নি।" বিধানচন্দ্র সেই পদে নিযুক্ত করেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মশায়কে।

শ্রীরঙ্গম বিলুপ্তির মুখে। থিয়েটার বাড়ির ভাড়া গুণে কোনো রকমে টি`কে থাকবার চেষ্টা করছেন শিশিরকুমার। ঋণ বেড়ে চলেছে। রিক্ত তিনি। বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত। নিঃসঙ্গ। একাকী সংগ্রাম করছেন। দাঁড়াবার মত অঙ্কে কোথাও পাচ্ছেন না ঋণ। দীর্ঘ চোদ্দ বছর এই মঞ্চে তিনি আছেন। এই চোদ্দ বছরে তিনি চোদ্দটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এর মধ্যে অনেক নাটক দুর্বল ছিল। আর্থিক সাফল্য এনেছিল শুধু 'বিপ্রদাস' আর কিছুটা 'মাইকেল' ও 'বিন্দুর ছেলে'। বাকি নাটক-গুলির মঞ্চরূপায়ণে শিশিরকুমারকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। একদিকে 'শ্যামলী' আর 'উল্কা'য় দর্শকের প্রচণ্ড ভীড়—দু' শ' পাঁচ শ' রাত্রি ধরে বাজে বাজে নাটকের অভিনয় হচ্ছে—অভিনয় বললে ভুল বলা হয়, কতকগুলো সিনেমার সংলাপ—আর 'দুঃখীর ইমান', 'পরিচয়', 'তখৎ-এ-তাউস' মার খাচ্ছে। 'পরিচয়' বোধ হয় ছাপ্পান্ন রজনী অভিনয়

হয়েছিল। 'পরিচয়'-এর প্রথম অভিনয় রজনীতে আমি উপস্থিত ছিলাম —সেদিন সব শুদ্ধ পঁচিশ জন দর্শক ছিল কি না সন্দেহ। তার পরে আরও তিন বার আমি এ নাটকের অভিনয় দেখেছি—তখনও তথৈবচ। 'পরিচয়'-এর বিক্রি চার অঙ্কে পৌঁছয় নি কখনও। এ কথা নাট্যাচার্যের পুত্র স্বয়ং অশোক ভাদুড়ী আমাকে বলেছেন।

প্রায় দর্শক-শূন্য প্রেক্ষাগৃহে দিনের পর দিন শিশিরকুমার প্রচণ্ড ভাবে অভিনয় করে গেছেন। মুষ্টিমেয় দর্শকদেরও ফাঁকি দেন নি, তাদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর থিয়েটার দর্শক শূন্য হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

"শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে সংস্কৃতি আয়ত্তগত হয়। বাংলা দেশের সংস্কৃতিতে শিশিরকুমারের বিপুল দানের অনেকখানিই যে অনায়ত্ত রয়ে গেছে তার কারণ এই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব। যখন দেখি দেশে প্রায় একটা জেনারেশন তৈরী হয়েছে যারা শিশিরকুমারের অভিনয় বা শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত নয় তখন অত্যন্ত তিক্ত ক্ষোভের সঙ্গে এই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব স্বীকার করতেই হয়। উত্তরতিরিশে জন্ম এমন তরুণদের মধ্যে শতকরা ক'জন শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেছেন এবং ক'টি অভিনয় দেখেছেন তা প্রায় হাতে গুণে বলা যায়। এদেশে জন্মালে শিশিরকুমারের থিয়েটার দেখাটা যে জীবনের কর্তব্য—বর্ণপরিচয় হলে রবীন্দ্রনাথ পড়াটা যেমন কর্তব্য—এ কথা স্কুলে কলেজে পড়া বহু বাঙালীর সম্ভবতঃ বোধেরই বাইরে।

"এর কারণ বিবিধ। প্রধানতঃ নাট্যশালা আমাদের দেশে এবং সমাজে শ্রদ্ধার আসনে স্থান পায় নি। এখনও না। নাট্যশালা সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ বহু সময়ে দেখালেও বাঙালী নাট্যশালাকে প্রমোদভবন বলেই দেখেছে, জাতীয় সংস্কৃতির মন্দির বলে কল্পনা করে নি। সংস্কৃতি-বান, প্রতিভাবান রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে ঘৃণার ধারণা, অবহেলার বোধ পোষণ করেছেন। এমন কি শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চে আসার পরেও। এবং এখনও অনেকে এই অবহেলাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন।

"নাট্যশালার সঙ্গে এই সাধারণ অপরিচয় ছাড়াও শিশিরকুমার সম্পর্কে এই অনবধানতার আরও কয়েকটি কারণ আছে। ১৯২১ সাল থেকে শিশিরকুমার বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে

লিখিত আলোচনা কি মর্মান্তিক রকমের কম হয়েছে।...অন্য দেশে যেমন নিয়মিত নাট্যালোচনার দ্বারা অভিনয়-কীর্তি সংরক্ষিত হয় শিশিরকুমারের ক্ষেত্রে তা হয় নি। এই কারণেই লিখিত আলোচনার ধারায় শিশিরকুমারের ঐতিহ্য উত্তরকালের কৌতূহলীর কাছে এসে পৌছয় নি।

"উপরন্তু নতুন নাট্যআন্দোলনের নামে যে সব প্রতিষ্ঠান গত আট দশ বছরে জনপরিচিতি পেয়েছে তাদের অনেকগুলিই শিশিরকুমার সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রচারে সাহায্য করেছে। এই সব দলের অনেক নেতারা গুরুপাক প্রবন্ধ লিখেছেন থিয়েটারের ওপর। তাতে শিশির ভাদুড়ী নামক ওল্ড ফসিলের প্রতি বিষোদ্গার স্পষ্ট। জীবিত অবস্থায় শিল্পীর প্রতি যে অন্যায় এঁরা করেছেন মৃত্যুর পর শোকসভায় সে অন্যায় কি স্খালন হবে?

"এ ছাড়া শিশিরকুমারের নাট্যশালা দর্শকশূন্য হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাজনৈতিক তথা সামাজিক কারণ আছে মনে হয়। যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার পরিণতিতে দেশ বিভাগের ফলে কলকাতায় মঞ্চের নিয়মিত দর্শকের স্বাভাবিক জীবন বহু পরিমাণে বিপর্যস্ত এবং সমস্যা-পীড়িত হয়ে উঠল। কলকাতার জনসংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেল এবং ছিন্নমূল যে নতুন দর্শক সমাজ থিয়েটার দেখা আরম্ভ করল তাদের শিশির-নাট্যরীতির সঙ্গে পরিচিতি নেই, সর্বোপরি জটিল সমস্যাতাড়িত জীবনে গভীর শিল্পকলা আস্বাদের অবকাশ নেই। চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা জীবিত নাট্যশালার রসগ্রহণ তাদের সম্ভব ছিল না। জীবন সংগ্রামের সর্বক্ষেত্রে তাদের এত তীব্রভাবে ভাবতে হয় যে সন্ধ্যেবেলায় টিকিট কেটে অতিরিক্ত চিন্তাভার নিতে তারা রাজি হল না। গভীর বুদ্ধি বা গভীর অনুভবের আলোড়নে না গিয়ে তারা লাইন দিল সিনেমা হাউসে। সে সিনেমা জীবন থেকে পালানোর সুযোগ দেয় বেশি—কল্পনা ও বুদ্ধির কাছে দাবী করে কম। এবং যে-নাটক দেখে দর্শকের বুদ্ধি ও অনুভূতি সব থেকে কম খরচ হয়—সিনেমার লক্ষণের সঙ্গে যে-নাটক সব থেকে মেলে সেই নাটকের খদ্দের বেড়ে গেল। অসাধারণ প্রোডাকশন হওয়া সত্ত্বেও 'দুঃখীর ইমান', 'পরিচয়', 'প্রশ্ন' ও 'তখৎ-এ-তাউস' প্রভৃতি শ্রীরঙ্গমের শেষ নাটকগুলি যে অসফল হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ এই নতুন দর্শক ও দর্শকের নতুন মনোভঙ্গী।..."

এতগুলি নাটক মার খাওয়ার পর আর কোন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা শিশিরকুমারের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

তাই শ্রীরঙ্গমের শেষ তিন বছরে পুরানো নাটক অভিনয় করে ভাঙা আসর জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দিনে দিনে ঋণের অঙ্ক বেড়ে উঠল। বাড়িভাড়া বাকি পড়ার দায়ে শ্রীরঙ্গম উঠে গেল। শেষ অভিনয় হল ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি। ২৮শে জানুয়ারি বাড়ির দখল ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল পরে সেই বাড়িতে আর এক নতুন থিয়েটারের জন্ম হল—নাম 'বিশ্বরূপা'।

বিচিত্র এই দেশ! এদেশে প্রতিভার মূল্যায়ন হয় তার মৃত্যুর পর। শিশিরকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে তার শতাংশের একাংশও আলোচনা হয় নি তাঁর জীবদ্দশার শেষ দিকে। যখন শ্রীরঙ্গমে ছিলেন তখন তো নয়ই; যখন শ্রীরঙ্গম ছাড়লেন তখনও না। অথচ আলোচনার প্রয়োজন ছিল তখনই সবচেয়ে বেশি। তাহলে তাঁকে শ্রীরঙ্গম ছেড়ে যেতে হত না। দেশ উদাসীন থেকেছে শেষ তিন বছর ধরে, কেন তিনি শ্রীরঙ্গমে পুরানো নাটক নিয়ে চর্বিত চর্বণ করছেন। আবার মাত্র সাত হাজার টাকার জন্যে 'ঘরে-বাইরে' মঞ্চস্থ করতে পারছে না এ কথা জানা সত্ত্বেও আমরা উদাসীন থেকেছি। অর্থের অভাবে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা দূরে থাক, নিজের মঞ্চটাই হাতছাড়া হয়ে গেল। নাট্যশিল্পে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর জীবদ্দশাতেই জাতীয় উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে। ম্যাক্সিম গোর্কি মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্ট্যানিস্লাভস্কিকে বলেছিলেন:

'I never forget, I cannot forget, how much and how splendidly you have worked, how many talented people you have taught, how many splendid actors you have given to our country. This is an historical contribution of which you can be as undeniably and indisputably proud as you can of your own artistic career."

এই একই কথা শিশিরকুমার সম্পর্কেও বলা যায়। কিন্তু উত্তরাধিকার পেয়েও আমরা উদাসীন থেকেছি। তাঁর কাছ থেকে কী কী দান পেয়েছি তার বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করে রাখবার প্রয়াস করি নি। তার ফলে আমরা হারিয়েছি অনেক কিছু। তাঁর কাছ থেকে কী পেয়েছি আর কী হারিয়েছি তার বিবরণ দিয়ে শ্রীশম্ভু মিত্র লিখেছেন:

"আর একটা জিনিস শিশিরবাবুর দেখে শিখেছি সেটা হল, নাটক কী ভাবে কাটতে হয় বা গাঁথতে হয়। তার প্রমাণ আছে 'আলমগীর' নাটকেও নাট্যের প্রভেদে। লিখিত নাটকের মতো করে নাট্যাভিনয় আদৌ হত না। অর্থাৎ নাটককে, দৃশ্যপটকে, অভিনয়কে, শব্দকে, সব কী করে এক সঙ্গে নাট্যের মধ্যে ব্যবহার করতে হয় তার শিক্ষা আমরা শিশিরকুমারের কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনিই আমাদের প্রথম নির্দেশক। কিন্তু প্রথম বলেই তাঁর অনেক সূক্ষ্ম কারুকাজ তেমন করে লক্ষ্যে পড়ে নি লোকের, তেমন করে আদর পায় নি। কারণ তেমন করে নাট্য দেখবার অভ্যাস যে তৈরি হয় নি মানুষের। তার ওপর দর্শককে গুলিয়ে দেবার জন্যে অন্য ধরণের থিয়েটারও তো ছিল।...তাই হয়তো আমরা এই নির্দেশক শিশিরকুমারকে শেষের দিকে হারিয়েছি। তাতে তাঁর নিজের যাই কিছু ক্ষতি হয়ে থাকুক না কেন তারচেয়ে ঢের বেশীগুণ ক্ষতি হয়েছে আমাদের দেশের। তাই যখন ভাদুড়ী মশায়ের মৃত্যুর পর সভায় অনুষ্ঠানে অজস্র লোক বক্তৃতায় উচ্ছ্বসিত হলেন তখন আশ্চর্য লাগল! তাঁরা সবাই যদি সময় করে শ্রীরঙ্গমে নাট্যাভিনয়টাই দেখতে যেতেন পয়সা দিয়ে টিকিটটা কিনে তাহলে তো তাঁকে ঐ মঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হত না। এ যেন জ্যান্তে ভাত কাপড় না দিয়ে মরবার পর দানসাগর করা।"

পঁয়ত্রিশ

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

রবিবার, ২২শে জানুয়ারি। অভিনীত হল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের কল্পনাশ্রয়ী নাটক 'মিসরকুমারী'। শিশিরকুমার ও ছবি বিশ্বাস সাজলেন যথাক্রমে 'আবন' ও 'সামন্দেশ'।

সোমবার, ২৩শে জানুয়ারি। মঞ্চে নেতাজী জন্মতিথি পালন করলেন। প্রতি বৎসরই করেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সঙ্গীত—'বন্দে মাতরম্'—গাইলেন হেমচন্দ্র সেন। নেতাজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন আচার্য মন্মথ-মোহন বসু, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় ও শিশিরকুমার। সে রজনীতে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় হল। সাধারণ মঞ্চে তাঁর সেই শেষ 'চাণক্য'-র ভূমিকায় অবতরণ।

মঙ্গলবার, ২৪শে জানুয়ারি। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। 'বিশেষ অভিনয়'

আরম্ভ হল। 'প্রফুল্ল'। 'যোগেশ'-এর সাজে শিশিরকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন ছবি বিশ্বাস, নিভাননী, রাণীবালা, রেবা, শেফালিকা (পুতুল) প্রভৃতি। বিজ্ঞাপনে 'বিঃ দ্রঃ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে—'এই কয়দিন অভিনয়ের পর, কিছুকালের জন্য অভিনয় বন্ধ থাকিবে।'

কিছুকাল নয়, চিরকালের জন্যে সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশিরকুমারের অভিনয় বন্ধ হল।

জলের মাছ এখন ডাঙায়। সারা জীবনের সহজ স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র হারিয়ে গেছে। রঙ্গমঞ্চের সুদূর নেপথ্যের দিনগুলো কর্মহীন, রাত্রিগুলো অত্যন্ত শান্ত। পাদপ্রদীপের আলোকদীপ্তি আজ যেন জীবনের মরীচিকা। ২৭৮নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর লাল রঙের ছোট বাড়ি। দোতলায় একটা জীর্ণপ্রায় ঘরে তেলচিটচিটে বিছানাপাতা তক্তপোশের ওপর অজস্র বই, পত্র-পত্রিকা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। ঘরের চার দেয়ালে তাকের পর তাক। তাক ভর্তি বই, বই আর বই। এক দেয়ালে তাঁর নিজেরই কমবয়সের একটা ছবি আর অন্য দেয়ালে নেতাজী সুভাষের। একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসে থাকেন। হাতের চুরুটটা জ্বেলে নিতেও খেয়াল থাকে না।

বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব এলো। নেপথ্য থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন জনসমুদ্রতীরে। খাঁটি বাঙালী শিশিরকুমারের এবার নতুন ভূমিকা—জনসভার পুরোহিত। সংযুক্তি-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হল বজ্রনির্ঘোষ। জনমতের জয়ে প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হল।

রঙ্গগুরুর আসর ভঙ্গ।

'এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।'

মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসেন নতুন রঙ্গের নায়করা। এসেছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাঁকে বলছেন: "জীবনের সন্ধ্যা নেমে আসছে। এই বোধ হয় আমার শেষ বছর। এই বয়েসে স্যার হেনরি আরভিং মারা গিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র মারা গিয়েছিলেন। এবার আমার পালা। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না, ছানি পড়েছে, শরীর প্রায়ই Non-Co-Operation করছে, তার উপর মন, সে কথা ছেড়েই দিলাম। শিল্পীর কথা কেউ মনে রাখে না, আমি বেঁচে আছি কিনা, কোথায় আছি, সে খবরই কেউ রাখে না। কিন্তু

যেদিন মারা যাব দেখবে এই রাস্তায় কী ভিড়। ফুলের মালা নিয়ে সবাই আসবে। গিরিশচন্দ্রের একটা মূর্তি আছে দেখেছো? ওর সঙ্গে অবশ্য গিরিশচন্দ্রের চেহারার কোন মিল নেই। ঐ ধরনের একটা মূর্তি ওরা গড়বে। ওদের হিসেব মত কোন একজন গণ্যমান্য লোককে ওরা ডেকে আনবে, বলাই বাহুল্য যিনি থিয়েটারের কিছুই বোঝেন না। তিনি এসে আমার মূর্তির গলায় ফুলের মালা পরিয়ে, দুফোঁটা চোখের জল ফেলে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করবেন, শিশিরকুমার একজন অভিনেতা ছিলেন। আমার কাছে সবাই নাটক পড়াতে আসে। নতুন নাট্যকার। আমি তাদের বলি কেন আস? আমার তো কোন থিয়েটার নেই। দু-একটা ভাল ভাল লেখাও চোখে পড়ে, উৎসাহ দিলে হয়তো কখনও ভাল নাটক লিখতেও পারে, কিন্তু আমি কি করব। আমার থিয়েটার কেন চলল না জান? আমি ভাল নাটক দিতে চেয়েছিলাম। 'পরিচয়' দেখেছো? 'দুঃখীর ইমান' দেখেছো? তার মধ্যে দিয়ে অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম। লোকে নিলে না। কিন্তু টিকিট বিক্রির ওপর নজর রেখে আমি তো নাটক নামাতে চাই না।"

তিনি বলতেন, 'আমি কখনো আর্ট বেচে খাবো না।' 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'—এই মহাবাক্যে তিনি ঠিক ঠিক বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জানতেন মঞ্চের সেবাই তাঁর স্বধর্ম। স্বধর্ম ত্যাগ করলে তিনি ছবির রাজ্যে গিয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারতেন। "আদালতে যখন তাঁর দেউলিয়া হবার আবেদনের বিচার চলছিল তখন বিচারপতি জানতে চেয়েছিলেন শিশিরকুমারের মতন প্রতিভাবান অভিনয়শিল্পী চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রভূত অর্থোপার্জনের সুযোগ নেন না কেন? তদুত্তরে শিশিরকুমার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে ছিলেন যে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে তাঁর ভালো লাগে না—মঞ্চাভিনয়কেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে মনে করেন।" মঞ্চের সেবাকে তিনি তাঁর mission মনে করতেন। আত্মহারা ছিলেন রঙ্গালয়ের ভালবাসায়—তার জন্যে সব রকম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

কলাবিদেরা সচরাচর বেহিসেবী হন। মাইকেল ও শিশিরকুমার। দুজনেই মদ খেতেন। দুজনেই বেহিসেবী ছিলেন। দুজনের প্রতিভা-রহস্যের মর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে স্বর্গত নীলকণ্ঠ লিখেছেন: "মাইকেল যদি মিতব্যয়ী হতেন, মদ না খেতেন, বিধর্মী না হতেন, বিষয়-আশয় করে গুছিয়ে

তারপর লিখতে বসতেন—কি হত তাহলে? নির্বোধ জীবনীকারের কথা মেনে নিয়ে দত্তকুলোদ্ভব কবি কলম নিয়ে বসলে, মেঘনাদ বেরুত না সে লেখনী থেকে।... সংসারের সার হচ্ছে স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করা। অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকলে তাঁকে কোনদিনই এ সবের জন্মে ভাবতে হত না। তবুও কেন সব ত্যাগ করে সেদিনকার সমাজে যারা (যাত্রার) সঙ তাদের জাতে তুলতে নিজেকে নিমজ্জিত করলেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চোরাবালিতে, যদি এ প্রশ্ন শিশিরকুমারকে করা যেত, তাহলে তাঁর পক্ষে নিরুত্তর থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর কি ছিল? অথবা সকল কালেই এর উত্তরে শিল্পীরা যা বলে এসেছেন বরাবর: আই হ্যাভ্ টু গো থ্রু—তার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া।...

"মধুসূদন কেন মিতব্যয়ী হতে পারেন না—শিশিরকুমার কেন স্বীকার করতে পারেন নি শৃঙ্খলাকে—এই 'কেন' না তুলে মেনে নিতে হয়—এমনই হয় বলে।... প্রতিভা বলে যাকে আমরা স্বীকার করি সে আমাদের শিকার করে। যে গোরু দুধ দেয় তার শিং নাড়ার অধিকার সর্ববাদীসম্মত।... শিল্পীকে শিল্পী কর আবার স্বাভাবিকও কর—স্রষ্টার কাছে এমন বর যে চায়—সে শিল্পরসিক নয়—সে নিতান্তই বর্বর।...

"...পৃথিবীতে এমন লোক আছেন যাঁদের জীবন তাঁদের কীর্তির চেয়ে মহৎ, কিন্তু বঙ্গদেশে এমন দুজন শিল্পী সেকালে এবং একালে এসেছেন এবং গেছেন যাঁদের জীবনের চেয়ে তাঁদের কীর্তি অনেক বৃহৎ। সেই দুজন হলেন যথাক্রমে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

"শিশিরকুমার ভাদুড়ী জীবনের সায়াহ্নে শ্রীরঙ্গমের ক্রোড়চ্যুত হয়ে শহরতলীতে নির্বাসন উদ্‌যাপন করছিলেন যখন, তখন তাঁকে দেখে আমার মনে যাঁর স্মৃতি অবশ্যম্ভাবী উজ্জ্বল হয়েছিল তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে সেদিন উঠে এসেছিলেন মুহূর্তের জন্য: সেন্ট হেলেনায় নির্বাসিত অবিস্মরণীয় নেপোলিয়ন। পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দূলকে—তুলনায় অনেক নিরীহ না মনে করে পারি নি সেদিন। নেপোলিয়নকে নির্বাসন না দিয়ে যদি বিজয়ীর কৃপা প্রদর্শনের কারণে করুণার জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হত তাহলে সে প্রহসন জমত শিশিরকুমারকে সাহায্য দেবার নামে রিলিফ ফাণ্ড খুললে।...

"শিশিরকুমারকে যাঁরা মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানাতেন শৌখীন অভিনয়ের আসরে তাঁরা ভাবতেন শিশিরকুমারের বুঝি অর্থকষ্টই একমাত্র কষ্ট।

শিশিরকুমার এই আমন্ত্রণ কখনও গ্রহণ, কখনও প্রত্যাখ্যান করতেন। যখনই প্রত্যাখ্যান করতেন তখনই উপলব্ধি করতাম তিনি নট-কঙ্কাল নন ; নাট্যাচার্য।

"দাতব্য হাসপাতালে মহাকবির অন্তিম কামনা ছিল : জাতীয় সাহিত্য। শহরতলীতে শেষ শয্যায় শুয়ে মহানটের স্বপ্ন ছিল : জাতীয় নাট্যশালা।"

শিশিরকুমারের বেহিসেবীপনা প্রসঙ্গে স্বর্গত নীলকণ্ঠের আর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করব। তিনি তাঁর 'অদ্য ও প্রত্যহ' গ্রন্থে লিখেছেন :

"শিশিরকুমার কেন হিসেব করে চলতে পারেন নি।...এ রহস্য জানতে হলে শিশিরকুমার হতে হয়। সূর্যকে সূর্য ছাড়া আর কে জ্ঞাত হতে পারে মহাকাশে ? জানি, সময়ে সঞ্চয়ী হতে পারলে এক রঙ্গালয় থেকে একাধিক রঙ্গালয়ের মালিক হওয়ার বাধা ছিল না তাঁর, সাধারণ মানুষ যেমন একখানা বাড়ির ভাড়া থেকেই বানায় আর একখানা বাড়ি, জানি পাটোয়ারি বুদ্ধি থাকলে আজ শিশিরকুমার সরকারী ও বেসরকারী সড়কে প্রচুর বিত্তবান হতে পারতেন। হয়তো রঙ্গালয়চ্যুতও তাঁকে হতে হত না... সবই হত তাহলে, শিশিরকুমার হতেন না শিশিরকুমার।"

অস্তগামী প্রতিভা-সূর্যের চারিদিকে শোচনীয় দারিদ্র্যের মেঘ ঘনিয়ে আসছে। নানা আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে 'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি' প্রতি মুহূর্তে ভোগ করছেন। রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্যে একদিন যিনি তনুমনপ্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, অভিনয়কে যিনি ভালবাসতেন নিজের প্রাণের মতন,—তিনি আজ রঙ্গালয়ের বাইরে—দুর্জয় অভিমানে নিভৃতে আত্মগোপন করে আছেন। দেহ অসুস্থ, দৃষ্টি অন্ধপ্রায়, হৃদয় নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন, অর্থাভাবে জর্জরিত তবুও অনমনীয়, উন্নতশির, নিজ আদর্শে নিষ্ঠাবান, আত্মবিশ্বাসে অটল। এই আত্মবিশ্বাসকেই লোকে দম্ভ বলে ভুল ভেবেছে। এই দম্ভের জন্যই তিনি কলালক্ষ্মীকে পণ্যা স্ত্রীর সাজে সজ্জিত করেন নি। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আচার্য শ্রীকুমার লিখেছেন : "ভগবান শিশিরকে রাজোচিত সৌন্দর্য ও উদার প্রশস্ত হৃদয় দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন,—সে ভগবদ্দত্ত রাজদণ্ড হাতে লইয়াই জন্মিয়াছিল। এমন সহজ, অসঙ্কোচ, প্রকৃতি-চিহ্নিত রাজ অধিকার খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। সে যেন হুকুম করিতেই আসিয়াছিল, অন্য লোকে স্বেচ্ছায়, সানন্দে সেই হুকুম পালন করিয়াই কৃতার্থ। যেমন

থিয়েটারে, তেমনি সর্বত্রই সে ছিল বড়বাবু। অন্য লোকে অজস্র টাকা খরচ করিয়া যাহা করিতে পারিত না, শিশির তাহার স্বভাব-মধুর আচরণে প্রতিভার অবর্ণনীয় আকর্ষণী শক্তিতে একটি কথাতেই তাহা নিষ্পন্ন করিত। রঙ্গালয় পরিচালনার গুরু ও বহুমুখী দায়িত্ব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান ও নিজের অভিনয় সবই সে অবলীলাক্রমে নিজের বিশাল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল। হয়ত এত গুরুভার বহন একজন লোকের সাধ্যাতীত। সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত তাহার মত লোকোত্তর প্রতিভাকে রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল। ধনী পরিচালক ও ছায়া চিত্রের সুলভ আনন্দ-বিধানের প্রতিযোগিতায় নিঃসম্বল প্রতিভাশালী শিল্পী কতদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে। এই অসমযুদ্ধে তাহাকে পরাজয় স্বাকার করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এ পরাজয় কি শুধু তাহার? ইহা দেশের বিদগ্ধ রুচি, শিল্পের উন্নত মান, সস্তা চটকদারী আমোদ প্রকরণের দ্বারা স্থানচ্যুত গৌরবময় ঐতিহ্যের, মেকির নিকট খাঁটির পরাজয়। এ পরাজয়ের ফল জাতীয় জীবনের উপর সুদূর-প্রসারী।

"অনেকে মনে করেন যে শিশিরকে এত জটিল দায়িত্বের মধ্যে জড়াইয়া না পড়িয়া নিছক অভিনয়-শিল্প-সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করিতে হইত, ব্যবসাদারীর ফাঁদে পা না দিয়া কলাচর্চাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে হইত। তাহার তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ ও দুর্জয় স্বাধীনতা-স্পৃহাই তাহাকে এই নিরাপদ সর্বপ্রকার দায়িত্বমুক্ত পথের অনুসরণে বাধা দিয়াছে। তাহার অভিনয়-জীবনের প্রারম্ভে ম্যাডান কোম্পানীর বাঁধা চাকরি তাহার পোষায় নাই; আবার জীবন-সায়াহ্নে যখন অস্তগামী প্রতিভা-সূর্যের চারিদিকে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের মেঘপুঞ্জ ঘনীভূত হইয়াছে, তখন বাঙলা সরকারের নাট্য একাডেমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিবার প্রস্তাবও সে বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। হয়তো যে আপোষী মনোভাব সংসার-সাফল্যের একটা প্রধান হেতু, তাহার একরোখা মেজাজের সঙ্গে তাহার কোনই সঙ্গতি ছিল না। হয়তো অভিমান প্রবণতার বাষ্প তাহার বাস্তব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। যাঁহারা এইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা যে সাংসারিক জ্ঞানে বিজ্ঞ তাহা অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে, তাঁহারা প্রতিভা-রহস্যের মর্মজ্ঞ নহেন। উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়াকে দিয়া ছ্যাকড়া-গাড়ী টানান যায় না, শকটের নিয়মিত অগ্রগতি যাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা উচ্চৈঃশ্রবার গ্রীবাভঙ্গাভিরাম,

খেয়াল-নিয়ন্ত্রিত, কখনও ঊর্ধ্বশ্বাস, কখনও হঠাৎ-থামিয়া-পড়া চাল-চলনকে পছন্দ করিবেন না ইহা স্বাভাবিক। তাই বলিয়া সব উচ্চৈঃশ্রবাই ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়াতে পরিণত হউক এ কামনাও কেহ করিবেন না। আসল কথা শিশিরের উদ্দেশ্য ছিল শুধু নিজের অভিনয়-শক্তির চূড়ান্ত বিকাশ নহে, সমগ্র নাট্যকলার আরও ব্যাপকতর, সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন। সে চাহিয়াছিল রঙ্গমঞ্চকে নূতন রূপ দিবার, নূতন নূতন পরীক্ষার দ্বারা উহার প্রাণ-শক্তিকে বিকশিত করিবার জন্য অবাধ স্বাধীনতা। একটা নাটকের মঞ্চারোহণ-ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও অভিনব-ভাবকেন্দ্রিক করিতে গেলে শুধু প্রধান অভিনেতার অংশটি চমৎকার ভাবে রূপায়িত করিলে চলিবে না; পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, দৃশ্য-সন্নিবেশ, সময় সময় দর্শকের রুচিকে আঘাত করিবার দুঃসাহস, নাটকের ভাবানুযায়ী পরিবর্তন সমস্ত কিছুর সম্বন্ধেই স্বাধীন কর্তৃত্ব থাকা চাই। স্বত্বাধিকারীর লক্ষ্য থাকিবে প্রধানত টিকেট ঘরের জানালার উপর; তাঁহার প্রিয় নট-নটীকে ইচ্ছানুযায়ী অংশ দিতে হইবে; দর্শকের স্থূলতম রুচিকেও প্রশ্রয় দিতে হইবে; কোনোরূপ অনিশ্চয় বা বিপদের ঝুঁকি সর্বথা বর্জন করিতে হইবে। এইরূপ বাঁধা-ধরা সর্তে শিশির-প্রতিভা কাজ করিতে প্রস্তুত ছিল না। শিল্পের জন্যই সে পরিচালনার স্বাধীনতা চাহিয়াছিল। যখনই তাহার আশঙ্কা হইয়াছে যে বাঁধা বেতনের নিরাপদ, আরামদায়ক আশ্রয়ে তাহার উচ্চতর বিবেক-বুদ্ধি ব্যাহত হইবে, যখনই সে অনুভব করিয়াছে যে তাহাকে স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতার ঘুষ দিয়া তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিল্পকে উপবাস-শীর্ণ রাখার ষড়যন্ত্র চলিতেছে তখনই তাহার পথ-নির্বাচনে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও খেতাব সে তাহার উচ্চতর আদর্শের প্রতিকূল বিবেচনায় অবহেলায় ত্যাগ করিয়া শেষ জীবনের অভিমান-দুর্বিষহ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে। আমাদের এই মেরুদণ্ডহীন দেশে, ক্ষমতার চরণতলে অপ্রতিবাদ মাথা নোয়াইতে অতিব্যগ্র এই সমাজে, এই প্রখর, অনমনীয় আত্মসম্মানজ্ঞানের নৈতিক মূল্যটাও কি উপেক্ষার বিষয়?"

বাড়ি ভাড়ার দায়ে শিশিরকুমার যখন শ্রীরঙ্গমচ্যুত হলেন তখন তিনি বলেছিলেন—'ঠিক আছে, টাকার অভাবে শ্রীরঙ্গম না হয় ছেড়ে দিলাম,

তাতে দুঃখের কি আছে। বাংলাদেশ ভাল নাট্যশালার কদর বোঝে। দেখো এক বছর দেড় বছরের মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।' কিন্তু তা হল না।

'জীবন সর্বস্ব ধন' যাঁকে অর্পণ করেছেন তাঁকে 'ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা'র পুষ্পাঞ্জলি সাজাবার আয়োজন করলেন। উনিশ শ' আটান্ন সালের জুনমাসে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদ'।

এর পূর্বে অবশ্য কয়েকবার অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। কতিপয় তরুণ নাট্যসেবী উদ্যোগী হয়ে একটি নাট্যসংস্থা গঠন করেছেন। শিশিরকুমারের নির্দেশনায় তাঁরা অভিনয় করবেন। রাজী হলেন তিনি। মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে 'জীবন-রঙ্গ' নাটক মঞ্চস্থ করলেন। বোধহয় এগারোটি শো দিয়েছিলেন। 'অমরেশ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করলেন। একটি প্রদর্শনীতে আমেরিকা থেকে এক বিদুষী মহিলা অভিনয় দেখতে এলেন। অভিনয় শেষে বিদেশিনী সাজঘরে শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা করে বললেন—'Mr. Bhadury, you are one of the greatest actors of tho world.' শিশিরকুমার ধন্যবাদজ্ঞাপন করে তাঁর নাম জানতে চাইলেন। নাম শুনেই শিশিরকুমার তৎক্ষণাৎ বললেন বিদেশিনী নিশ্চয়ই আমেরিকার 'Theatre Art' পত্রিকার সম্পাদক। মার্কিন রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয়েও শিশিরকুমার এতটা খোঁজখবর রাখেন জেনে বিদেশিনী মহিলা ডঃ রোজামণ্ড গিল্ডার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। শিশির-কুমার ঈষৎ হেসে বললেন—'We are both inhabitants of ONE WORLD.'

রোজামণ্ড গিল্ডার বললেন—'আমার চৌষট্টি বছর বয়েস, এর মধ্যে এমন অভিনয় খুব কমই দেখেছি। আমার এখন হংকং, চীন যেতে হবে, ফিরে এসে তোমার সব নাটকের অভিনয় দেখব।' দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশে আসা তাঁর আর হয়ে ওঠে নি।

আমেরিকায় ফিরে গিয়ে ডঃ গিল্ডার নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে শিশিরকুমারকে 'Theatre Art' পত্রিকাটি পাঠাতে লাগলেন। কলকাতার U. S. I. S. এর মাধ্যমে রোজামণ্ড গিল্ডার তাঁর স্বরচিত 'Introduction to the Theatre' গ্রন্থটিও শিশিরকুমারকে উপহার পাঠান।

শিশিরকুমার U. S. I. S. থেকে উক্ত বই সমেত এই চিঠিটি পেয়েছিলেন :—

U. S. I. S.
7, Chowringhee Road.
Calcutta-13.
January 16, 1957.

Mr. Sisir Kumar Bhadury.
278, Barrackpore Trunk Road.
Calcutta-36.

Dear Mr. Bhadury,

During the recent visit of Dr. Rosamond Gilder, Director of the united States Centre of the International Theatre Institute, we visited your theatre, and had the great pleasure of meeting you. I recently had a letter from Miss. Gilder in which she sent her greetings to you.

The United States Service has just received one copy of an Introduction to the Theatre. It seems to me that no one in Calcutta could be more intersted in the subject than you, and so we send it to you with our compliments.

With all best wishes.

Sincerely
For the Public Affairs Officer
Sd/- Aileen Aderton
Cultural Affairs Officer.

থিয়েটার সেন্টারের ক্ষুদে মঞ্চে 'সধবার একাদশী' নাটক অভিনয় করলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং থিয়েটার সেন্টারের পরিচালক শ্রীতরুণ রায়। স্থানাভাবে বহু দর্শক সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন। সেই বৃদ্ধ বয়সেও অসাধারণ অভিনয় করলেন শিশিরকুমার। যে সব দর্শক তাঁর অভিনয় দেখেন নি তাঁরা মুগ্ধ হয়ে বললেন—'ওঁর অভিনয় আরও দেখার যেন আমরা সুযোগ পাই।'

এর পর এন্টালী কালচারাল কনফারেন্সে 'মাইকেল' এবং আরও কয়েকটি সংস্কৃতি সম্মেলনে অভিনয় করেছিলেন। কলকাতার বাইরেও মাঝে মাঝে অভিনয় প্রদর্শন করতে যেতেন। নানা স্থান থেকেই আমন্ত্রণ আসত। যতদূর মনে পড়ে বর্ধমানে যেতে গিয়েই হাওড়া স্টেশনে পা পিছলে পড়ে গিয়ে হাতটি ভাঙলেন এবং বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। হাতের ব্যথায় বহুদিন কষ্ট পেয়েছেন। আবার ঐ হাতের ব্যথা নিয়ে অভিনয় করতেও ছাড়েন নি।

'নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদ' গঠিত হয়েছে। পরিষদের পুরোভাগে রয়েছেন শিল্পী শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়, রসজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ রাম অধিকারী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীদেবকুমার বসু, নাট্য-সমালোচক ডাঃ রবি মিত্র, সাহিত্যিক শ্রীশিবনারায়ণ রায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ, 'উদয়ের পথে'-রচয়িতা জ্যোতির্ময় বসু রায়, চিত্র ও নাট্য-সমালোচক শ্রীপঙ্কজ দত্ত, শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ, কবি রাম বসু, অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্য-সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পথের পাঁচালী'-খ্যাতা শ্রীমতী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস ও শ্যামলী চক্রবর্তী প্রভৃতি। পরিষদের অধিবেশনের স্থান ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটে 'গ্রন্থজগৎ'-এর ঘর।

এই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে শিশিরকুমার যেন আবার পূর্ব যৌবন ফিরে পেয়েছেন। অসীম উৎসাহে নাটক পাঠ করে শোনান, অভিনয় শিক্ষা দেন, তরুণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে মাঝে মাঝে মফঃস্বলে অভিনয়-সফরে যান। সর্বোপরি "নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক মননশীল সংলাপে নিজ অনায়ত্ত আদর্শ সাধনার জন্য অন্তঃসঞ্চিত ক্ষোভকে ও বহুব্যাপিনী মনীষাকে মুক্তি দেবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি" করেছেন। তাঁর 'সেই বুদ্ধিদীপ্ত, অনুরাগসরস মনের কথাগুলি' টুকে রাখতেন শ্রীদেবকুমার বসু ও ডাঃ রবি মিত্র। পরে তাঁরা সেগুলিকে সংকলিত করে 'সাধারণের গোচরীভূত' করেছেন 'শিশির সান্নিধ্যে' নামক গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে সেই আলাপচারী শিশির-কুমারের 'ব্যক্তিত্বের অন্তত একটা দিকও ভবিষ্যৎ যুগের কাছে পরিচিত হবে'।

এই অন্তরঙ্গ মহলে শিশিরকুমার প্রায়ই বলতেন—'আমাকে একটা বাড়ি দাও, আর কিছু ছেলেমেয়ে দাও, ক বছর আর বাঁচব, কিছু একটা করি।'

আর একদিনের অধিবেশনে একজন প্রশ্ন করলেন, আপনার জীবনের best part কি ?

বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, 'কোন অভিনেতাই অমন কিছু বলতে পারেন না। যখন যে পার্ট করি তখন সেটাই best বলে মনে হয়। দিগ্বিজয়ী করে যেমন আনন্দ পাই, জীবানন্দ করেও তেমনই।'

পরিষদের সদস্যরা শিশিরকুমারের জন্মদিন পালন করলেন। সেই শেষ জন্মোৎসব। উনিশ শো আটান্নর দোসরা অক্টোবর। সেদিনের অধিবেশনে শিশিরকুমার উপস্থিত। মাল্যদান করা হল তাঁকে, নানা জনে নানা উপহার দিতে আরম্ভ করলেন।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা কি ?

দেবকুমার বললেন, আজ যে আপনার জন্মদিন।

কিন্তু এ সব কি ?

আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে ওরা, জানাতে দিন না।

আচ্ছা; বলছ যখন, দাও। তোমরা শ্রদ্ধা করে যা দিচ্ছ তাই নেব। জন্মদিনের সঙ্গে কতকগুলো দুঃখবহ ঘটনা মিশিয়ে আছে, তাই এই সব করলে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগে। মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে, তাই যা বলবার দরকার তা বলতে পারছি না। তোমরা মনে করে নিও আমি বলেছি।

কেমন যেন আনমনা উদাস হয়ে গেলেন শিশিরকুমার।

এই পর্বে শিশিরকুমার নাট্যশালা প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি picture frame stage তুলে দিয়ে যাত্রাকে কালোপযোগী করে গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেই প্রবন্ধটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হল :

"আমাদের বাংলাদেশে দীর্ঘ পাঁচ ছয় শত বৎসর কাল যাত্রা নামধেয় যে নাট্য প্রচলিত ছিল তার রূপ বর্তমান বাংলা থিয়েটার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তাতে না ছিল মঞ্চ না ছিল পট এবং আলোকেরও সমারোহ ছিল না। আপামর সাধারণের কাছেও এই নাট্য ছিল অত্যন্ত প্রিয়। এর ভিত্তি গঠিত হয়েছিল আমাদের হিন্দুধর্ম পুরাণকে আশ্রয় করে। আমাদের দর্শন ও পুরাণ যে জীবনবেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের নাট্য ও নাটক তারই ব্যাখ্যা করত। দর্শনের গুরুগম্ভীর তত্ত্ব পৌরাণিক গল্পের মধ্য দিয়ে একেবারে অজ্ঞ,

অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলাই ছিল আমাদের দেশের যাত্রার কাজ।

"দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় যাত্রা ছিল সামাজিক জীবনের এক প্রধান অঙ্গ। শুধু তাই নয়, এ জিনিস তখন এত বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল যে মনে হয় দুই তিন শত বর্ষ ধরে এই যাত্রা অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের সমাজে চলে আসছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগ পর্যন্ত ছিল যাত্রার লোকপ্রিয়তা। কিছুকাল আগেও গ্রামে গ্রামে ভূস্বামীরা দুর্গাপূজা, দোল ও রাস উপলক্ষ্য করে বহুদিন ধরে নাট্যোৎসব করতেন। এখনও যাত্রার অপ্রচলন হয় নি তবে যাত্রার মূর্তি বদলেছে। অল্পদিন পূর্বেও যাত্রা ছিল দেব-দেবীর পূজার অঙ্গ। শুধু পূজার অঙ্গ নয় লোকশিক্ষারও অঙ্গ। আমাদের দেশে লোক অক্ষর পরিচয়কেই শিক্ষার একমাত্র সোপান মনে করতেন না। বর্ণজ্ঞান না থাকলেও আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষক এই পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক যাত্রার সাহায্যে হিন্দু ধর্মের ও দর্শনের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে পরিচিত হতে সক্ষম হত। জীবনের উচ্চ উচ্চ আদর্শগুলি, সত্যানুরাগ, পরোপচিকীর্ষা, পরার্থে আত্মত্যাগ, সতীধর্ম, পিতৃভক্তি, সৌহার্দ ও দেবদ্বিজে ভক্তি লোকের মনে সংক্রামিত হত; কিন্তু অত্যধিক পুরাণপ্রিয়তা শেষকালে যাত্রাকে সমসাময়িক জীবন হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। নাটকে মানুষের সাধারণ জীবন ও তার বিবিধ সমস্যা আমাদের যাত্রার পালায় কোন রকম স্থান পেল না।

"অত্যন্ত অবাস্তব জিনিস লোকপ্রিয় হয় না, লোকের কোন কাজেই আসে না। কাজে কাজেই যাত্রার লোকপ্রিয়তা নষ্ট হতে লাগল আর অনাদৃত হবার অবশ্যম্ভাবী ফল, অধঃপতন ঘটতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে অর্থাৎ ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত হতেই কলকাতায় ইংরাজী থিয়েটারের প্রবর্তন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই থিয়েটার পরিপুষ্ট হয়। এই থিয়েটার দেশীয় ধনী ও নামজাদা লোকের যথেষ্ট আনুকূল্য ও অর্থ সাহায্য লাভ করেছিল। কলকাতার মুষ্টিমেয় ইংরেজের দ্বারা ইংরেজী থিয়েটার চলানো সম্ভবপর ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি তৎকালীন বাঙালী সমাজের নেতারা সাহায্য না করলে সেসময় কলকাতায় ইংরেজী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব ছিল। 'শাঁসুঁচি' থিয়েটার অগ্নিগ্রাসে পতিত হলে দ্বারকানাথ ঠাকুর সাহেব পরিচালকদের আর একটি থিয়েটারের বাড়ি সংগ্রহ

করে দেন। দেশের ইংরেজী জানা লোকেরাই এই ইংরেজী থিয়েটার খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখতে আরম্ভ করেন। বাঙালী অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ইংরাজ নট-নটী দিয়ে অভিনীত ইংরেজী থিয়েটারে শেক্সপীয়রের নাটকে নায়কের অংশে অভিনয় করেন। স্কুল ও কলেজে এই সময়ে Shakespeare অভিনয় প্রচলিত হতে আরম্ভ করে। এই ইংরেজী অভিনয়ের ধারা এখনও লুপ্ত হয় নি। এইরূপে ইংরেজী থিয়েটার থেকে বাঙালীর জন্য বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে।

"যাত্রার আসর অনাদৃত হয়ে থিয়েটার আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু একথা সত্য যে যত লোক থিয়েটার দেখে তার চেয়ে ঢের বেশী লোক এখনও যাত্রা দেখে যদিও যাত্রার রূপ থিয়েটার ঘেঁষা ও অকুলীন।

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে Europe-এ ঝোঁক এসেছে মঞ্চ তুলে দেবার দিকে। পাটাতনের উপর দৃশ্যপট সজ্জিত, আলোকোজ্জ্বল, দর্শকের মণ্ডলী থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এক কল্পলোক তুলে দিয়ে দর্শককে একেবারে অভিনেতাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নাটককে রূপ দেওয়ার একটা চেষ্টা এসেছে। এরই নাম Arena Theatre বা Theatre in the round কিন্তু এই জিনিস আমাদের দেশে বহু শতাব্দী থেকে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশ দরিদ্র। বেশী টাকার টিকিট কিনবার সামর্থ্য সাধারণ দর্শকের নেই। আলোকপ্লাবিত মঞ্চের উপর নয়নাভিরাম দৃশ্যপটের সৃষ্টি করার খরচ অনেক। এর আরও একটা কুফল হচ্ছে, নাট্যের যে প্রাণ অভিনয়, তার চেয়ে দৃশ্যপটের জাঁকজমকে লোক বেশী মুগ্ধ হয়, এতে নাট্যের ক্ষতি। দৃশ্যপট, চমকপ্রদ আলোকসম্পাত, এসব একেবারে বাদ দিলেও রসসৃষ্টির কোনোরকম ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং এই ব্যয়সাধ্য মঞ্চ তুলে দিয়ে যদি যাত্রার আসরকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাতে রস-পরিবেশনের কোনোরূপ ব্যাঘাত তো হবেই না বরং নাট্য-সম্প্রদায়গুলির পরমায়ু বাড়বে ও প্রয়োগকর্তা ও নটমণ্ডলী অনেক বৃথা পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। চার পাঁচশত বৎসর ধরে যে যাত্রা লোকের মনে ভাবের তরঙ্গ তুলতে সক্ষম হয়েছে তাকে যদি আমরা মরে যেতে দিই তাহলে সেটা দেশবাসীর পক্ষে গৌরবের কথা হবে না।—Loss of an achievement.

"অভিনয় যতই ভাল হোক, পশ্চিম দেশের মত ঝকঝকে আলোর কায়দা ও পশ্চাৎপটের নানারকম কৌশল যদি বা আমরা আয়ত্ত করি তা কিছুতেই জাতীয় নাট্য হবে না। জাতীয় নাট্যশালার নাম নিয়ে যদি কোন নাট্যশালা গড়ে তোলা হয় পশ্চিমের অনুকরণে, তা ব্যয়বহুল আড়ম্বর প্রদর্শনের স্থান ছাড়া আর কিছুই হবে না। আজ যখন পশ্চিমে চেষ্টা চলছে picture frame stage তুলে দেবার, তখন আমরাই বা আমাদের যাত্রার আসরে নাট্যকে স্থান দেব না কেন? যাত্রাকে নূতন করে কালোপযোগী করে গড়ে তুলব না কেন?"

উনিশশো আটান্নর ১২ই নভেম্বর তাঁর অতি স্নেহের ও আদরের ছোট ভাই প্পুর (ভবানীকিশোর) মৃত্যু হল। শেষ বয়সে শেষ মর্মান্তিক শোক পেলেন।

প্পুর মৃত্যুর একমাস পর।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে ডিসেম্বর মাসে পর পর চার রাত অভিনয় করলেন। অভিনয় দেখতে লোক ভেঙে পড়ল। দর্শকদের মধ্যে অনেককে বলতে শোনা গেল—'বয়েস তো হয়েছে, কবে আছেন, কবে নেই। দেখে নিই এইবেলা।'

১১ই 'মাইকেল', ১২ই 'জীবানন্দ', ১৩ই 'রাসবিহারী' আর ১৪ই আবার 'মাইকেল' সাজলেন।

প্রতিটি অভিনয়ের শেষে দেখা যেতো অসহ্য ক্লান্তিতে তাঁর দেহ এলিয়ে পড়েছে। কথা বলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতেন। তাঁকে ধরাধরি করে গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হত। শেষ দিনের অভিনয়ের পর দেবকুমারকে বললেন—'শরীর আর বইছে না। এখন কদিন বিশ্রাম করব।'

ঊনসত্তর পার হয়ে সত্তরে পড়েছেন।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নাট্যোৎসব করার আগে তাঁকে অভিনয়ের জন্যে ছ' হাজার টাকা পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করা হল। তিনি ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ ঠিক সেই সময়ে তাঁর অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন। অর্থাভাবে চোখের ছানি কাটাতে পারছেন না। তাঁর গুণমুগ্ধ চিকিৎসকরাও বিনা পারিশ্রমিকে চোখের ছানি কাটবার প্রস্তাব করলেন। সবিনয়ে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করলেন।

'He would break but never bend.'

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৯।

ভোরবেলা যথারীতি খবরের কাগজ খুলে অবাক হয়ে গেলেন শিশির-কুমার। দেখলেন ভারত-সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এতে তাঁর প্রতিক্রিয়া সাংঘাতিক হলো। শোনা গেল তিনি ঐ খেতাব ছেড়ে দেবেন। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্যে প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী সাক্ষাৎকার নিতে তাঁর বাসভবনে এসেছেন। জানতে চাইলেন কেন তিনি 'পদ্মভূষণ' খেতাব ছেড়ে দিতে চাইছেন।

—"ঐ সব জিনিস আমি কোনদিনই পছন্দ করি নি। থিয়েটার ভালবাসি, নাট্যশালা ভালবাসি; বরাবর তাই নিয়ে আছি। আমাকে হঠাৎ সম্মান দেখানোর ঘটা কেন? কালই ভারত-সরকারকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি, 'তোমাদের এ সম্মান আমি চাইনে, সরকারী খেতাবে দরকার নেই আমার'।"

—"আপনার নটজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে"—

—"থাক আর বলতে হবে না। স্বীকৃতি? কিসের স্বীকৃতি? আজ তিন বছর নাট্যশালা ছেড়ে এমনি বসে আছি। কই, কেউ তো কোন-দিন এসে বললেন না, 'এসো তোমাকে একটা নাট্যশালা খুলে দিই, তোমার ইচ্ছে মত অভিনয় করে যাও।' আমার প্রতি দরদ থাকলে নাট্যশালার প্রতিও দরদ থাকতো। ওই পদবী দেবার বদলে খুশী হতাম, এই কলকাতার বুকে ভাল একটা নাট্যশালা খোলার কথা সরকার যদি ঘোষণা করতেন। তা ছাড়া, ওইসব খেতাব, পদবী জিনিসগুলোই ভুয়ো। কোন দাম নেই। শুধু কতকগুলি খয়ের খাঁ সৃষ্টি করবার মতলব। বৃটিশ আমলে যেমন ছিল, রায়সাহেব, রায়বাহাদুর। আমি খয়ের খাঁর দলে নাম লেখাতে চাইনে। আসল কথা কি জান, এই দেশ নাটকের কদরই বুঝলো না। না সরকার, না জনসাধারণ, কেউ না। তোমরা ছেলে-মানুষ। তোমরা জান না, স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে এই নাট্যশালার দান কত। গিরিশবাবু, অর্ধেন্দুবাবু ওঁরা সব নমস্য ব্যক্তি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—'এ নেশন ইজ নোন বাই ইট্স স্টেজ।' খাঁটি কথা। ডিউক অব ওয়েলিংটনকে কে মনে রাখবে, রাখে তো রাখবে শেকস্পীয়ারকে, বার্ণাড শ'কে।"

—"আপনি পদ্মভূষণের খবর কখন পেলেন?"

—"কাগজে পড়ে। ভোরবেলা খবরের কাগজ খুলে অবাক। দেখি, আমি নাকি পদ্মভূষণ না কি যেন হয়ে গেছি। সরকারী ভদ্রতার ডেফিনিশন আমার জানা নেই, তবে এই ব্যাপারে আগে আমার অনুমতিটা অন্ততঃ নেওয়া উচিত ছিল। দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম পেলাম দুদিন পর। টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল 'শ্রীরঙ্গমে'র পুরনো ঠিকানায়। আমি যে তিন বছর আগে 'শ্রীরঙ্গম' ছেড়েছি, এ সংবাদ ভারত সরকারের জানা না থাকলেও বাঙলা সরকারের নিশ্চয়ই জানা ছিল।"

শিশিরকুমার ২রা ফেব্রুয়ারি ভারত-সরকারকে চিঠি দিলেন যে তিনি খেতাব গ্রহণ করতে পারবেন না। সেই ঐতিহাসিক চিঠিটি উদ্ধৃত হল :—

From :—

Sri Sisir Kumar Bhadury,
278, B. T. Road,
Calcutta-36.

To
Sri B. N. Jha,
Home Secretary, Govt. of India,
New Delhi.

Sir,

I gather from the newspapers that a decoration of 'Padma-Bhusan" has been awarded to me.

It is unfortunate that I was not sounded about it before this, for though the appreciation for whatever merits I have is no doubt gratifying, I find it impossible to accept it on principle. Had I been consulted, it would have saved much embarrassment.

I am opposed to the granting of honour in any shape or form by the State. For they have the effect of demoralising the people and creating a race of toadies hankering after Government honour,

I recognise that some people of the greatest distinction have been decorated, but there is no guarantee that, for all time only men worthy of the highest honour will be so decorated.

I have a personal reason, besides the one of principle, for not wishing to be conferred the honour. By its acceptance I shall mislead the lovers of the theatre into believing that the Government are aware of the importance of drama in the life of the nation.

I received a congratulatory telegram from the Home Secretary addressed to "Srirangam", my theatre, which has been taken away from me by an order of the Court over three years ago for failure to pay rents. There are men in the Government and in the Akadamy, who are aware of the fact that the theatre has been my life's work, and they know that I have today no stage of my own to act on. They also know that there is no public-owned noncommercial stage, even in Calcutta, devoted to the cause of the advancement of the theatre as an integral part of our life as a nation, and the Government have no plans to build one.

If the Government really wished to honour me and through myself, the cause I have served for nearly forty years, a more befitting tribute would have been the gift of a public stage to the city of Calcutta. For it is too late to retrieve the theatre I have lost.

I cannot accept the honour, and would request you to find out the means to relieve me of the burden of receiving it.

Yours etc.,

Sd/-Sisir Kumar Bhaduri

Calcutta,

Dated 2nd February,

মাইকেল-প্রতিভাকে যেমন চিনেছিলেন বিদ্যাসাগর, শিশির-প্রতিভাকে তেমনি চিনেছিলেন দেশবন্ধু। দেশবন্ধুই বুঝেছিলেন ভারতে জাতীয় নাট্যশালার অধিনায়কত্ব করার ক্ষমতা একমাত্র শিশিরকুমারেরই আছে। তখন দেশ ছিল পরাধীন। দেশ স্বাধীন হ'ল। স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা শিশিরকুমারকে জাতীয় নাট্যশালা গঠনে আহ্বান না জানিয়ে শুধু একটি খেতাব দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করতে চাইলেন। শিশিরকুমার সে খেতাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এ হচ্ছে শিল্পীর অভিমান, শিল্পীর দম্ভ। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন সেই পরাধীন দেশের এক নেতা শিশিরকুমারের এই স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের স্বপ্নকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর আন্তরিক আশ্বাস-বাণী দিয়ে সেই স্বপ্নকে সম্ভাব্য আশায় পরিণত করেছিলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শিশিরকুমার এই স্বপ্নকে আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরেন। সেই নেতার নাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

"শতকাজের ভিড়ের মধ্যে দেশবন্ধু আসতেন শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার জন্যে। শিশিরকুমারের অভিনয়ে তিনি শুধু আনন্দই পেতেন না, একটা গর্ব অনুভব করতেন। তাঁর কবিচিত্তে জেগে উঠতো দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, রঙ্গমঞ্চের ভেতর দিয়ে জাতির অন্তরকে স্পর্শ করা। এই নিয়ে বহু আলোচনা তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে করতেন, এবং এই রকম এক আলোচনার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, শিশির, যেমন করে পারি, তোমাকে নিয়ে গড়ে তুলবো জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। ফরিদপুর কনফারেন্সে যাবার কিছু দিন আগেও তিনি একবার শিশিরকুমারের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন, সেদিনও তিনি বলে গিয়েছিলেন, শিশির ফরিদপুর থেকে ফিরে এসে এবার একটা ব্যবস্থা করবোই।

"কিন্তু দেশবন্ধু আর ফিরে আসতে পারেন নি। যে আশ্বাস সেই দেশনেতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, শিশিরকুমারের মনে একটা সংগোপন বিশ্বাস ছিল, দেশ স্বাধীন হলে, তাঁর দেশের নেতারা বা তাদের পরিচালিত রাষ্ট্র বাঙালীর দেড় শো বছরের নাট্য-সাধনাকে ব্যক্তিগত চেষ্টার আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ধার করবেন, সোভিয়েট রাশিয়া যেমন করেছে এবং সে প্রচেষ্টার অধিনায়কত্ব স্বভাবতই তিনি পাবেন।

"শেষ জীবনের নিঃসঙ্গতা এবং ঘনায়মান আর্থিক দৈন্যের বিভীষিকার

মধ্যে তিনি রূঢ় ভাবে অনুভব করেন, তাঁর অন্তরের স্বপ্নকে স্বেচ্ছায় সার্থক করে তোলবার জন্যে কোন দেশবন্ধু নেই। যে অভিনেতা গোষ্ঠীকে তিনি অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে টেনে তুলে খ্যাতির আলোয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি শুধু তাঁদের আচার্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁদের বড়দা, তাঁর মানস সন্তানের মতো তাঁদের তিনি আঁকড়ে ধরে থাকতেন, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি দলভ্রষ্ট হয়ে চলে যেতো, তাঁর বুকের পাঁজরায় আঘাত লাগতো। এমন একদিন এলো যখন আশ্রয়হীন, মঞ্চহীন তাঁকে স্বেচ্ছায় তাঁদের বলতে হয়েছিল, তোমরা যেখানে কাজ পাও, চলে যাও। এবং দলপতির ক্ষতবিক্ষত অভিমানে তাঁকে দেখতে হয়েছে, তাঁরা একে একে নিরুপায় হয়ে তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়েছেন, সখীর দলের মহড়ায় দাঁড়াবার যে-সব মেয়ের ক্ষমতা নেই তাদের নায়িকা সাজিয়ে তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছে··· নিছক অন্ন-সংস্থানের জন্যে এই অভিনয়-চেষ্টায় তাঁর শিল্পী মন যে-আর্তনাদ করতো, সে-আর্তনাদ বাইরে কেই-বা শুনতে পেতো? ব্যর্থ-স্বপ্ন শিল্পীর সমস্ত অভিমান বাইরে ফুটে উঠতো হঠাৎ রাগে, অকস্মাৎ তিক্ত ভাষণে এবং এমন সব উক্তিতে যা দম্ভ বলে মনে হতে পারতো। শেষকালে এই অভিমান এমন একটা কমপ্লেক্সে পরিণত হয়েছিল যে, কেউ যদি আন্তরিকভাবে তাঁর জন্যে কিছু করতে চাইতো, তাঁর মনে হতো, তাঁকে যেন করুণা করা হচ্ছে। তাঁর শিল্পীমন তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠতো।

"এইরকম এক মুহূর্তেই তিনি রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত পদ্মভূষণ উপাধি বর্জন করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার দশবছর পরে সরকারী দপ্তরের এই ক্রম-মাফিক সম্মাননাকে যে-শিল্পীর দম্ভে তিনি কার্পণ্যের মুষ্টি ভিক্ষা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেটা রাষ্ট্রের প্রতি অবজ্ঞা নয়, সেটা হল শিল্পীর নিমজ্জমান আত্মমর্যাদাকে রক্ষা করবার শেষ প্রচেষ্টা।"

মার্চ মাসে চোখের ছানি কাটালেন। ধীরে ধীরে শরীর ভেঙে পড়ছে। হজম হয় না। প্রায়ই পেটে একটা ব্যথা উঠছে। মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্টও অনুভব করেন। অনিদ্রা রোগ তো চিরসাথী। তবু এই ভাঙা শরীর নিয়ে মহাজাতি সদনে ৮ই মে 'আলমগীর' আর ১০ই মে 'রীতিমত নাটক'-এ 'দিগম্বর' এর ভূমিকায় অভিনয় করলেন। মঞ্চের ওপর শেষবারের মতো সিংহের ন্যায় বিচরণ করে গেলেন।